

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও
দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ

Employment and Business Entrepreneur

নবম-দশম শ্রেণি

লেখক

ইঞ্জি. ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট (মেকানিক্যাল)

সম্পাদক

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ী, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ক্যারিয়ার গাইডেন্স	১-১০
দ্বিতীয়	জীবিকা ও কর্মজগৎ	১১-১৯
তৃতীয়	আত্মকর্মসংস্থান	২০-৪০
চতুর্থ	প্রেষণা ও পেশা নির্বাচন	৪১-৫২
পঞ্চম	ব্যবসায় শুরু করার পদ্ধতি	৫৩-১৩৮
ষষ্ঠ	ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা	১৩৯-১৮১
সপ্তম	লেনদেন ও হিসাব রক্ষণ	১৮২-২৩২
অষ্টম	সফল উদ্যোক্তার ঘটনা বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন	২৩৩-২৪৮

প্রথম অধ্যায়

ক্যারিয়ার গাইডেন্স

Career Guidance

ভূমিকা (Introduction)

জীবিকা অর্জনের অভিপ্রায়ে যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, তাই ‘ভোকেশন’/‘বৃত্তি’/‘পেশা’। একজন সফল ব্যক্তিমাত্রই সুন্দর ক্যারিয়ারের অধিকারী। জীবনে সফলতা পেতে হলে ক্যারিয়ার গাইডেন্স একটি অনন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সাধারণত যে যত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম তিনি তত উচ্চতায় ক্যারিয়ার গঠনে সক্ষম। মানুষের যশ ও সুখ্যাতি তার ক্যারিয়ারের আলোকেই আবর্তিত হয়। তাই ক্যারিয়ারকে সাজাতে জীবনের প্রতিটি স্তরে যথাযথ গাইডেন্স অনুসরণ ও অনুকরণ করা অত্যাবশ্যিক।

১.১ ‘ভোকেশন’ (Vocation) /‘বৃত্তি’/‘পেশা’ বিষয়ক মৌলিক ধারণা

জীবিকা অর্জনের অভিপ্রায়ে যে প্রচেষ্টার আশ্রয় নেয়া হয় তাকে ‘ভোকেশন’/‘বৃত্তি’/‘পেশা’ বলে। ‘ভোকেশন’ (Vocation) /‘বৃত্তি’/‘পেশা’ হলো এমন একটি স্বীকৃত কর্মকাণ্ড যার বিনিময়ে জীবিকা অর্জন সম্ভব হয়। জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষমাত্রই কোনো না কোনো পেশা বা বৃত্তির আশ্রয় নেন।

যদিও বৃত্তি বা পেশা শব্দ দুইটি কখনও কখনও একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। তথাপিও এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পেশার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দরকার হয়, যা সাধারণত বৃত্তির জন্য দরকার হয় না। যেমন- একটি ভবনের নকশা যে স্থপতি করেন তাকে স্থাপত্যবিদ্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তাই এটি তার পেশা। এহেন পেশার আলোকেই মানুষের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করা হয় এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। অন্যদিকে যারা নির্মাণ শ্রমিক তাদের কাজকে বৃত্তি বলা হয়। এরূপ একজন ওয়েল্ডার যখন ওয়েল্ডিং কাজের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করেন; তখন তার এই কর্মটি হলো একটি বৃত্তি। এক্ষেত্রে তার দক্ষতাই মুখ্য। এছাড়া মেকার, টেইলর ইত্যাদি এরূপ বৃত্তিরই এক একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অতএব কাজের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় এক রকমের ‘ভোকেশন’ (Vocation)/‘বৃত্তি’/‘পেশা’।

মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করে। এ কাজ ব্যক্তিমাত্রই তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। কাজের বিনিময়ে অর্থ-এ মস্ত্রে দীক্ষিত হয়েই মানুষ যে কোনো একটি কাজ বেছে নেন। এরূপ কাজের আলোকেই নির্ধারিত হয় ‘ভোকেশন’ (Vocation)/‘বৃত্তি’/‘পেশা’।

১.২ ক্যারিয়ার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ক্যারিয়ার হলো সব ধরনের কাজ, পেশা, চাকরি বা জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ, যা একজন ব্যক্তি তার সারা জীবনে অর্জন করে। প্রত্যেক মানুষই চায় একটি সুন্দর ও সফল ক্যারিয়ার। উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের জন্য ক্যারিয়ার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ক্যারিয়ারকে সুন্দর ও সার্থকরূপে গড়ে তুলতে হলে ক্যারিয়ার শিক্ষা পাঠে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২. শেখার জন্য অনুপ্রেরণা।
৩. সমাজজীবনে কর্ম ও পেশার চাহিদা।
৪. পরিবর্তনশীল কাজের ধরন সম্পর্কে ধারণা।
৫. উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ।
৬. পরিকল্পনা করতে উদ্বুদ্ধকরণ।
৭. সংবেদনশীলতা তৈরি।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ক্যারিয়ার গঠনে বিভিন্ন সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়। যেমন আমি কোন বিভাগে পড়ব অথবা ভবিষ্যতে কোন পেশা বা বৃত্তি বেছে নেব ইত্যাদি। প্রতিটি সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনযাপন শৈলী, মান, উপার্জন, জীবনের গতিময়তা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে। আমাদের এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত শুধু নিজের জীবন নয়, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়েও প্রভাবিত করতে পারে। যেমন আমরা বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই যদি বিজ্ঞান শাখায় পড়ি এবং এই সংক্রান্ত পেশায় নিযুক্ত হই, তবে সমাজ এক রকম হবে। আর বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই যদি মানবিক শাখায় পড়ি এই সংক্রান্ত চাকরি করি, তাহলে সমাজ হবে আরেক রকম।

আবার যদি বিশ্ব বাজারে বিজ্ঞান শাখা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর চাকরি থাকে, যা দেশে নেই তখন অনেকে হয়তো ভালো চাকরির সন্ধানে অন্যান্য দেশে চলে যেতে পারে।

আবার পুরো ব্যাপারটাকে উল্টোভাবেও দেখা যায়। যেমন বহির্বিশ্বে চাকরির বাজার, দেশে চাকরির পরিস্থিতি, সমাজের চাহিদা ইত্যাদি লক্ষ করেও অনেক সময় মানুষ শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা বা শাখা বেছে নেয়। কাজেই আমরা বিশ্ব, সমাজ, পরিস্থিতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আবার আমাদের সিদ্ধান্তের ওপর বিশ্ব, সমাজ, পরিস্থিতি ইত্যাদিও নির্ভরশীল। যেহেতু ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই চিন্তাভাবনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

এখানে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজের হাতে নাও থাকতে পারে। যেমন অনেক সময় নির্ধারিত শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট শাখা বা বিভাগ বরাদ্দ হতে পারে। তাই এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করে আগে থেকেই সতর্ক থেকে কর্মপন্থা নির্ধারণ করাও এক ধরনের

সিদ্ধান্ত। আমি যদি জানি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য আমাকে বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে ৭০% নম্বর পেতে হবে এবং আমার লক্ষ্য যদি হয় বিজ্ঞান বিভাগে পড়া, তবে এ বিষয়টি ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে। মনে রাখা দরকার, লক্ষ্য পূরণ নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে লক্ষ্য পরিবর্তন করা যেতে পারে।

শেখার জন্য অনুপ্রেরণা

যখন ক্যারিয়ার শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় থেকে কোন একটি নির্বাচন করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো শেখার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। ক্যারিয়ার শিক্ষার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যা শিখছি তা কীভাবে আমাদের কাজে লাগছে এবং ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে। এই অনুধাবন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায় এবং অনুপ্রেরণা তৈরি করে।

সমাজজীবনে কর্ম ও পেশার চাহিদা

সমাজের জন্য সকলের কাজ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বৃত্তি, চাকরি ও পেশার মধ্য দিয়ে সমাজে মানুষ উপার্জন করে জীবন ধারণ করে। সমাজের বিভিন্ন চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য মানুষ নানা ধরনের কাজ করে। কেউ নিজের বা পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য, কেউ আত্মতৃপ্তির জন্য কাজ করে। কাজ মানুষের জীবনে প্রয়োজন মেটায়, তৃপ্তি আনে। এতে সমাজও লাভবান হয়। ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের তুলনামূলকভাবে পছন্দের কাজ বেছে নিতে ও সফল হতে সাহায্য করে। কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনেও এটি সাহায্য করে।

পরিবর্তন কাজের ধরণ সম্পর্কে ধারণা

দেশে-বিদেশে এবং এমনকি দেশের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় কাজের চাহিদা ও সুযোগের পার্থক্য রয়েছে। আবার কাজের এই চাহিদার সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনশীল চাহিদা সম্পর্কে জানতে এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে বিভিন্ন জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করতে ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের সহায়তা করে।

উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ

যতই দিন যাচ্ছে ততই বিভিন্ন কাজে আগের চেয়ে বেশি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হচ্ছে। যে কোনো ধরনের কাজের জন্যই ন্যূনতম পর্যায়ের ভাষা দক্ষতা, বিশেষ করে মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, উপার্জনের জন্য অনুপ্রেরণা, সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় এবং ক্যারিয়ার শিক্ষার ধারণা শিক্ষার্থীকে এই যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে।

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি

প্রতিটি চাকরি বা পেশার জন্য নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট বিষয়ে লেখাপড়া, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা এই দক্ষতাগুলো অর্জন করি। এছাড়া এ ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ দক্ষতা যেমন, বিভিন্ন মানুষের সাথে এক সাথে কাজ করা, অন্যকে সাহায্য করা ইত্যাদি দক্ষতার পাশাপাশি মনোযোগ, ধৈর্য, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণও দরকার হয়। ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের যে সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা দেয়।

পরিকল্পনা করতে উদ্বুদ্ধকরণ

ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা করতে শেখায়। এটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা শুধু শিক্ষা, বৃত্তি বা কর্মক্ষেত্রের পরিকল্পনাই করি না, বরং বৃহৎ অর্থে জীবনেরই পরিকল্পনা করি। এটি কখনোই স্থির বা নিশ্চিত নয় বরং পরিবর্তনশীল। তবে পরিকল্পনা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, কোন পথে কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তা নির্ধারণ করে। সঠিক পরিকল্পনা অনেক সমস্যার সমাধান দেয়।

সংবেদনশীলতা তৈরি

ক্যারিয়ার শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম, পেশা ও পেশাজীবী মানুষ সম্পর্কে জানতে পারি। তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখি। এটি আমাদের বিভিন্ন পেশা ও কর্মে নিযুক্ত মানুষের প্রতি সহনশীলতা, সহমর্মী ও সংবেদনশীল হতে শেখায়।

উপরোক্ত গুণাগুণ অর্জনের মাধ্যমে এমন ক্যারিয়ার গড়তে পারি যা কবির ভাষা—

‘এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
হাসিতে হাসিতে মরিবে তুমি
সবাই কাঁদিবে তখন।’

তাই জীবনকে সাজাতে উন্নত ক্যারিয়ার গঠনে; জীবনের প্রতিটি স্তরে যথাযথ গাইডেন্স অনুসরণ ও অনুকরণ করার উদ্দীপনা জোগাতে ক্যারিয়ার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১.৩ নিজের সামর্থ্য-দুর্বলতা, ঝোঁক প্রবণতা চিহ্নিতকরণ

একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য লাভ এবং ব্যর্থতার কারণসমূহ তার সামর্থ্য-দুর্বলতা, ঝোঁক প্রবণতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে, সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন, তারাই কেবল সফল হন। নিম্নে ব্যবসায় সামর্থ্য-দুর্বলতা, ঝোঁক প্রবণতা ইত্যাদি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সফল ও ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১। ব্যবসায় সঠিক পণ্য নির্ধারণ: সঠিক পণ্য নির্ধারণ ব্যবসায় সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে কোনো পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে পণ্যের বাজার চাহিদা কীরূপ তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। গবেষণার ফল থেকে জানা যায় যে বহুল ব্যবহৃত পণ্যের চেয়ে নতুন সম্ভাবনাময় পণ্য নির্বাচন করলে সফলতা অনিবার্য।

২। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন: সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর ব্যবসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভবিষ্যতে কী, কখন এবং কীভাবে একটি কাজ করতে হবে তা অগ্রিম চিন্তা ভাবনা করার নামই পরিকল্পনা। ব্যবসা বাণিজ্য সফলভাবে পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোক্তাকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কারণ সঠিক পরিকল্পনার অভাব ব্যবসায় ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

৩। **পর্যাপ্ত মূলধন:** ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা ব্যবসায় সফলতার অন্যতম শর্ত। সুতরাং ব্যবসার সাফল্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত মূলধনের সংস্থান করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে ব্যবসায় কার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৪। **বাজারে চাহিদার পরিমাণ নিরূপণ:** বাজারে পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে পূর্বেই অনুমান করতে হলে মনে রাখতে হবে যে, পণ্যের চাহিদার পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণের উপরই ব্যবসায়ের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ পণ্য সরবরাহ বেশি ও চাহিদা কম হলে ব্যবসার ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই উদ্যোক্তাকে উপযুক্ত কলাকৌশলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ চাহিদা নির্ধারণ করা উচিত।

৫। **পণ্য বাজারজাতকরণ:** বাজারজাতকরণের অর্থ হচ্ছে সঠিক মূল্যে যথাসময়ে বাজারে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। পণ্য শুধু উৎপাদন করলেই হবে না, তা বিক্রির ব্যবস্থাও করতে হবে। এর জন্য ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচার ব্যতীত কোনো পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুপরিচালিতভাবে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠি।

৬। **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা:** শিক্ষা গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন ব্যবসার সফলতার পূর্বশর্ত। ব্যবসায়ে অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা থাকলে ব্যর্থতার চেয়ে সফলতার সম্ভাবনাই বেশি। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে ব্যবসায় পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ সবচেয়ে বেশি সফল হন।

৭। **উপযুক্ত স্থান নির্বাচন:** ব্যবসার স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত, সেখানে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যিক।

৮। **যৌথ উদ্যোগ:** পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৯। **দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা:** উদ্যোক্তাকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা জ্ঞান ছাড়া প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজ যেমন— পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা যে কোনো উদ্যোক্তার সফলতার জন্য অপরিহার্য। উদ্যোক্তার নিজস্ব নিয়মনীতি অনুযায়ী কাজ করলে ব্যর্থ হতে পারে।

১০। **সঠিক পরামর্শ:** বিভিন্ন পদে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা এবং প্রয়োজনবোধে পরামর্শ প্রদান করা ব্যবসায়ের সাফল্যের চাবিকাঠি।

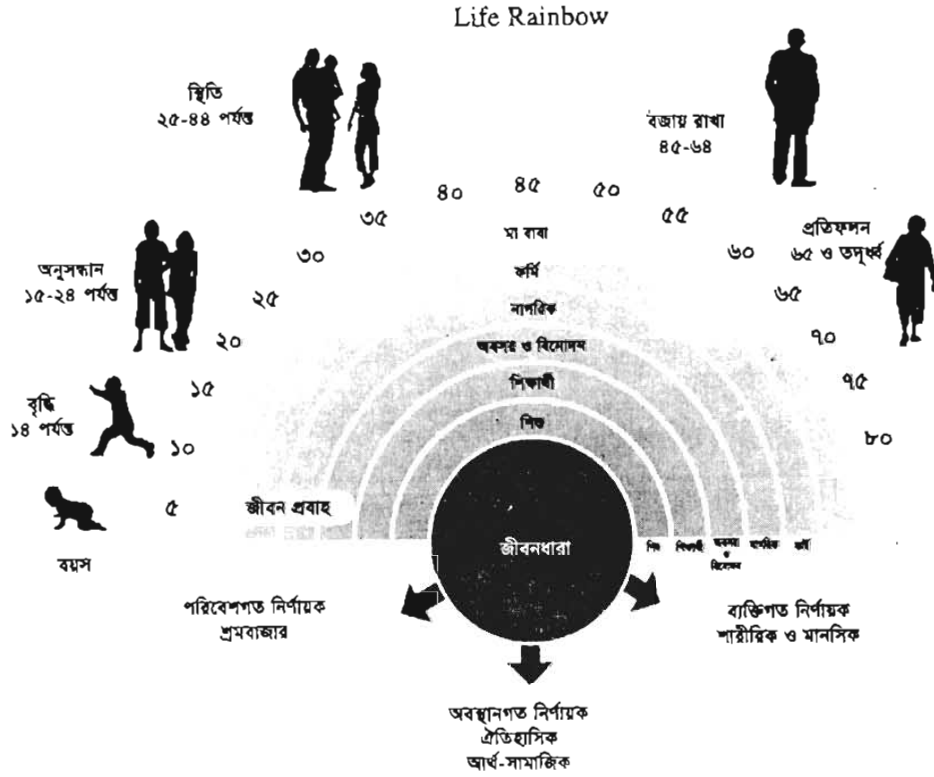
১১। **হিসাবরক্ষণ:** সুষ্ঠু ও যথাযথ হিসাবরক্ষণের উপর ব্যবসার সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। যথাযথভাবে হিসাব না করলে অনেক সময় ব্যবসা কিছুকাল চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

১২। **সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থা:** উদ্যোক্তাগণ যাতে সহজে যে কোনো সময় সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ করতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর ব্যবসার সফলতা নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো ব্যবসায়ের সফলতার জন্য একান্ত আবশ্যিক। যে উদ্যোক্তা উপরোক্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করেন না, সে ব্যবসায়ে অবশ্যই বিফলতা দেখা দেবে।

১.৪ স্বপ্নের ক্যারিয়ার রূপরেখা প্রস্তুতকরণ

ক্যারিয়ারের রূপরেখা বা মডেল : মনোবিজ্ঞানী ডোনাল্ড সুপার সময়ের সাথে সাথে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তনের ভিত্তিতে একটি মডেল দাঁড় করিয়েছেন। এটিকে রঙধনু জীবন (Life Rainbow) বলা যায়, কারণ এর ধাপগুলোকে রঙধনুর মতো ধাপে ধাপে সাজানো যায়।



ধাপ	বৈশিষ্ট্য
প্রথম ধাপ : বুদ্ধি	নিজের সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় ; দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা এবং কাজের একটি সাধারণ জগৎ সম্পর্কে ধারণা হয়।
দ্বিতীয় ধাপ : অনুসন্ধান	বিভিন্ন কাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা। পরিবর্তনশীল পছন্দ ও দক্ষতার গঠন।
তৃতীয় ধাপ : স্থিতি	কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে স্থায়ী অবস্থানে পৌঁছানো।
চতুর্থ ধাপ : বজায় রাখা	নিজের অবস্থানের উন্নতির জন্য ক্রমাগত পরিবর্তন ও প্রচেষ্টা, মানিয়ে চলা, খাপ খাওয়ানো।
পঞ্চম ধাপ : প্রতিকলন	ফলাফল বা কমে আসা, অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি।

যদিও সুপার তার পর্যায় বা ধাপগুলোকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করেছেন, তবে এই ধাপগুলো ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হতে পারে।

১.৫ স্বপ্নের পেশা নির্ধারণে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় নির্ধারণ

আমরা প্রায়ই বিভিন্ন পেশা, বৃত্তি বা নির্দিষ্ট চাকরিতে প্রবেশের স্বপ্ন দেখি। এরূপ স্বপ্নের পেশা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিই। এক্ষেত্রে আমার কোন্ কোন্ দক্ষতা কতটুকু আছে তা নির্ধারণপূর্বক নিম্নের ছকটি পূর্ণ করি।

স্বপ্নের পেশা	যোগ্যতা ও দক্ষতা	কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োজন	কতটুকু অর্জন করেছি	আর কী কী অর্জন করা প্রয়োজন
স্বপ্নের পেশা-১				
স্বপ্নের পেশা-২				
স্বপ্নের পেশা-৩				

এবার চিহ্নিত যে যে বিষয়ে আমার আরও যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করতে হবে, সেগুলো কীভাবে করতে পারি তা নিয়ে চিন্তা করি।

এক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় চিন্তা করে দেখি:

- আমি কি সঠিক পথে এগোছি? আমার যে ধারায় পড়ার কথা, যা যা এর মধ্যে শেখার কথা তা কি শিখতে পেরেছি?
- পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি?
- কী ধরনের সহশিক্ষা ক্রমিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারি যা আমাকে নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে?
- আমার পড়ার অভ্যাসে কি কোনো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? সেগুলো কী ধরনের পরিবর্তন?

যোগ্যতা ও দক্ষতা

এসো দেখি এমন কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতা যা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য শর্ত হিসেবে দেখা যায়-

লেখার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন	তাড়না, প্রেরণা, সক্রিয়তা
মৌখিক যোগাযোগ	নমনীয়তা
দলে কাজের যোগ্যতা	পেশাদারী মনোভাব
আত্মসচেতনতা	ব্যবসায়িক সচেতনতা
সংখ্যা জ্ঞান বা গাণিতিক দক্ষতা	হিসাব-নিকাশ
সমস্যা সমাধান বা অনুসন্ধান বিশ্লেষণ	পরিকল্পনা ও সংগঠিত করা
নেতৃত্ব	সময়নিষ্ঠা

এসো দেখি এ যোগ্যতাগুলোর কতটুকু আমার আছে, কোথায় আমার ঘাটতি আছে, আমার সুযোগগুলো কী এবং কোন বিষয়টিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন তা আমরা SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) Analysis এর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি।

আমার শক্তি	আমার দুর্বলতা
আমি দলের মধ্যে ভালোভাবে যোগাযোগ করতে পারি	উপস্থাপনা আমাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়
আমি আমার লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী	আমি খুব সূক্ষ্ম ব্যাপারে মনোযোগী নই
ভবিষ্যতে আমি যে চাকরি করতে চাই তার বাজার খুব ভালো	আমার পছন্দের চাকরির বাজারে অনেক যোগ্য প্রার্থী রয়েছে

উপরোক্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ পূর্বক তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে হবে।

সমাধানের উপায় নির্ধারণ

আমাদের জীবনে সব সময়ই কোনো না কোনো সমস্যা সমাধান করতে হয়। যে যত পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম সে তত সাফল্যের দেখা পায়।

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত।

- তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ
- অনুমান পরীক্ষা বা যাচাই করা
- সমস্যাকে চিহ্নিত এবং এর পেছনের কারণ খুঁজে বের করা
- সৃজনশীল, উদ্ভাবনী আর কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করা
- সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পস্থা কাজে লাগানো
- বিকল্প পরিকল্পনা রাখা বিভিন্ন ধরনের বিকল্প পস্থা নির্ধারণ ও তার মূল্যায়ন
- বিভিন্ন গাণিতিক জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করা
- জটিল সমস্যা সমাধানে ভোক্তা বা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উৎকর্ষকে নজর দেওয়া।

সময় গতিশীল। সময়ের এই গতিময়তার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সমাজ, পরিবর্তিত হয় আমাদের চারপাশ, কাজের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট। আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের পেশা ছিল কৃষিকাজ কিংবা কৃষিভিত্তিক শিল্পে শ্রম দেওয়া। আজ বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। আজকের দিনে আমাদের দেশে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কী কী ধরনের কাজের সুযোগ আছে, কোন কোন পেশা গ্রহণ করা সম্ভব তা এই পাঠ থেকে আমরা জেনে নেব। পাশাপাশি, আমাদের জন্য ভবিষ্যতে কী ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হতে পারে, সে বিষয়েও জানার চেষ্টা করব। কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কে গভীরভাবে জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তবেই আমার স্বপ্ন ও আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেশা গ্রহণ করতে পারব।

১.৬ নিজের মৌলিক পরিচয় ও জীবনবৃত্তান্ত প্রস্তুতকরণ

- নাম
- লিঙ্গ
- জন্মকাল ও জন্মস্থান
- শিক্ষা জীবন
- ব্যক্তিগত জীবন
- অবসর জীবন (যদি থাকে)
- ক্যারিয়ারে কী কী বিষয় সফলভাবে পার করেছেন?
- কী কী বিষয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন? তা থেকে কীভাবে বেরিয়ে এসেছেন?
- এমন কোনো সিদ্ধান্ত যা হয়তো অন্য রকম হলে ভালো হতো মনে করেন?
- জীবনের অন্য কোন কোন বিষয় ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে?
- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

প্রশ্নমালা-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভোকেশনাল কী?
২. পেশা কাকে বলে?
৩. বৃত্তি বা পেশার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কী?
৪. নিজের সামর্থ্য বলতে কী বোঝায়?
৫. যে বিষয়ে আমার আরও যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করতে কী কী বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মানুষ কেন বৃত্তি গ্রহণ করে?
২. ক্যারিয়ার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী?
৩. নিজের মৌলিক পরিচয় দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভোকেশন’/’বৃত্তি’/’পেশা’ বিষয়ক মৌলিক ধারণা সম্পর্কে যা জান লিখ।
২. ক্যারিয়ার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাও।
৩. নিজের সামর্থ্য-দুর্বলতা, ঝোঁক প্রবণতা চিহ্নিত কর।
৪. স্বপ্নের ক্যারিয়ার রূপরেখা প্রস্তুত কর।
৫. স্বপ্নের পেশা নির্ধারণে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে লিখ।
৬. নিজের মৌলিক পরিচয় ও জীবনবৃত্তান্ত প্রস্তুত কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় জীবিকা ও কর্মজগৎ (World of Work)

২.১ ‘পেশা’ ও ‘জীবিকা’ উন্নয়নের ধারাবাহিকতার বিবরণ

পেশা হলো একটি নির্দিষ্ট সাধারণ কাজের নাম, যা একজন ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনভর ব্যাপৃত থেকে জীবিকা অর্জন করে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে পেশা আর জীবিকা সমার্থকরূপে ব্যবহার করা হয়, তবে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবিকা হলো মূলত ব্যক্তি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কর্মসংস্থান ও অভিজ্ঞতার সম্মিলিত রূপরেখার প্রতিফলন। জীবিকার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেশা গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে পেশা বা বৃত্তি হলো একটি নির্দিষ্ট সাধারণ কাজের নাম। যেমন চিকিৎসক, স্থপতি, ধাত্রী ইত্যাদি। এরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা, দক্ষতা আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। চাকরি হলো একটি নির্দিষ্ট পেশার অন্তর্গত বিশেষ একটি পদ বা অবস্থা। যেমন কোনো সংস্থার প্রধান স্থপতি।

নিজের অবস্থানের উন্নতির জন্য উত্তরোত্তর প্রশিক্ষণ, ক্রমাগত পরিবর্তন ও প্রচেষ্টা, মানিয়ে চলা, খাপ খাওয়ানো প্রভৃতি ধাপ সফলতার সাথে পেরিয়ে ‘পেশা’ ও ‘জীবিকা’র উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়।

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে যে কোনো পেশার মান উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন সম্ভব; তার জীবনে সাফল্য নিশ্চিত।

- পেশাকে মহোত্তম কাজ হিসাবে গ্রহণ করে এর প্রতিটি স্তরকে ‘সময়’ ও ‘গতি’ নিরীক্ষার মাধ্যমে
- কার্যকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা
- প্রতিটি অংশের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ
- অনুমান পরীক্ষা বা যাচাই করা
- সমস্যাকে চিহ্নিত এবং এর পেছনের কারণ খুঁজে বের করা
- সৃজনশীল, উদ্ভাবনী আর কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করা
- সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পন্থা কাজে লাগানো
- বিকল্প পরিকল্পনা রাখা, বিভিন্ন ধরনের বিকল্প পন্থা নির্ধারণ ও তার মূল্যায়ন
- বিভিন্ন গাণিতিক জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা
- জটিল সমস্যা সমাধানে ভোক্তা বা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উৎকণ্ঠাকে নজর দেওয়া।
- সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

সময় গতিশীল। সময়ের এই গতিময়তার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সমাজ, পরিবর্তিত হয় আমাদের চারপাশ, কাজের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট। আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের পেশা ছিল কৃষিকাজ কিংবা কৃষিভিত্তিক শিল্পে শ্রম দেওয়া। আজ বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য। আজকের দিনে আমাদেরকে এরূপ পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের সাথে খাপ খাওয়াতে পারলে ‘পেশা’ ও ‘জীবিকা’ উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হবে।

২.২ বাংলাদেশে পেশার শ্রেণিবিন্যাস

বেশির ভাগ সময় পেশা অনেক বিস্তৃত হওয়ায় আমরা এর মধ্যকার পদগুলোকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীকরণ করতে পারি। যেমন পশু চিকিৎসক ও মানুষের চিকিৎসক। আবার কোন ধরনের অঙ্গের চিকিৎসক তার ভিত্তিতেও ভাগটি হতে পারে যেমন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ, দন্ত চিকিৎসক ইত্যাদি। এমনকি পদের ভিত্তিতেও আমরা ভাগটি করতে পারি। যেমন সিভিল সার্জন, মেডিকেল অফিসার, সহকারী উপজেলা মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি।

জীবিকার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেশা গ্রহণ করে থাকে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে পেশাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

- ১। মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি
- ২। আত্মকর্মসংস্থান
- ৩। ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১। মজুরি ও বেতনভিত্তিক পেশা : কোন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট মজুরি বা বেতন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির বিনিময়ে চাকরি গ্রহণ করা হলে তাকে মজুরি ও বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান বলে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ে বহুসংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। ফলে চাকরি কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কাজের নিরাপত্তা, নিয়মিত আয় প্রবাহ, পদোন্নতি ও আনুষঙ্গিক সুবিধার জন্য কর্মসংস্থান হিসেবে চাকরি মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে শিল্প ও ব্যবসা/বাণিজ্যের প্রসার না হওয়ায় বেতন ও মজুরিভিত্তিক চাকরি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। তাছাড়া দেশের সকল মানুষের জন্য বেতন ও মজুরিভিত্তিক চাকরি কর্মসংস্থান সম্ভবও নয়।

২। আত্মকর্মসংস্থান : নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে চাকরি না করে স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ইলেকট্রিশিয়ান ইলেকট্রিক্যালের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলে তাকে আত্মকর্মসংস্থান পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়।

তাছাড়া আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং বেশ কয়েকটি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত যুব উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেসিক ট্রেড কোর্স ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা (NGO) গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নানাবিধ কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। যেমন-হস্ত শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাঠের কাজ, মেরামত কাজ, হাঁস মুরগি পালন, মাছের চাষ, শাক-সবজি চাষ, ফুলের চাষ, পোশাক তৈরি ইত্যাদি। এসব কাজে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এজন্য প্রয়োজন সামান্য প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগী মনোভাব। আয়ের ধারাবাহিকতা না থাকায় আমাদের দেশের মানুষ সহজে আত্মকর্মসংস্থান কাজে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না।

৩। ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ: কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোগের গুরুত্ব পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই স্বীকৃত। আমাদের দেশে ব্যবসার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অসীম সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। নিজ উদ্যোগে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করাকেই পেশা বলে আখ্যায়িত করা হয়। মালিক নিজেই তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করেন।

২.৩ অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা, উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারণা

অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা হলো এমন এক ধরনের পেশা যা কোনো অঞ্চলের সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে থাকে। এটি কখনও তাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসে বলে তা ঐতিহ্যগত পেশা হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে, যা উন্নয়ন ও উৎপাদনে সমান গুরুত্ব বহন করে। যেমন- কামার, কুমার, জেলে, তাতি প্রভৃতি।

২.৪ সৃজনশীল ও কারিগরি দক্ষতানির্ভর পেশা

বাংলাদেশে বিদ্যমান সৃজনশীল ও কারিগরি দক্ষতানির্ভর পেশাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো

জাতীয় পর্যায়

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রকম চাকরির সুযোগ রয়েছে। সরকারি, বেসরকারি, বিদেশি, বহুজাতিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরির প্রচুর সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশে। সাথে সাথে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবসা করার সুযোগ। এজন্য শিক্ষাজীবনের শুরুতেই লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যারা নিজেদের পেশাগত কাজে খুবই দক্ষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের ভালো সুযোগ-সুবিধাসহ চাকরি দেয়।

এসো, বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে কী ধরনের চাকরি ও ব্যবসার সুযোগ আছে, তার কয়েকটি আমরা জেনে নিই। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দেশে চাকরি করার অনেক সুযোগ রয়েছে। যেমন- সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আবার রয়েছে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে চাকরি।

ক্যাডার সার্ভিস

বাংলাদেশে সরকারি চাকরির কথা বললে প্রথমেই যে চাকরিটির নাম আসে তা হলো ক্যাডার সার্ভিস। বাংলাদেশে ২৯টি ক্যাডার রয়েছে। এর প্রতিটিতে চাকরি করার সুযোগ কেবল বাংলাদেশের শিক্ষিত নাগরিকদের। বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর (ক্যাডারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী) অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সের নাগরিকদের মধ্য হতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করে চাকরির জন্য সুপারিশ করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে নিয়োগ প্রদান করেন। ক্যাডার কর্মকর্তাগণ দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চাকরি করার পাশাপাশি অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই এটি আমাদের দেশের শিক্ষিত নাগরিকদের প্রথম পছন্দের পেশা। এ চাকরিগুলো পেতে হলে আমাদের শিক্ষান্তরে ভালোভাবে লেখাপড়া করতে হবে।

শিক্ষকতা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ উপযোগী করে গড়ে তোলেন। দেশ-কাল-জাতিভেদে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে। তাই শিক্ষকতায় জ্ঞান বিতরণের এই মহান পেশায় তোমার ক্যারিয়ার শুরু করতে পার। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নিলে একদিকে যেমন পাবে সম্মান-মর্যাদা, অন্যদিকে সুন্দর ও নিশ্চিত জীবন। শিক্ষান্তরের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় প্রতিবছরই শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হতে চাইলে মেয়েদের জন্য ন্যূনতম এইচএসসি পাস এবং ছেলেদের জন্য স্নাতক ডিগ্রি করতে হবে। প্রধান শিক্ষক হতে চাইলে তাকে স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি বিএড ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষকতার ক্যারিয়ার শুরু করা যেতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রতিবছর নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। যদি শিক্ষাজীবনে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকে আর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকে, তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার ক্যারিয়ার শুরু করা যায়। এক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা নিয়োগ পেয়ে থাকেন। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই নিবন্ধন পরীক্ষার সার্টিফিকেট দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ পেতে পারেন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষতার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া ভিন্ন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে চাইলে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার জন্য নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কলেজে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষকতার সর্বোচ্চ পর্যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সব উচ্চশিক্ষার্থীর স্বপ্ন থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার। এ জন্য স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভালো ফল থাকতে হবে।

আইন সংক্রান্ত পেশা

সম্মান এবং সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান সময়ে আইন পেশার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। আইন পেশায় এখন নতুন নতুন মাত্রা ও সম্ভাবনা যোগ হয়েছে। মর্যাদাপূর্ণ এ পেশা পূর্বে সাধারণত পুরুষরাই আসতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীরাও এ পেশায় আসছেন। নিম্ন আদালতে বিচারক ও আইনজীবী হিসেবে কাজের সুযোগ তো আছেই, আছে সর্বোচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী কিংবা বিচারপতি হওয়ার সম্ভাবনা। এ ছাড়া নিম্ন ও উচ্চ আদালতে সরকার-নিয়োজিত আইনজীবী হিসেবেও পেশা গড়ার সুযোগের পাশাপাশি রয়েছে নোটারি আইনজীবী হওয়ার সুযোগ।

বিচার বিভাগ ছাড়াও নির্বাহী আদালতগুলোতে আইনজীবীরা মামলা পরিচালনা করার অধিকার রাখেন। এমনকি আইনজীবীরা আদালতে ও বাইরে বিভিন্ন চেম্বার ও ফার্মে ইন হাউস আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে পারেন। আইনজীবী হতে হলে আইনের উপর স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর বার কাউন্সিল থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন পেশায় নিয়োজিত হতে হয়। এ প্রক্রিয়া অবশ্য নিম্ন আদালতের জন্য। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত নিম্ন আদালতে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

কেউ যদি বিচারক হতে চান, সেক্ষেত্রে তাকে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আইনজীবী হিসেবে কারও যদি কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে তিনি পাবেন বিচারপতি হওয়ার সুযোগ। একজন আইনজীবীর রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার সুযোগ। যেমন পারিবারিক, জমিজমা, ফৌজদারি, রিট, কোম্পানি, শ্রম আইন কিংবা আয়কর ইত্যাদি। এসব ছাড়াও বর্তমানে আইন পেশায় আরও নতুন কয়েকটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক ও মেধাস্বত্ব, ট্রেডমার্কস, পেটেন্ট ও ডিজাইনবিষয়ক আইনি কাজ। পরিবেশ আইন নিয়েও সারা দেশে কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকদের মামলা পরিচালনা, কাস্টমস ও ভ্যাট সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রও বাড়ছে। মানবাধিকারকর্মী হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার কাজের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক-বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো ইদানীং আইন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে। দেশে আইন সাংবাদিকতার সুযোগ বেড়েছে আগের তুলনায়।

ব্যাংক ও বিমা

ব্যাংক ও বিমা খাতেও রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষিত নাগরিকদের চাকরি করার সুযোগ। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক ও বিমা কোম্পানী রয়েছে। এ পেশাতেও নানা ধরনের সুযোগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি ছাড়াও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী হিসেবে চাকরি করার সুযোগ আছে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে রয়েছে বেশ কিছু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

পোশাকশিল্প

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প বিখ্যাত। এদেশের তৈরি পোশাকের যেমন বিশ্বব্যাপী কদর আছে, তেমনি আছে পোশাক তৈরির বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতকারী শিল্পের। আমাদের দেশে আশির দশক থেকে রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে তৈরি পোশাকশিল্পের উন্নয়ন ঘটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এ শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজারও দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। এ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এ শিল্পে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে সুযোগ-সুবিধা এবং বেতন উপযুক্ত হওয়ার কারণে অনেক শিক্ষিত তরুণ পোশাকশিল্পে তাদের ক্যারিয়ার শুরু করেছেন। দেশের ক্রমবিকাশমান এ শিল্পে যে শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তা নয়। অর্ধশিক্ষিত এবং দেশের পিছিয়ে পড়া অনেক বেকার যুবক-যুবতী তাদের শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

গার্মেন্টস শিল্পে মার্চেন্টাইজার, ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ফ্যাশন ডিজাইনার, প্রোপিকশন কর্মকর্তা, বাণিজ্য বিষয়ক কর্মকর্তা ইত্যাদি পদে চাকরি করার সুযোগ রয়েছে। এ পদগুলো ছাড়াও আরও কিছু পদ রয়েছে সেখানেও কাজ করার প্রচুর সুযোগ আছে যেমন— ফিনিশিং, ইনচার্জ, কাটিং মাস্টার, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, ডাইং মেশিন অপারেটর, প্যাটার্ন মেকার ইত্যাদি। এসব পদে কাজ করে ক্যারিয়ারে সাফল্য অর্জন সম্ভব। পোশাকশিল্পের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই এ সেক্টরে সাফল্য অর্জন করা যায় না। গার্মেন্টস সেক্টরে যেহেতু অনেক ভাগ আছে তাই কোন বিষয়ে ক্যারিয়ার শুরু করবে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন।

নৌযান ও নৌপরিবহন শিল্প

সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরির কারিগর হওয়ার সুযোগ এখন আমাদের দ্বারপ্রান্তে। কারণ জাহাজশিল্পকে ঘিরে দেশে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত তৈরি হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশেও আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ রপ্তানি করছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে বাজার বাড়ায় দেশের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিয়ত দক্ষ জনবল খুঁজতে হচ্ছে। ফলে এ খাতে দিন দিন কাজের সুযোগ বাড়ছে। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী একজন নেভাল আর্কিটেক্ট জাহাজের নকশা প্রণয়ন করেন। পুরো জাহাজের নকশাকে আবার কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়। এরপর শিপ ব্লিডিং প্রকৌশলী ডিজাইন অনুযায়ী জাহাজের ওয়েলডিং, ফিটারিং, প্রিন্টিং ও গুণগত যন্ত্রাংশের ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেন। পুরো কাজটি করতে হয় নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

জাহাজশিল্পে শিপ বিল্ডিং প্রকৌশলীর পাশাপাশি সহকারী প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করার সুযোগ আছে। বিদেশেও ভালো বেতনে এ পেশার ব্যাপক চাহিদা ও কাজের সুযোগ আছে। বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সরকারিভাবে পরিচালিত নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি ও দুই বছর মেয়াদি শিপ বিল্ডিং, শিপ ফেব্রিকেশন ও শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স চালু রয়েছে।

অটোমোবাইল শিল্প

মানুষের চলাচলের প্রধান বাহন হচ্ছে গাড়ি। বিগত বছরগুলোতে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরে গাড়ির ব্যবহার বহুলাংশে বেড়েছে। আগের তুলনায় বর্তমানে দেশে অনেক বেশি গাড়ি আমদানি করা হচ্ছে। তোমরা জেনে আনন্দিত হবে যে বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক বাস, ট্রাক, অটোরিকশার শুধু চেসিস আমদানি করা হয়, এগুলো তৈরির কাজ এখানে সম্পন্ন হচ্ছে। আমদানিকৃত এসব গাড়ি পরবর্তী সময়ে সার্ভিসিং বা মেরামতের জন্যই অটোমোবাইল কারিগরি শিল্পের বিকাশ লাভ করছে দ্রুতগতিতে। এ শিল্পের নানা ধরনের কাজে দক্ষ অটোমোবাইল প্রকৌশলী প্রয়োজন। তাই অটোমোবাইল শিল্পে যারা আগ্রহী তাদের দৃষ্টি এখন এদিকেই।

অটোমোবাইল শিল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে নতুন গাড়ি তৈরি এবং তা বিক্রয় ও পরবর্তী সার্ভিসিং এবং মেরামতসহ যাবতীয় কারিগরি কাজ। সাধারণত এই শিল্পে কাজের ধরন বিবেচনায় তিনটি ভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: উৎপাদন, সেল এবং সার্ভিসিং। উৎপাদন ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রকৌশলীরা এক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা দেখানোর ব্যাপক সুযোগ পান। সেলস বিভাগে গাড়ি বিপণন, বিক্রয় ও বিতরণের কাজ করা হয়ে থাকে। গ্রাহকের কাছে গাড়ি সম্পর্কে ভালো ধারণা প্রদান ও ইঞ্জিন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা এই বিভাগের মূল দায়িত্ব। বিক্রয় পরবর্তী সার্ভিসিং বলতে ওয়ারেন্টিয়ুক্ত বা সার্ভিস ফি দিয়ে গাড়ি মেরামত ও সার্ভিসিং করা হলো সার্ভিসিং বিভাগের প্রধান কাজ।

২.৫ এলাকার শিল্প ও কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

এলাকার শিল্প ও কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র নিম্নরূপ উপাদানের আলোকে নির্ধারিত হয়। যেমন-

১. যোগাযোগ ব্যবস্থা।
২. গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৩. কাঁচামালের আধিক্য
৪. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
৫. শ্রমিকের সহজলভ্যতা
৬. বাজার ও অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা
৭. আবাসন সুব্যবস্থা প্রভৃতি

২.৬ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশা চিহ্নিত করা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই কারিগরি শিক্ষাই প্রথম বিবেচ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে যে যে পেশাগুলো অগ্রগণ্য তা হলো—

১. ডাক্তার
২. ইঞ্জিনিয়ার
৩. টেকনিশিয়ান
৪. নার্স
৫. ড্রাইভার
৬. দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি।

২.৭ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের (TVET) মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ধারণা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের (TVET) মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ধারণা সাধারণ মানুষের কাছে উদ্ভূতকরণের মাধ্যমে দেশকে খুব সহজেই এগিয়ে নেওয়া সহজ হয়। এজন্য দেশের ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ আরটিও (RTO) হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নারী ও বেকার যুবকদেরকে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া যায় এরূপ চিন্তা তাদের মাথায় ঢুকাতে হবে।

প্রশ্নমালা-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পেশা কী?
২. জীবিকা বলতে কী বোঝায়?
৩. অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে পেশার শ্রেণিবিন্যাস কীভাবে করা যায়?
২. অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা, উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারণা বিষয়ে যা জান লিখ।
৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশা চিহ্নিতকরণের উপায় বিবৃত কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ‘পেশা’ ও ‘জীবিকা’ উন্নয়নের ধারাবাহিকতার বিবরণ দাও।
২. বাংলাদেশে পেশার শ্রেণিবিন্যাস কর।
৩. অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা, উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারণা সম্পর্কে যা জান লিখ।

তৃতীয় অধ্যায় আত্মকর্মসংস্থান Entrepreneurship

ভূমিকা (Introduction)

নিজের জীবিকা নিজের প্রচেষ্টাতে অর্জনের অভিপ্রায়ে যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, তাই ব্যবসায় উদ্যোগ। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সকল উপাদান কাজ করে তন্মধ্যে ব্যবসায় উদ্যোগ অন্যতম। ব্যবসায় উদ্যোগ যে কোনো ধরনের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। উদ্যোগ বিষয়টি অর্থনীতিবিদ ক্যানটিলন সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে প্রচলন করেন। মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করে। জীবিকার উপায় হিসেবে কর্মসংস্থান সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির একান্ত কাম্য। উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, শিল্পে স্থবিরতার জন্য চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। তাই বেকার সমস্যা মারাত্মক আকারে দেখা দিচ্ছে। নিজের জীবিকা নিজের প্রচেষ্টাতে অর্জনের উপায় হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান। বর্তমান বিশ্বে কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান পেশা হিসেবে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

৩.১ কর্মসংস্থান ধারণা ও আত্মকর্মসংস্থান (Definition of Entrepreneurship)

নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করাকে কর্মসংস্থান বলে। সাধারণ অর্থে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো মানুষ অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাকে আত্মকর্মসংস্থান বা স্ব-কর্মসংস্থান বলা হয়। এ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কারও অধীনস্থ কর্মচারী হিসেবে কাজ না করে ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্কের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে। ব্যবসা হচ্ছে মূলত আত্মকর্মসংস্থানের উপায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, একজন জুতার কারিগর যখন একটি জুতা উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরিতে কর্মচারী হিসেবে কাজ না করে নিজেই জুতা তৈরি ও বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে, তখন তার এ পেশাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান একটি জনপ্রিয় পেশা। একটি দেশের বেশির ভাগ জনসাধারণ আত্মকর্মসংস্থান কর্মে নিয়োজিত। যেমন- খুচরা বিক্রেতা, রেডিও-টেলিভিশন মেকানিক্স, ডাক্তার, যন্ত্রপাতি মেরামত, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, নার্সারি, ফুল ও ফলের বাগান ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। কর্মসংস্থান বেতনভিত্তিক চাকরির বিকল্প পেশা এ পেশাকে স্ব-নিয়োজিত পেশাও বলা যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ডাক্তার যখন অন্য কোনো হাসপাতালে বেতনের বিনিময়ে চাকরি না করে নিজে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করেন, তখন ঐ ডাক্তারের উদ্যোগকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

- ১। এ.ই.বেইন (A.E.Eenn)- ‘আত্মকর্মসংস্থান হলো অন্যকে উপদেশ দেওয়া, পথ দেখানো, বা নির্দেশ প্রদানের এমন একটি বৃত্তি যেখানে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হয়’।
- ২। ড. এ.এইচ.এম. হাবিবুর রহমান (DR. A.H.M. Habibur Rahman)-এর মতে, ‘আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলতে বোঝায় যখন কোনো ব্যক্তি স্থায়ী দক্ষতা ও গুণাবলির বলে সেবাদানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা চালায়’।

কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ (Types of Employment)

জীবিকার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের পেশা গ্রহণ করে থাকে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মসংস্থানকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

- ১। মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি
- ২। আত্মকর্মসংস্থান
- ৩। ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

১। **মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি:** কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট মজুরি বা বেতন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির বিনিময়ে চাকরি গ্রহণ করা হলে তাকে মজুরি ও বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান বলে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য উচ্চ, মধ্যম, ও নিম্ন পর্যায়ে বহুসংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। ফলে চাকরি কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কাজের নিরাপত্তা, নিয়মিত আয় প্রবাহ, পদোন্নতি ও আনুষঙ্গিক সুবিধার জন্য কর্মসংস্থান হিসেবে চাকরি মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার না হওয়ায় বেতন ও মজুরিভিত্তিক চাকরি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। তাছাড়া দেশের সকল মানুষের জন্য বেতন ও মজুরিভিত্তিক চাকরি কর্মসংস্থান সম্ভবও নয়।

২। **আত্মকর্মসংস্থান:** নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে চাকরি না করে স্থায়ী যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ইলেকট্রিশিয়ান ইলেকট্রিক্যালের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলে তাকে আত্মকর্মসংস্থান পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়।

তাছাড়া আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক বেশ কয়েকটি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত যুব উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেসিক ট্রেড কোর্স ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা (NGO) গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নানাবিধ কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। যেমন- হস্ত শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাঠের কাজ, মেরামত কাজ, হাঁস মুরগি পালন, মাছের চাষ, শাক-সবজি চাষ, ফুলের চাষ, পোশাক তৈরি ইত্যাদি। এসব কাজে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এজন্য প্রয়োজন সামান্য প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগী মনোভাব। আয়ের ধারাবাহিকতা না থাকায় আমাদের দেশের মানুষ সহজে আত্মকর্মসংস্থান কাজে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না।

৩। ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ: কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোগের গুরুত্ব পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই স্বীকৃত। আমাদের দেশে ব্যবসার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অসীম সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। নিজ উদ্যোগে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করাকেই পেশা বলে আখ্যায়িত করা হয়। মালিক নিজেই তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করেন।

ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোগের উদাহরণ: মাল ক্রয় ও বিক্রয় করা, ব্যাংক, বিমা, হোটেল, কোচিং সেন্টার, দোকান, কুটির শিল্প, মুরগির খামার ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সরকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোগী যুবকদের ব্যাংক ঋণসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা দিচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিজস্ব বা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব স্থায় প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

৩.২ ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার সংজ্ঞা

আবার কোনো কিছু করার ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশকে উদ্যোগ বলে। ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মোদ্যোগকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে মুনাফা অর্জনের আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়াকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে। ব্যবসায় উদ্যোগ এমন কতগুলো গুণের সমষ্টি যা সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই কম বেশি পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নে ব্যবসায় উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

- ১। আর্থার কোল (Arther Kohl)-এর মতে, 'ব্যবসায় উদ্যোগ হলো এমন একটি উদ্দেশ্যমুখী কার্যক্রম, যেখানে সিদ্ধান্তগুলো পর্যায়ক্রমে মেনে চলা যায়'।

- ২। ফিনারি (Finnery)-এর মতে, 'সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ইচ্ছার প্রতি সাড়া দেওয়া এবং অর্থনৈতিক সুযোগকে কাজে লাগানো ও কাজের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষমতাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে'।
- ৩। বসু ও মৌলিকের মতে, 'ব্যবসায় উদ্যোগ হচ্ছে অর্থনৈতিক সুযোগকে বুঝে কাজে লাগানো প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকে লাভজনক করে তোলা'।
- ৪। জোসেফ এ. শুম্পিটার (Joseph A. Schumpeter)-এর মতে, 'ব্যবসায় উদ্যোগ হচ্ছে এমন এক কার্য যাতে নতুন পণ্য উৎপাদন, নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও নতুন বাজার অনুসন্ধান, পণ্যের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস অনুসন্ধান এবং প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নেওয়া ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করাকে বোঝায়।
- ৫। রবার্ট রনস্ট্যাট (Robert Ronstadt)-এর মতে, 'ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির সৃজনশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের গতিশীল প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে'।

পরিশেষে, উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, ব্যবসায় উদ্যোগ এমন একটি কার্যক্রমকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণসহ উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বিতরণ করে মুনাফা অর্জন করাকে বোঝায়।

ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা (Concept of Entrepreneurship)

কোনো কিছু করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করার নামই উদ্যোগ। শুধু ইচ্ছা পোষণ করলেই হয় না, সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার জন্য ঝুঁকি গ্রহণের মনোবৃত্তি থাকতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মনে কিছু সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, যে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কেউ কেউ বিশেষ প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রচেষ্টা ব্যাপক ঝুঁকি ও কষ্টসাধ্য জেনেও সে সাহসের সাথে এগিয়ে যায়। এটাই মানুষের উদ্যোগ বলে পরিচিত।

বাসন্তী গ্রামের আব্দুল গফুর হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক। তিনি গ্রামে সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। উন্নত জীবনযাপনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করার ইচ্ছা তিনি ছোটবেলা থেকেই পোষণ করতেন। এ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য শিক্ষকতার অবসরে পৈতৃক জমিতে পুকুর খনন করে মৎস্য চাষ করে আয়ের কিছু অংশ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করেছেন। সর্বোপরি তিনি তার আশা পূরণের জন্য দৃঢ় মনোবল নিয়ে শ্রম দিচ্ছেন। এই কর্মপ্রচেষ্টাই তার উদ্যোগ। উদ্যোগ মানুষের এমন একটি বড় গুণ যা তার ভিতরের সুপ্ত বাসনা বা ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে অনুপ্রাণিত করে।

ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বোঝায় লাভের আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া। ব্যবসায় উদ্যোগ এমন কতগুলো গুণের সমষ্টি, যা সমাজের অনেক লোকের মধ্যেই কম-বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ শ্রেণির লোকেরা দেশের বস্তুগত সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। অর্থনীতির ভাষায়, এ শ্রেণির লোকেরাই ব্যবসায় উদ্যোক্তা। তাদের বিরল উদ্যোগপূর্ণ কার্যাবলিই ব্যবসায় উদ্যোগ।

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসায় উদ্যোক্তার ভূমিকা একান্ত অপরিহার্য। উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ইতিহাস পাঠ করে আমরা জানতে পারি, এদের উন্নয়নের মূলে রয়েছে ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোক্তার ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ব্যবসায় উদ্যোক্তার সংজ্ঞা (Definition of Entrepreneur)

ফরাসী শব্দ হতে Entrepreneur হতে Entrepreneur শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছু করার দায়িত্ব গ্রহণ বা উদ্যোগ গ্রহণ করা। Entrepreneur-এর প্রতিশব্দ বাংলায় ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

সাধারণ অর্থে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণসহ অর্থ সরবরাহ করে থাকেন, তাকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা হয়। নিম্নে ব্যবসায় উদ্যোক্তার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

- ১। অর্থনীতিবিদ ক্যান্টিলন (Cantillon) সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে ব্যবসায় উদ্যোক্তার ধারণাটি প্রচলন করেন। তাঁর মতে, ‘ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন, যার বিক্রয় মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় অনিশ্চিত’।
- ২। ডেভিড ম্যাকলেলান্ড (David Mclelland)-এর মতে, ‘ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি উৎপাদনের উপকরণসমূহের নিয়ন্ত্রণ করে আয় উপার্জনের লক্ষ্যে বিক্রির জন্য ভোগের অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করেন’।
- ৩। আধুনিক অর্থনীতিবিদ জোসেফ এ সুমপিটার (Joseph A Schumpeter)-এর মতে, ‘ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন ও উন্নয়ন গতি সঞ্চালন করেন’।
- ৪। জে বি ছে (J B Say) এর মতে, ‘ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন অর্থনৈতিক প্রতিনিধি যিনি পণ্য উৎপাদনের সকল উপাদান যেমন শ্রমিক, মূলধন, ভূমি একত্রিত করেন, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করেন যার ফলে উপকরণসমূহের ব্যবহার এবং মূলধন পুনর্গঠন নিশ্চিত হয় এবং শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের সুদ ও জমির খাজনা পরিশোধ করা যায় এবং তার প্রত্যাশিত মুনাফার ব্যবস্থা হয়’।
- ৫। ডব্লিউ এফ. গুইচ (W.F Gluech) এর মতে, ‘ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি নতুন ফার্ম সৃষ্টি করেন এবং কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত তা পরিচালনা করে যান’।
- ৬। এফ.এইচ. নাইট (F.H. Knight) –এর মতে, ‘ব্যবসায় উদ্যোক্তা হলো একদল বিশেষায়িত ব্যক্তি যারা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করেন এবং ঝুঁকি বহন করেন’।

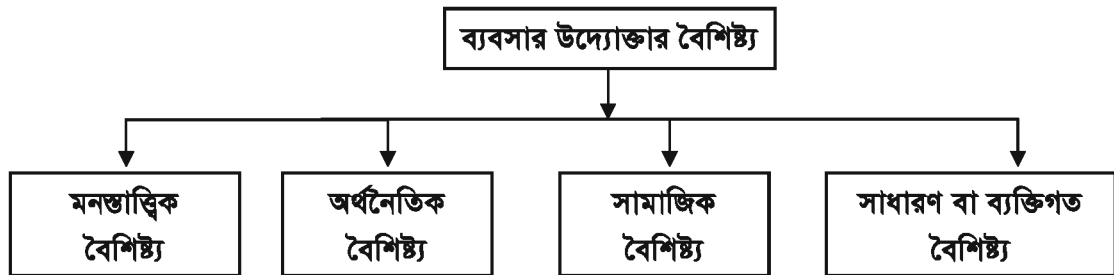
৭। আর.আই রবিনসন (R.I. Rabinson)-এর মতে, ‘ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজ প্রচেষ্টায় একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রেরণার মাধ্যমে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসেন’।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে, ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্বীয় উদ্যম, কর্মস্পৃহা, উদ্ভাবনী ব্যক্তি ও প্রেরণা দিয়ে একটি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করে একে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩.৩ ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিন্যাস

ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Entrepreneur)

ব্যবসায় সাফল্য শুধু মূলধন ও অন্যান্য উপকরণের উপর নির্ভর করে না। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন একজন সফল উদ্যোক্তা। কেননা একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক যোগ্যতার উপর ব্যবসায়ের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই একজন সফল ব্যবসায় উদ্যোক্তা হতে হলে তাকে কতকগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। তাই অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীগণ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপে নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন:



- ১। মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Psychological Features) : মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাফল্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, স্বীকৃতি, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, মনোভাব, সৃজনশীল, উদ্ভাবনী শক্তি, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস, প্রতিশ্রুতি, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা, দূরদৃষ্টি, জানার ইচ্ছা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
- ২। অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (Economic Feature) : উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পেশাগত অভিজ্ঞতা, মূলধনের জোগান ও ব্যবহার ক্ষমতা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ইত্যাদি অন্যতম।

- ৩। সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social Features): উদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা পৈতৃক গুণাবলির প্রতিফলন, সামাজিক কার্যকলাপে উদ্যোগ গ্রহণ, বংশমর্যাদা ও পারিবারিক মর্যাদা অন্যতম।
- ৪। সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (General Personal Features): উদ্যোক্তার সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শিক্ষা, বয়স, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, বিক্রয় করার গুণাবলি, কৌশল, সততা, অর্থের প্রতি আগ্রহ, ত্যাগী মনোভাব, পরিশ্রমী, আন্তরিকতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

- ১। সাংগঠনিক ক্ষমতা: ব্যবসায়ে পৌঁছার উদ্দেশ্যে একজন উদ্যোক্তার আকর্ষণীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি, শ্রম, মূলধন ও অন্যান্য উপাদান সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর উপর প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভর করে।
- ২। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা: ব্যবসায় সম্পর্কিত রীতিনীতি, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান ও সমস্যার সমাধান সম্পর্কে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য উদ্যোক্তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।
- ৩। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব: ব্যক্তিত্বহীন মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। তাই ব্যবসার সাফল্যের জন্য উদ্যোক্তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার। এর ফলে ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে নিশ্চিত হয়।
- ৪। নেতৃত্বের যোগ্যতা: উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের গতিশীল অধিনায়ক বলা হয়। কারণ তার সুষ্ঠু নেতৃত্বের উপরই ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে। তাই একজন উদ্যোক্তার নেতৃত্বসুলভ গুণ থাকা আবশ্যিক।
- ৫। বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতা: যে কোনো উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার সম্ভাবনাসমূহ ও বুদ্ধিমত্তা সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হয়।
- ৬। উদ্ভাবন ক্ষমতা: উদ্যোক্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উদ্ভাবন করার ক্ষমতা। উদ্যোক্তা তার নিজের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পণ্য, নতুন বাজার, উৎপাদন কৌশল, নতুন শিল্প গঠনের কৌশল উদ্ভাবন করেন।
- ৭। দূরদর্শিতা: কারবারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্ক উদ্যোক্তাকে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। কারণ উদ্যোক্তার দূরদর্শিতার সঠিকতার উপর কারবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।
- ৮। সাফল্য লাভে ইচ্ছা: সাফল্য লাভের ইচ্ছা একজন উদ্যোক্তার অবশ্যই থাকতে হবে। কেননা সাফল্য লাভের তীব্র ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা একজন লোককে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
- ৯। স্বাধীনতা: এটি একজন উদ্যোক্তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রেরণা জোগায় ও শিল্প উদ্যোগী হতে সহায়তা করে।

- ১০। মানসিক শক্তি ও সামর্থ্য: একজন উদ্যোক্তার মধ্যে ব্যবসায়ের সাফল্য, ব্যর্থতা এবং অনিশ্চয়তাসমূহ সহজভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে হবে।
- ১১। আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়: আত্মবিশ্বাস একজন উদ্যোক্তাকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে এবং অধ্যবসায় উদ্যোক্তাকে পরিশ্রমী হতে সহায়তা করে।
- ১২। ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাব: ঝুঁকিবিহীন কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই একজন উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাব থাকতে হবে।
- ১৩। সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা: ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত নানা বিষয় যেমন: ভোক্তাদের সম্পর্কে, ব্যবসায়ের রীতিনীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
- ১৪। সাহস ও মনোবল: একজন ব্যবসায়িক উদ্যোক্তার যথেষ্ট সাহস ও মনোবল থাকতে হবে। সাহস ও মনোবলের অধিকারী না হলে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।
- ১৫। আর্থিক উন্নতির আগ্রহ: উদ্যোক্তা আর্থিক উন্নতি লাভের পক্ষে ক্রমাগত কাজ করে যান। উল্লেখিত আগ্রহ তাকে সাফল্য লাভের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ব্যবসায় উদ্যোক্তার গুণাবলি (Qualities of Entrepreneur)

একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ও গুণাবলির উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তা হতে হবে তাকে কতগুলো গুণের অধিকারী হতে হবে। নিম্নে শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর।

- ১। দূরদৃষ্টি (Vision): উদ্যোক্তা হচ্ছেন সমাজে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। তার চিন্তাচেতনা, ভবিষ্যৎ অনুমানের ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা সবই অন্য সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু আলাদা। তিনি তার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে বাজারে অব্যবহৃত সুযোগটি খুঁজে বের করেন।
- ২। উদ্ভাবনী শক্তি (Innovative Power): শিল্পোদ্যোক্তা উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। উৎপাদনের নতুন প্রক্রিয়া সৃষ্টি, কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান, বাজার অনুসন্ধান, নতুন পণ্য সৃষ্টি, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি শিল্পোদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তির বিভিন্ন দিক।
- ৩। কৃতিত্বার্জনের আকাঙ্ক্ষা (Need for achievement): কৃতিত্বার্জনের আকাঙ্ক্ষা শিল্পোদ্যোক্তার একটি ব্যতিক্রমধর্মী গুণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কম-বেশি কৃতিত্বার্জনের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। তবে যাদের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত তীব্র তারা তাদের উপর অর্পিত কাজ কৃতিত্ব ও সাফল্যের সাথে সম্পাদন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।
- ৪। সৃজনশীলতা (Creativity): সৃজনশীলতা শিল্পোদ্যোক্তার একটি অন্যতম গুণ। দূরদর্শিতা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এদেরকে নতুন কিছু সৃষ্টির পথে সহায়তা নতুন কিছু সৃষ্টির আনন্দই তাদের পরম তৃপ্তি।

- ৫। স্বাবলম্বী বা স্বাধীনচেতা (Self dependent): শিল্পোদ্যোক্তাদের একটি বড় গুণ হলো তারা আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পছন্দ করেন। তাদের উপর অন্যের নিয়ন্ত্রণ তারা পছন্দ করেন না।
- ৬। আত্মবিশ্বাস (Self Confidence): ব্যবসায় জগতে যে কোনো শিল্পোদ্যোগ কর্মে সাফল্য অর্জন এবং টিকে থাকতে হলে একজন শিল্পোদ্যোক্তার নিজের কর্মদক্ষতার উপর অসমান্য বিশ্বাস থাকতে হবে। এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে শত প্রতিবন্ধকতার মাঝেও সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।
- ৭। কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা (Commitment to work): শিল্পোদ্যোক্তা যখন কোনো কাজে হাত দেন তিনি তা গভীর মনোযোগের সাথে সম্পাদন করেন। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজেকে কাজে নিয়োজিত রাখেন।
- ৮। নেতৃত্ব (Leadership): অন্যকে প্রণোদিত করে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব বলে। শিল্পোদ্যোক্তা কারবারের একজন নেতা। সুতরাং উদ্যোক্তার নেতৃত্বের গুণে মুগ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা দৃঢ়তার সাথে কাজ সম্পন্ন করতে ব্রতী হয়।
- ৯। ত্যাগ ও চালনা শক্তি (Sacrifice and Drive): একটি ব্যবসা সাফল্যের সাথে পরিচালনা করতে যে অসামান্য ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম এবং অফুরন্ত চালনাশক্তির প্রয়োজন সেসব গুণ একজন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে থাকে। সফল শিল্পোদ্যোক্তাদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়, তারা আরাম আয়েস বিসর্জন দিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একাগ্রচিত্তে কাজ করে গেছেন।
- ১০। ঝুঁকি গ্রহণ (Taking risk): ঝুঁকি গ্রহণ উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যদিও মুনাফা লাভের আশায় কারবারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তবু সেখানে লোকসানের ঝুঁকিও নিতান্ত কম নয়। একজন উদ্যোক্তাকে তাই সব সময় পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়।
- ১১। আশাবাদিতা (Aspiration): ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জনের জন্য লক্ষ্যসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণকে আশাবাদিতা বলে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা করেন এবং প্রত্যাশা নিয়ে তিনি অজানা পথে পাড়ি দেন।
- ১২। কাজের স্বীকৃতি (Recognition): ব্যবসায় থেকে মুনাফা অর্জনই শিল্পোদ্যোক্তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। নতুন পণ্য উপহার দিয়ে জনগণের স্বীকৃতি লাভ করাকেই তিনি তার পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে গণ্য করে থাকেন।
- ১৩। ভুল বুঝতে পারার ক্ষমতা (Ability to understand mistake): একজন শিল্পোদ্যোক্তা সব সময় নিজের ভুল বুঝতে পেরে তা অকপটে স্বীকার করেন এবং ঠিক সময়ে তা সংশোধন করে নেন। তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন হন।

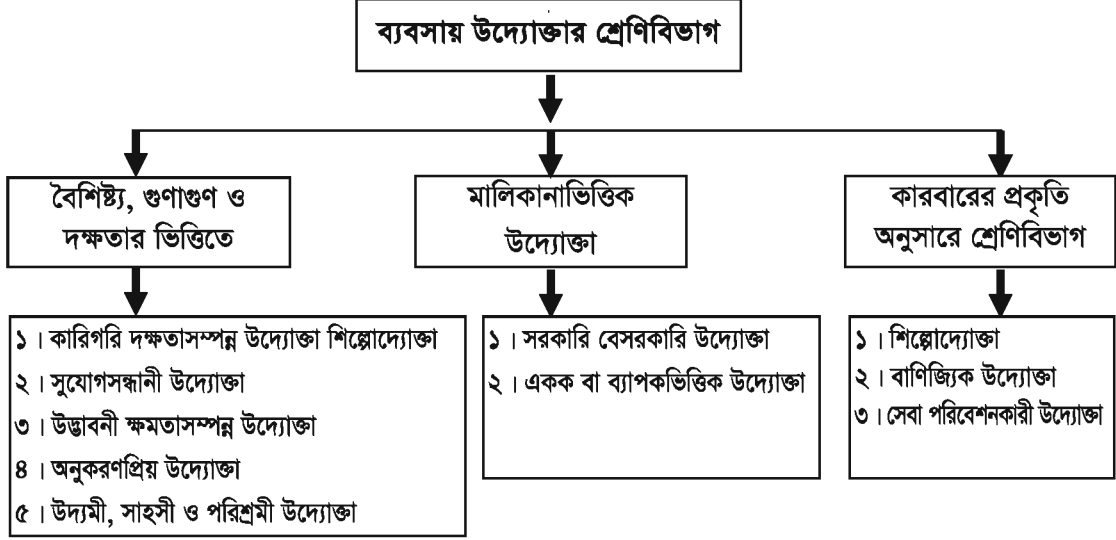
- ১৪। **তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী (Intelligent):** বুদ্ধিমত্তা শিল্পোদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাই তাকে অন্য সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে দেয়। এ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি যে কোনো পরিস্থিতিতে সুন্দরভাবে সামাল দিতে পারেন।
- ১৫। **সাংগঠনিক দক্ষতা (Organizing Capacity):** প্রতিষ্ঠানের অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে হলে একজন উদ্যোক্তার জন্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জন অপরিহার্য। সঠিকভাবে কারবার সংগঠিত না হলে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।
- ১৬। **অর্থের প্রতি মনোভাব (Attitude to money):** শিল্পোদ্যোক্তা অর্থের প্রতি আগ্রহী হলেও লোভী নন। উদ্যোক্তার কাছে অর্থ একটি বড় সম্পদ এবং তিনি একে মূল সম্পদ সৃষ্টিতে বিনিয়োগ করেন।
- ১৭। **পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী (Believe in change):** প্রকৃত উদ্যোক্তাগণ বিশ্বাস করেন যে, তাদের কর্ম দিয়ে পরিবেশ পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। তারা সব কিছু ভাগ্য ও আল্লাহর উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।
- ১৮। **ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ (Lesson from failure):** কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ শিল্পোদ্যোক্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। অকৃতকার্যতা শিল্পোদ্যোক্তাকে নিরাশ করে না। বরং তিনি ব্যর্থতার কারণগুলোকে খুঁজে বের করে সে ব্যাপারে সচেতন হন।
- ১৯। **সামাজিক দায়িত্ববোধ (Social Responsibility):** সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন শিল্পোদ্যোক্তার কর্ম প্রচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত। তার কর্ম দিয়ে সমাজের উপকার হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে মানুষের অভাব পূরণে সাহায্য করেন। এ ছাড়াও সমাজসেবামূলক কাজ করে তিনি মানুষের উপকার করে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে কোনো কাজে সফল হতে হলে একজন উদ্যোক্তার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলি অবশ্যই থাকতে হবে। তিনি অন্য সাধারণ মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। যে শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে এসব গুণা যত বেশি পরিমাণ বিদ্যমান থাকবে তিনি হবেন তত সফল শিল্পোদ্যোক্তা।

ব্যবসায় উদ্যোক্তার শ্রেণিবিভাগ

Classification of Entrepreneur

উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিচার করলে শিল্পোদ্যোক্তাকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।



নিম্নে ব্যবসায় উদ্যোক্তার শ্রেণিবিভাগগুলো আলোচনা করা হলো

- ১। **কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা (Technical entrepreneur):** এ ধরনের উদ্যোক্তাগণ যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ করিৎকর্মা ও বাস্তবমুখী। তারা জনসংযোগের তেমন একটা ধার ধারেন না বরং ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এ ধরনের উদ্যোক্তাগণ ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বেশি আগ্রহী। কারণ বড় প্রতিষ্ঠান তারা পছন্দ করেন না। ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে এরা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ করেন।
- ২। **সুযোগসন্ধানী উদ্যোক্তা (Opportunistic entrepreneur):** যে সকল শিল্পোদ্যোক্তা বাজারে বিদ্যমান সুযোগকে ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়নে চেষ্টা করেন, তাদেরকে সুযোগ সন্ধানী শিল্পোদ্যোক্তা বলে। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে কাজ করে থাকেন। তারা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যে কোনো সুযোগ গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে থাকেন। তারা নিজেদের কারিগরের চেয়ে একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে গণ্য করতে আগ্রহী। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ অধিক জনসংযোগে বিশ্বাসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন।
- ৩। **উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা (Innovative entrepreneur):** এ ধরনের উদ্যোক্তাগণ যথেষ্ট উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। ব্যবসায়ের নিত্যনতুন ক্ষেত্র ও কলাকৌশল উদ্ভাবন, নতুন পণ্য আবিষ্কার ও বাজার সৃষ্টি, নতুন কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তারা নিজের উদ্যোগে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন, উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করে পণ্য উৎপাদন করেন এবং প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখার চেষ্টা করেন। এ ধরনে শিল্পোদ্যোক্তারা উদ্ভাবন কার্য পরিচালনায় এবং উদ্ভাবনী কার্যসমূহকে শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহারে আগ্রহী।

- ৪। **অনুকরণপ্রিয় উদ্যোক্তা (Imitative entrepreneur):** এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ নিজের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে অন্যের দ্বারা উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত এবং প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল অনুকরণ করতে আগ্রহী। এদের প্রধান লক্ষ্য অন্যের উদ্ভাবনমূলক কাজকে অনুকরণ করে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি সাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। অনুন্নত দেশসমূহে সাধারণত এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তা পরিলক্ষিত হয়। তারা উন্নত দেশের উৎপাদন কৌশল নিজের দেশে প্রয়োগ করে সফলতা আনার প্রয়াস চালান।
- ৫। **উদ্যমী, সাহসী ও পরিশ্রমী উদ্যোক্তা (Dynamic and labourious):** এ ধরনের উদ্যোক্তাদের প্রচণ্ড সাহস ও উদ্যম থাকে। এ ধরনের উদ্যোক্তাকে নানাবিধ ঝুঁকি ও সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। তাই উদ্যম সাহস নিয়ে উক্ত ঝুঁকি সামলাতে তাদেরকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। এরা উদ্যমী, সাহসী ও পরিশ্রমী হয় বলেই পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তারা নিজেরা যেমন উদ্যমী, সাহসী ও পরিশ্রমী, অন্যদেরকেও অনুরূপ হতে উৎসাহী করেন।

মালিকানাভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা

(ক) **সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ:** মালিকানা ভেদে শিল্পোদ্যোগকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে ভাগ করা যায়। শিল্পোদ্যোগ সাধারণত একটি বেসরকারি কার্যকলাপ হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ ও প্রসার লাভ করেছে। যেসব দেশে বৈদেশিক মূলধনের অভাব এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিল্পোদ্যোক্তার স্বল্পতা রয়েছে সেসব দেশে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাসহ শিল্পায়নে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে সেক্টর কর্পোরেশন এবং আরো কিছুসংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি শিল্প স্থাপন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

(খ) **একক এবং ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ:** শিল্পোদ্যোগকে আবার একক এবং ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ হিসেবে বিভক্ত করা যায়। পাকিস্তান আমলে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দেশে পরিবারভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারের সামগ্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা পরিবারভিত্তিক একদল বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকে একক শিল্পোদ্যোগ বলা হয়। এভাবে সরকারি নীতির মাধ্যমে ভাগ্যবান শিল্পসমৃদ্ধ পরিবার সৃষ্টির ফলে একটি অনগ্রসর অর্থনীতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

যেসব দেশে উন্নয়নের ব্যাপক অংশজুড়ে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি জড়িত, সেখানে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির প্রয়োজন সর্বাধিক। এ ধরনের ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ কৌশল দেশের বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার ও অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বাংলাদেশের প্রকট বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ আবশ্যিক।

কারবারের প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ (Classification based on nature of business):

১। শিল্পোদ্যোক্তা (Industrial entrepreneur): যে সমস্ত উদ্যোক্তা রাষ্ট্রীয় সম্পদের রূপগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন পরিচালনা করে থাকে তাদেরকে শিল্পোদ্যোক্তা বলে। দেশে বৃহদায়তন কারবার গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সব উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

২। বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা (Commercial entrepreneur): এ ধরনের উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বস্টন প্রণালির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এরা উৎপাদকের কাছ থেকে ব্যাপক হারে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করে। খুচরা বা পাইকারি ব্যবসায়ী এ শ্রেণির উদ্যোক্তার অন্তর্ভুক্ত।

৩। সেবা পরিবেশন উদ্যোক্তা (Service agent entrepreneur): যে সকল উদ্যোক্তা মানুষের জনকল্যাণমূলক এবং অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সেবাকর্মের সৃষ্টি ও সেগুলোর বিতরণের উদ্দেশ্যে কারবার গঠন করেন তাকে সেবা পরিবেশক উদ্যোক্তা বলে। যথা-ব্যাংক, পরিবহন সংস্থা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইত্যাদি।

মানুষ তার জীবিকার জন্য কোনো না কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। জীবিকার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ব্যবসা উদ্যোগ পেশা। পেশা হিসেবে ব্যবসা উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম, নতুন ব্যবসা স্থাপন ও বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসীম।

কোনো ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পদ্ধতিই হচ্ছে ব্যবসায় পেশা। এই ব্যবসা খুচরা, পাইকারি, পণ্য উৎপাদন, পণ্য বিতরণ ও সেবাসমূহ হতে পারে। এ পেশা থেকে আয় উপার্জনের সম্ভাবনা অতি সামান্য, মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে ক্রমে ক্রমে সেই ব্যবসার সম্প্রসারণ করে অনেকেই বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। যেমন-শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম, রণদা প্রসাদ সাহা, হাজী মোহাম্মদ জুনাব আলী প্রমুখ।

আমাদের দেশে স্বল্প মূলধনের সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবসা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এদেশে প্রকট বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে তরুণদের ব্যবসাকে বিকল্প পেশা হিসেবে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সম্ভাবনাময় কৌশল হতে পারে। ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে একদিকে একজন তরুণ তার নিজের জন্য কর্মসংস্থানের উপায় খুঁজে পাবে, অন্যদিকে আরো কিছু তরুণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এতে শ্রমবাজারের উপর চাপ কমে যাবে এবং দেশের সমগ্রিক বেকার সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাবে।

৩.৪ ক্ষুদ্র ব্যবসার সংজ্ঞা, পরিধি ও সুবিধাসমূহ

ক্ষুদ্র ব্যবসার সংজ্ঞা (Definition of Small Business): ব্যবসার প্রকৃতি, বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ, শ্রমিক কর্মীর সংখ্যা, যন্ত্রপাতির সংখ্যা, উৎপাদন ক্ষমতা, ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ ও লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবসার আয়তনকে ক্ষুদ্র ব্যবসা, মাঝারি ব্যবসা ও বৃহদায়তন ব্যবসা এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক্ষুদ্র ব্যবসা: অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োগ করে ক্ষুদ্র পরিসরে পণ্যদ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন অথবা বিভিন্ন উৎপাদনকারী বা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে তা ব্যবহারকারীর কাছে বিক্রয় কার্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষুদ্র ব্যবসা বলে। যেমন— কুটির শিল্প এক মালিকানা খুচরা ব্যবসায়। বাংলাদেশে সরকারিভাবে স্বল্প পুঁজি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা বিনিয়োগকৃত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ব্যবসা বলে গণ্য করা হয়।

ক্ষুদ্র ব্যবসার সুবিধাসমূহ (Advantage of Small Business)

আধুনিক ব্যবসাজগতে সংখ্যাগত দিক থেকে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের তুলনায় ক্ষুদ্র ব্যবসার নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। নিম্নে ক্ষুদ্র ব্যবসার সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

- ১। **সহজ গঠনপ্রণালী:** ক্ষুদ্র ব্যবসা গঠন করা খুব সহজ। যে কোনো লোক তার পছন্দ মতো ক্ষুদ্র ব্যবসা সংগঠিত করে ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করতে পারে।
- ২। **মূলধন গঠনের সুবিধা:** ক্ষুদ্র ব্যবসা স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হয়। ফলে এর মালিক সহজেই কাক্ষিত পরিমাণ মূলধনের সংস্থানের মাধ্যমে ব্যবসা গঠন করতে পারে।
- ৩। **আইনের জটিলতামুক্ত:** ক্ষুদ্র ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য আইনগত কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। তাই সহজে এরূপ ব্যবসা গঠন করা যায়।
- ৪। **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** ক্ষুদ্র ব্যবসায় সাধারণত এক মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। মালিক নিজেই ব্যবসার সকল সম্পত্তির মালিক বিধায় এরূপ ব্যবসা যে কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- ৫। **পরিবর্তনশীল:** ভোক্তাদের রুচির সাথে তাল মিলিয়ে যে কোনো সময়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা সম্ভব। এতে ব্যবসায়ীর পক্ষে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সহজ হয়।
- ৬। **তত্ত্বাবধান:** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিক নিজেই ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। এতে তার পক্ষে ব্যবসায়ের যাবতীয় বিষয় ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করা সহজ হয়।
- ৭। **ভোক্তাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক:** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো এর মাধ্যমে ভোক্তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে ভোক্তাদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা যায়।

৮। **উত্তম মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক:** ক্ষুদ্র ব্যবসায় সীমিত সংখ্যক শ্রমিক বা কর্মচারী থাকে। যাদের সহযোগিতায় মালিক তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

৯। **ব্যক্তিগত দক্ষতার বিকাশ:** ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিককে ব্যবসায়িক বিভিন্ন কার্যক্রম নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হয়। এতে ব্যবসাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়, যা তার ব্যবসায়িক দক্ষতা পরিচায়ক।

১০। **ভোক্তাদের সুবিধা:** ক্ষুদ্র ব্যবসা যে কোনো স্থানে গঠন করা যায়। এ ধরনের ব্যবসা ভোক্তাদের আবাসিক এলাকার আশপাশেই সাধারণত গড়ে ওঠে। এতে ভোক্তারা তাদের চাহিদামাফিক পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পায়।

১১। **ব্যক্তিগত উদ্যোগ:** ক্ষুদ্র ব্যবসার অর্জিত সুফল সবটুকুই মালিকের নিজের প্রাপ্য। তাই ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য মালিকের প্রচেষ্টার অভাবে দেখা দেয় না।

ক্ষুদ্র ব্যবসার অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Small Business)

ক্ষুদ্র ব্যবসা হতে অর্জিত সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **মূলধনের অপরিপূর্ণতা:** ক্ষুদ্র ব্যবসার মূলধনের স্বল্পতা একটি প্রধান অসুবিধা। মূলধনস্বল্পতার কারণে এটি অনেক সময় ব্যবসায়িক সুযোগ কাজে লাগাতে পারে না।

২। **স্থায়িত্বের অভাব:** ক্ষুদ্র ব্যবসার অস্তিত্ব মালিকের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। যে কোনো কারণে মালিকের অস্তিত্ব বিলীন হলে ব্যবসারও বিলোপ ঘটে।

৩। **অসীম দায়:** ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিককে ব্যবসায়ের সমুদয় দায় বহন করতে হয়। কোনো কারণে ব্যবসায় দেনা হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও দায়বদ্ধ হয়।

৪। **আয়তনগত সীমাবদ্ধতা:** স্বল্প মূলধন নিয়ে এ ধরনের ব্যবসা গঠিত হয় বিধায় সীমিত পরিসরে এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলে এর মাধ্যমে কখনও বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করা যায় না।

৫। **সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা:** ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতার কারণে এগুলোর সম্প্রসারণে সুযোগ কাজে লাগানো যায় না।

৬। **কর্মচারীদের অসুবিধা:** ক্ষুদ্র ব্যবসার আয়তন ছোট হওয়ার দরুন এ কারবারে নিযুক্ত কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা যেমন পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হয় না এতে দক্ষ কর্মচারী অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যায়।

৭। **মালিকের খামখেয়ালিপনা:** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিকের খামখেয়ালিপনার জন্য কর্মচারীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অনেক সময় বিনা কারণে কর্মচারীদের বিদায় করে দেওয়া হয়।

বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় টিকে থাকার কারণসমূহ

Causes for the Co-existence of small Business along with large scale ones

আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুবিধা প্রাপ্তি বৃহদায়তন ব্যবসার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসার অস্তিত্বের কথা সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা রয়েছে যা কেবল ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। যে কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসা টিকে আছে তা নিম্নরূপ :

১। **সহজ গঠনপ্রণালি:** ক্ষুদ্র ব্যবসা গঠন করা খুবই সহজ। এরূপ ব্যবসা গঠনে আইনগত কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। তাই অনেকে জীবিকা অর্জনের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা গঠন করে থাকে।

২। **স্বল্প মূলধন:** ব্যবসার জগতে কিছু কিছু ব্যবসা রয়েছে যেগুলো গঠন করার জন্য খুবই স্বল্প মূলধন প্রয়োজন হয়। যেমন- মুদি দোকান, সেলুন, লড্রি, পান বিড়ি ও সিগারেটের দোকান প্রভৃতি।

৩। **সীমিত চাহিদা:** যে সমস্ত পণ্যের চাহিদা স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ, সেগুলো উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বৃহদায়তন ব্যবসা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যবসা লাভজনক। যেমন- ফলমূল ও শাক-সবজির দোকান।

৪। **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা:** সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছেন যারা অন্যের অধীনে কাজ করাকে পরাধীনতা মনে করেন। এ শ্রেণির লোকজন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য নিজ উদ্যোগে স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করেন।

৫। **মালিকের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান:** যে সমস্ত কারবারের মালিকের সরাসরি তদারক আবশ্যিক সেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসাই উত্তম।

৬। **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** যে সকল ব্যবসা উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন সেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসার কোনো বিকল্প নেই। ব্যবসার যে কোনো ব্যাপারে মালিক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৭। **নিশ্চিত সাফল্য:** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের কাজের পরিধি থাকে সীমিত। তাছাড়া এ ধরনের ব্যবসা মালিকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ফলে সহজেই ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করা যায়।

৮। **অবস্থানগত সুবিধা:** ক্ষুদ্র ব্যবসা ভোক্তাদের কাছাকাছি যে কোনো স্থানে স্বল্প পরিসরে গড়ে তোলা যায়। ভোক্তাদের কাছে সরাসরি পণ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসার জুড়ি নেই।

৯। **পরিবর্তনশীল চাহিদা:** যে সমস্ত পণ্যের চাহিদা সর্বদাই পরিবর্তনশীল, সেগুলো ক্ষুদ্র ব্যবসা হওয়াই উত্তম। যেমন- দর্জির দোকান ও আসবাবপত্রের দোকান।

১০। **ব্যবসায়ের প্রকৃতি:** ব্যবসার জগতে এমন অনেক ব্যবসা আছে যেগুলো প্রকৃতিগত দিক থেকে ক্ষুদ্রায়িত হয়ে থাকে। যেমন- লেছ ফিতাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, অ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য বিক্রেতা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে বৃহদায়তন কারবার গঠন করা মোটেই সম্ভব নয়। এ জন্যই বৃহদায়তন ব্যবসার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায় বহাল তবীয়তে টিকে আছে।

৩.৫ বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব

বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি সমস্যা এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে জর্জরিত করে রেখেছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। বেকারত্ব দূরীকরণ: বর্তমানে বেকারত্ব বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোর অন্যতম। এ দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই বললেই চলে। সরকারের একার পক্ষে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব মোকাবিলায় আর কোনো পথ নেই। মোট কথা, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমেই বিপুল বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

২। দারিদ্র্য দূরীকরণ: আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ড বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে জনগণকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা সচল করে দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩। মূলধন গঠন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি: আত্মকর্মসংস্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা গেলে তাদের মধ্যে সঞ্চয়প্রবণতা বেড়ে যায়। সঞ্চয় বৃদ্ধি মূলধন গঠনে সহায়তা করে। তাই মূলধন গঠন ও সঞ্চয় বৃদ্ধিতে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। অর্থনৈতিক উন্নয়ন: আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নতুন নতুন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

৫। জনশক্তির সদ্যবহার: জনশক্তি একটি দেশের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয় তখনই, যখন তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু এ জনশক্তিকে কাজে লাগাতে না পারলে তা দেশ ও জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তির সদ্যবহার নিশ্চিত করতে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব রয়েছে।

৬। দেশপ্রেমে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা: দেশপ্রেমে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বেচ্ছামূলক কাজে উৎসাহিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি: আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম জনসাধারণের আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়। এর ফলে তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

৮। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি: কর্মহীন বেকারদের কেউ পছন্দ করে না। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের কাজের সংস্থান করা গেলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৯। মানবসম্পদ উন্নয়ন: যুবসমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা যায়। এ জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

১০। জাতীয় আয় বৃদ্ধি: আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার ফলে দেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

১১। উদ্যোক্তা সৃষ্টি: আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ মুনাফা অর্জন করে। এতে করে দেশে নতুন উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়।

১২। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার: অধিকাংশ ব্যবসায়ের কাঁচামাল প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আসে ফলে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

১৩। সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক বেকার লোককে স্বকর্মে নিযুক্ত করার মাধ্যমে সামাজিক বিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরিশেষে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যপীড়িত জনবহুল উন্নয়নশীল দেশে আত্মকর্মসংস্থানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে এদেশে শুধু দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূরীভূত হবে তা নয় বরং সামাজিক অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকেও দেশকে বাঁচানো সম্ভব।

৩.৬ একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য লাভ এবং ব্যর্থতার কারণসমূহ

Reasons for Success and Failure in Business of an Entrepreneur

একজন উদ্যোক্তার উদ্যোগ সফল হওয়ার উপর শুধু উদ্যোক্তার নিজের উন্নয়ন নির্ভর করে না বরং দেশ ও দেশের উন্নতিও নির্ভর করে। উদ্যোক্তার উদ্যোগ সফল বা ব্যর্থ হওয়া অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে, সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন, তারাই কেবল সফল হন। নিম্নে ব্যবসায় সফল ও ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো আলোচনা করা হলো:

১। ব্যবসায় সঠিক পণ্য নির্ধারণ: সঠিক পণ্য নির্ধারণ ব্যবসায় সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে কোনো পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে পণ্যের বাজার চাহিদা কীরূপ, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। গবেষণার ফল থেকে জানা যায় যে বহুল ব্যবহৃত পণ্যের চেয়ে নতুন সম্ভাবনাময় পণ্য নির্বাচন করলে সাফল্য অনিবার্য।

২। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন: সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর ব্যবসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভবিষ্যতে কী, কখন এবং কীভাবে একটি কাজ করতে হবে তা অগ্রিম চিন্তাভাবনা করার নামই পরিকল্পনা। ব্যবসা-বাণিজ্য সফলভাবে পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোক্তাকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কারণ সঠিক পরিকল্পনার অভাব ব্যবসায় ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

৩। **পর্যাপ্ত মূলধন:** ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা ব্যবসায় সফলতার অন্যতম শর্ত। সুতরাং ব্যবসার সাফল্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত মূলধনের সংস্থান করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে ব্যবসায় কার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৪। **বাজারে চাহিদার পরিমাণ নিরূপণ:** বাজারে পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে পূর্বেই অনুমান করতে হলে মনে রাখতে হবে যে, পণ্যের চাহিদার পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণের উপরই ব্যবসায়ের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ পণ্য সরবরাহ বেশি ও চাহিদা কম হলে ব্যবসায় ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই উদ্যোক্তাকে উপযুক্ত কলাকৌশলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ চাহিদা নির্ধারণ করা উচিত।

৫। **পণ্য বাজারজাতকরণ:** বাজারজাতকরণের অর্থ হচ্ছে সঠিক মূল্যে যথাসময়ে বাজারে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। পণ্য শুধু উৎপাদন করলেই হবে না, তা বিক্রির ব্যবস্থাও করতে হবে। এর জন্য ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচার ব্যতীত কোনো পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুপরিদৃষ্টান্তভাবে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠি।

৬। **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা:** শিক্ষা গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন ব্যবসার সফলতার পূর্বশর্ত। ব্যবসায়ে অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা থাকলে ব্যর্থতার চেয়ে সফলতার সম্ভাবনাই বেশি। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে ব্যবসায় পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ সবচেয়ে বেশি সফল হন।

৭। **উপযুক্ত স্থান নির্বাচন:** ব্যবসার স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত, সেখানে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যিক।

৮। **যৌথ উদ্যোগ:** পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৯। **দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা:** উদ্যোক্তাকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা জ্ঞান ছাড়া প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজ যেমন— পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা যে কোনো উদ্যোক্তার সফলতার জন্য অপরিহার্য। উদ্যোক্তার নিজস্ব নিয়মনীতি অনুযায়ী কাজ করলে ব্যর্থ হতে পারে।

১০। **সঠিক পরামর্শ:** বিভিন্ন পদে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা এবং প্রয়োজনবোধে পরামর্শ প্রদান করা ব্যবসায়ের সাফল্যের চাবিকাঠি।

১১। **হিসাবরক্ষণ:** সুষ্ঠু ও যথাযথ হিসাবরক্ষণের উপর ব্যবসার সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। যথাযথভাবে হিসাব না করলে অনেক সময় ব্যবসা কিছুকাল চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

১২। **সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থা:** উদ্যোক্তাগণ যাতে সহজে যে কোনো সময় সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সুষ্ঠু ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর ব্যবসার সফলতা নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো ব্যবসায়ের সফলতার জন্য একান্ত আবশ্যিক। যে উদ্যোক্তা উপরোক্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করেন না তার ব্যবসায় বিফলতা দেখা দেবে।

প্রশ্নমালা-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উদ্যোগ কী?
২. ইংরেজি 'Entrepreneur' শব্দটি কোন দেশীয় শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে?
৩. ব্যবসা উদ্যোক্তা কে?
৪. উদ্যোগ বিষয়টি অর্থনীতিতে কে প্রথম প্রচলন করেন।
৫. উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য প্রধানত কয়টি ও কী কী?
৬. উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
৭. কারবারের প্রকৃতি অনুসারে উদ্যোক্তাকে কত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
৮. উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয় কেন?
৯. এন্ট্রাপ্রেনিয়র কী?
১০. কেস স্টাডি কী?
১১. কেস স্টাডি হতে ছাত্র-ছাত্রীরা কী জ্ঞান অর্জন করতে পারে।
১২. আত্মকর্মসংস্থান কী?
১৩. আত্মকর্মসংস্থানকে প্রধানত কত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
১৪. বাংলাদেশে সম্মানজনক ও স্বাধীন পেশা কী?
১৫. ব্যবসায় উদ্যোক্তার গুণ কী কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিল্প উদ্যোগের সংজ্ঞা দাও।
২. শিল্পোদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী উল্লেখ কর।
৩. একজন শিল্পোদ্যোক্তা হতে হলে তার কী কী গুণা থাকা প্রয়োজন?
৪. বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা কাকে বলে?
৫. একজন উদ্যোক্তা হতে হলে তার কী কী মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?
৬. উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা কাকে বলে?
৭. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়?
৮. মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি কাকে বলে?
৯. ক্ষুদ্র ব্যবসা কাকে বলে?
১০. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা কী উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর ।
২. শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা কর ।
৩. রেখাচিত্রের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর ।
৪. কারবারের প্রকৃতি অনুসারে উদ্যোক্তার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর ।
৫. আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর ।
৬. কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ আলোচনা কর ।
৭. ক্ষুদ্র ব্যবসার সুবিধাগুলো আলোচনা কর ।
৮. ক্ষুদ্র ব্যবসার অসুবিধাগুলো আলোচনা কর ।
৯. বৃহদায়তন ব্যবসার পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় টিকে থাকার কারণগুলো আলোচনা কর ।
১০. একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য লাভ এবং ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা কর ।
১১. তোমার পরিচিত একজন ব্যবসা উদ্যোক্তার সাথে সাক্ষাৎ করে তার ব্যবসায়িক জীবনের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমণা ও পেশা নির্বাচন

Motivation & Selection of Occupation

ভূমিকা (Introduction)

একজন ব্যবসা উদ্যোক্তাকে অপরাপর কর্মীদের মাধ্যমে কাজ আদায় করে নিতে হয়। একজন কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা যতই থাকুক না কেন, কর্মস্পৃহা না থাকলে সে কোনো কাজই সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। যে সমস্ত উপাদান একজন কর্মীকেও কর্মস্পৃহা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম সেগুলোই হলো প্রেমণা। প্রেমণা একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। মানুষের কাজের সাথে প্রেমণা সংশ্লিষ্ট। তাই প্রত্যেক মানুষের কর্মে চাই প্রেমণা। কেননা প্রেমণাই মানুষকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কাজ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা কার্যক্রম কর্মীদের কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রেমণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪.১ প্রেমণার ধারণা ও সংজ্ঞা

আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা কার্যক্রমে কর্মীদের কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রেমণা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত। ইংরেজি ‘Motivation’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো প্রেমণা। এ ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন ‘Movere’ শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ হলো ‘to move’ অর্থাৎ চালনা করা বা গতিশীল করা।

সাধারণ অর্থে মানুষের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলার আগ্রহ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেই প্রেমণা বলে।

ব্যাপক অর্থে প্রেমণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের কর্মক্ষমতাপূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও প্ররোচিত করার প্রক্রিয়া।

প্রেমণা এমন কিছু বিষয় যা একজন ব্যক্তিকে একটি কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন করতে মানসিক শক্তি জোগায়। যেমন— পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের উত্তর সুন্দরভাবে লিখতে পারলে শিক্ষক ভালো নম্বর দেন, সংশ্লিষ্ট ছাত্রের প্রশংসা করে এবং পুরস্কারস্বরূপ বই, খাতা, কলম উপহার দেন। এগুলো অর্জনের প্রত্যাশায় ছাত্র-ছাত্রীকে লেখাপড়ায় মনোযোগী ও পরিশ্রমী হতে এবং পাঠ উত্তমরূপে তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ বা প্রাণোদিত করে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এ মানসিক শক্তিই প্রেমণা।

আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ প্রেমণাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো।

- ১। এম.জে. গ্যানন (M.J. Gannon)-এর মতে, 'প্রেষণা হলো একজন ব্যক্তির চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা এবং ধারণাসমূহ যা তাকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করতে উৎসাহ জোগায়'।
- ২। মাইকেল জুসিয়াস (Michael Jucious)-এর মতে, 'প্রেষণা হলো ব্যবস্থাপক কর্তৃক সে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ, যা কর্মীবৃন্দকে নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উৎসাহিত ও প্রাণোদিত করে'।
- ৩। ডালটনের মতে, 'প্রেষণা হলো মানুষের আচরণ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া'।
- ৪। হেইলম্যান ও হরস্টিন-এর মতে, 'কাজের প্রতি ব্যক্তির ইচ্ছাই হলো প্রেষণা'।
- ৫। স্টানলি ভ্যাপেরের মতে, 'যদি কোনো আবেগ বা ইচ্ছা কোনো কর্মীকে কোনো কার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে তাকে প্রেষণা বলে'।
- ৬। উইলিয়াম জে. স্কট (William G. Scot)-এর মতে, 'প্রেষণা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কার্য সম্পাদনের প্রতি কর্মীবৃন্দের আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে'।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রেষণা হলো কর্মীদের ইচ্ছাশক্তিকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করার এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কর্মীদের কাছ থেকে সতঃস্কূর্ততার সাথে ও সন্তুষ্টি সহকারে তাদের কর্মদক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

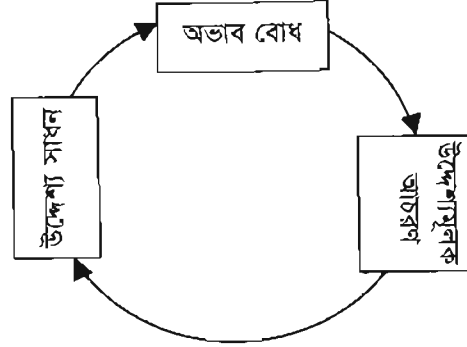
৪.২ প্রেষণা চক্র, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ও SWOT বিশ্লেষণ

প্রেষণা চক্র (Motivation Cycle)

জন্মগতভাবে মানুষ অভাবজনিত প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত। তার একটি অভাব বা চাহিদা পূরণ হওয়ার পর আরেকটি অভাব বা চাহিদা সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। প্রেষণা চক্র হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যাতে কর্মীরা উৎসাহিত হয়ে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে ব্রতী হয় এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে। চক্রের আকারে এ প্রক্রিয়া আবর্তিত হয় বলে একে প্রেষণা চক্র বলে। প্রেষণা তিনটি পর্যায়ে চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

যেমন- (১) অভাববোধ, (২) উদ্দেশ্যমূলক আচরণ, (৩) লক্ষ্যবস্তু অর্জন বা উদ্দেশ্য সাধন। প্রেষণা একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। মানুষের অভাববোধ কখনো শেষ হয় না। একটি অভাব পূরণ হলে আবার নতুন অভাবের সৃষ্টি হয়। আবার সে অভাবটি পূরণ হলে আর একটি অভাব সৃষ্টি হয়। এভাবে জীবনব্যাপি চক্র আবর্তিত হতে থাকে। আর প্রেষণা আছে বলেই মানুষের মধ্যে নতুন নতুন কর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং কর্ম প্রেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়।

চিত্রে শ্রেণণা চক্রটি উপস্থাপন করা হলো-



উপরোক্ত শ্রেণণার স্তরগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো

- ১। **অভাব বোধ (Need):** শ্রেণণা জৈবিক ও সামাজিক দুই প্রকারের হয়ে থাকে। মানুষের জৈবিক তাড়নায় যেসব শ্রেণণার উদ্ভব ঘটে তাকে জৈবিক শ্রেণণা বলে। যেমন- ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা প্রভৃতি। সামাজিক শ্রেণণা হচ্ছে কৃতিত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, খ্যাতি, মর্যাদা ইত্যাদি। মানুষের সমাজসভ্যতা, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তির জীবনে এসব শ্রেণণা সৃষ্টি হয়।
- ২। **উদ্দেশ্যমূলক আচরণ:** অভাব বোধ দূরীকরণের জন্য মানুষ সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রয়োজন মেটানোর জন্য কার্যে প্রবৃত্ত করে। এ প্রবৃত্তিকরণকেই উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বলে। যেমন- মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাড়ি-ঘর তৈরি করে। শিশু ক্ষুধার্ত হলে খাবারের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে।
- ৩। **উদ্দেশ্য সাধন:** মানুষ ক্ষুধার্ত হলে তা নিবৃত্ত করার জন্য কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং এ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় এবং শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যটি সম্পাদিত করে। শ্রেণণার জন্যই মানুষ নিজের শক্তিকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করে থাকে।

কৃতিত্বার্জন শ্রেণণা তত্ত্ব (Achievement motivation theory)

শিল্লোদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রেণণা তত্ত্বগুলোর মধ্যে কৃতিত্বার্জন শ্রেণণা তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। প্রফেসর ম্যাকলিনাল্ড ও তার সহযোগী অ্যাটকিনসন কৃতিত্বার্জন শ্রেণণা তত্ত্বের জনক। কৃতিত্বার্জন শ্রেণণা বলতে কোনো একটি কাজ উত্তমরূপে করার প্রবল ইচ্ছাকে বোঝায়।

নিম্নে কৃতিত্বার্জন শ্রেণণা তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো :

- ১। ম্যাকলিনাল্ডের মতে, 'কৃতিত্বার্জন শ্রেণণা হচ্ছে একটি শিক্ষণীয় শ্রেণণা যা ব্যক্তিকে উচ্চমানের কার্য-সম্পাদনে প্রেরিত করে'।
- ২। অধ্যাপক ম্যানফোর্ড-এর মতে, 'কৃতিত্বার্জন শ্রেণণা প্রাণীর সঞ্জীবনী শক্তি, যা তাকে কাজ-কর্ম উচ্চমানের পরিচয় দিতে ভাগিদ দেয়'।

প্রেমণা উন্নতির কৌশল : SWOT বিশ্লেষণ

এসডব্লিউটি (SWOT) বিশ্লেষণের সংজ্ঞা

১৯৬৯ সালে Business Policy-Text: and Cases বইটিতে প্রথম SWOT বিশ্লেষণের ধারণাটি উপস্থাপন করা হয়। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোক্তা তার ব্যবসা সংশ্লিষ্ট শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ভীতি আগেই বিশ্লেষণ করে জেনে নিতে পারে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে এসব বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয় তাকে এসডব্লিউটি বিশ্লেষণ বলে।

Pearce & Robinson-এর মতে, ‘SWOT’ বিশ্লেষণ হলো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও দুর্বলতা এবং বাহ্যিক সুযোগ ও হুমকিসমূহকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার এবং এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির একটি কৌশল।

SWOT মডেলে S মানে Strength, W মানে Weakness, O মানে Opportunity, T মানে Threat নিয়ে রেখাচিত্রের মাধ্যমে ‘SWOT’ কে দেখানো হলো-

S	Strength = শক্তি
W	Weakness = দুর্বলতা
O	Opportunity = সুযোগ
T	Threat = হুমকি

‘SWOT’ বিশ্লেষণ

একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে প্রতিষ্ঠানের শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকিসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব। মোটকথা, ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোক্তা তার ব্যবসাসংশ্লিষ্ট শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি আগেই বিশ্লেষণ করে জেনে নিতে পারে।

১। **Strength (শক্তি বা ক্ষমতা):** প্রতিটি ব্যবসায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা ব্যবসায় কার্যক্রমের অনুকূলে কাজ করে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। এ উপাদানগুলোকে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন:

- (ক) কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা
- (খ) সুলভে পর্যাপ্ত শ্রমিক প্রাপ্তি
- (গ) দক্ষ বণ্টন প্রণালি
- (ঘ) স্থানীয়ভাবে খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ

২। **Weakness (দুর্বলতা):** একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা সূচ্ষ্ণভাবে ব্যবসা চালানোর জন্য নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। এ সকল উপাদানকে দুর্বলতা বলা হয়। বর্তমান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এ সকল দুর্বলতা অবশ্যই দূর করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন-

- (ক) ব্যবসায় উদ্যোক্তার অনভিজ্ঞতা

- (খ) চলতি মূলধনের সমস্যা
- (গ) ব্যবসা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা
- (ঘ) পণ্যের উচ্চ দাম

৩। **Opportunity (সুযোগ):** একজন ব্যবসা উদ্যোক্তা পরিবেশ থেকে যত বেশি সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন, তিনি তত বেশি সফলতার সাথে ব্যবসায় টিকে থাকতে পারবেন। যেমন—

- (ক) নতুন পণ্যের উদ্ভাবন
- (খ) মানসম্পন্ন পণ্য
- (গ) নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার
- (ঘ) অনুকূল সরকারি নীতি

৪। **Threat (হুমকি):** ব্যবসায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো ব্যবসা উদ্যোক্তার করার কিছুই নেই। যেমন—

- (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- (খ) শ্রমিক অসন্তোষ
- (গ) কাঁচামালের অভাব
- (ঘ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত চারটি উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক সুবিধাজনক কৌশলটি গ্রহণ করে থাকেন।

৪.৩ প্রেমণা উন্নয়নের মাধ্যমে পেশা নির্বাচন

পেশা নির্বাচনে উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেমণা মানুষের প্রেমণা উন্নয়নের একটি বিশেষ গুণ। উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেমণা ধারণকৃত ব্যক্তির মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১। **চরম উৎকর্ষের প্রতি অঙ্গীকার:** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেমণা সংবলিত ব্যক্তিগণ চরম উৎকর্ষের মূল্য দিয়ে থাকেন। এরা সব সময় নিজেদের কাছ থেকে অধিক কার্য সম্পাদন আশা করেন। তারা অল্প কর্মে সন্তুষ্ট হন না। ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজ করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা আন্তরিকভাবে জোর প্রচেষ্টা চালান। কাজের সফলতার মধ্যে তারা আনন্দ পান।

২। **কাজের প্রতি অঙ্গীকার:** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেমণা সংবলিত ব্যক্তির কোনো কাজ করতে অঙ্গীকার করলে ঐ কর্মে নিজেকে পুরাপুরি নিয়োগ করেন এবং কখনই কর্মকে ভুলে যান না। তারা কাজ অসমাপ্ত রাখতে পছন্দ করেন না। ব্যর্থতায় এ ধরনের ব্যক্তির ভেঙে পড়েন না। তারা বিশ্বাস করেন যে বড় সাফল্য রাতারাতি আসে না।

৩। **পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী:** এরা খুব সাহসী, অভিমাত্রী এবং যে কোনো কাজে পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। এসব ব্যক্তি তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মনোবল সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সব সময় ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে।

৪। **সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ:** এ ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সুযোগ সন্ধান করতে ও সুযোগ গ্রহণ করতে বেশ দক্ষ। এরা সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। সফলতা লাভের জন্য তারা সুযোগগুলোকে বাস্তব কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করেন এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়িত করেন।

৫। **পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহী:** এসব ব্যক্তি অত্যন্ত বাস্তবমুখী। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণে তারা কখনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করেন না। সাহায্যের প্রয়োজন হলে তারা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছে না গিয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। তারা অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেরা যথেষ্ট সাহসী হন।

৬। **সময় জ্ঞান:** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সময় জ্ঞান অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হন। এ ধরনের ব্যক্তিগণ চ্যালেঞ্জিং কাজের মধ্যেই সর্বাধিক আনন্দ পেয়ে থাকেন।

৭। **নতুন ও অপরিচিত অবস্থায় আশাবাদ:** কৃতিত্বার্জন প্রেষণাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অপরিচিত অবস্থায় সব সময় আশাবাদী থাকেন। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা দিয়ে সার্বিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহকে বুঝতে চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন।

পরিশেষে বলা যায় যে, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা মূলত একটি সামাজিক প্রেষণা। সমাজে শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে মানুষ সমাজ হতে এই প্রেষণা লাভ করে থাকে।

৮। **দক্ষ ও অভিজ্ঞ:** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সংবলিত ব্যক্তিগণ তাদের নিজের কাজে যথেষ্ট দক্ষ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়। এ সমস্ত ব্যক্তি সাহসের সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির নানাবিধ কৌশল (Means of Improving Achievement Motivation)

ম্যাকলিল্যান্ড এবং তার সহযোগীগণ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির কতিপয় কৌশলের পরামর্শ দিয়েছেন। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

১। **সফল ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা করা:** কোনো ব্যক্তি কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা একজন সাফল্য অর্জনকারীর মতো চিন্তা করা শিখলে তার কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধি পায়। বাস্তবভিত্তিক বা মূল্যায়ন কোনো লক্ষ্য অর্জনের দিকে একজনের কল্পনাগুলোকে ধাবিত করা উচিত। নতুন এবং অপেক্ষাকৃত ভালো কিছু করার চিন্তা করা এবং আরো অধিকতর ভালোভাবে সম্পন্ন করার উপায়ও চিন্তা করা উচিত। এভাবে কোনো কিছু করার প্রতি চিন্তাশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বাড়ানো সম্ভব।

২। কার্যকরভাবে সমস্যা সমাধান করতে শেখা: যখন কেউ এমন অবস্থায় থাকে যেখানে সে কোনো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রেষণা অনুভব করে; অথচ তার সেই প্রেষণা কতগুলো বাধার মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে আছে; সেক্ষেত্রে নিচের কৌশলগুলো সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে:

(ক) স্থগিতকরণ সিদ্ধান্ত: সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তা বাতিল করা কিংবা অনেক সময় পুনঃপরীক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভবপর হয় না।

(খ) পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া: কোনো কর্মসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান দেওয়ার আগে কাজের পরিবেশকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং পরিবেশগত বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হতে হবে।

(গ) সম্ভাব্য সমাধানের তালিকা প্রণয়ন: যখন কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা হয় তখন সেটা সমাধানের উপায়ের কথা মাথায় আসতে পারে। সেগুলোর একটি তালিকা করতে হবে এবং সেগুলো থেকে সবচেয়ে সম্ভাব্য ভালো সমাধানটি বের করার চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) বিকল্প সমাধান নির্ধারণ: সমস্যা সমাধানের বিকল্প উপায় আগেই বেছে নিতে হবে। প্রথম সমাধান ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় উপায়টি প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে একসময় একটি যথার্থ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

(ঙ) নির্বাচিত সমাধানের মূল্যায়ন: বিস্তারিতভাবে নির্বাচিত সমাধানের মূল্যায়ন করে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে পুনঃউদ্ভাবনের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

(চ) বিরতি গ্রহণ: সমস্যা বিশ্লেষণের সময় ক্লান্তি বা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে বিরতি গ্রহণ করা উচিত। যদি বিস্তারিতভাবে সব ধরনের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে স্বল্পকালীন বিরতি সমস্যাকে গভীরভাবে অনুধাবন এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে।

(ছ) অভিজ্ঞ লোকের সাথে সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা: যদি সমস্যা নিজের কাছে ততটা স্পষ্ট মনে না হয় তবে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় এবং তা থেকে যথার্থ সমাধানও বের করা যায়।

৩। সাফল্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ: সাফল্য অর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এ জাতীয় পরিকল্পনা প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। আগামী সপ্তাহে, মাসে কিংবা বছরেও কী কাজ সম্পন্ন করা হবে, তা কাগজে লিখে পরিকল্পনা নিতে হবে। পরিকল্পনার লক্ষ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ উপায়ে একজন ব্যক্তি সফল উদ্যোক্তার মতো লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

৪। ইতিবাচক উপায়ে কাজ করা: সার্থক উদ্যোক্তাগণ সুযোগ-সুবিধাগুলোকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারেন সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে। উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনী শক্তি একজন সার্থক উদ্যোক্তার কার্যাবলির একটা বড় অংশজুড়ে থাকে।

পরিশেষে, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ ধারণা করতে পারি যে, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বাড়ানোর জন্য কোনো জাদু নেই। তবে উপরের পদক্ষেপগুলোর আলোকে প্রেষণা উন্নয়নের মাধ্যমে পেশা নির্বাচন করলে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা যে বাড়তে পারে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৪.৪ পেশা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

ব্যবসায় যাবতীয় কাজ প্রেষণার দ্বারা প্রভাবিত। ব্যবসা স্থাপন, পরিচালনা ও উদ্যোক্তার উন্নয়ন একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাই আধুনিক ব্যবস্থাপকগণ কর্মীদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে কাজ আদায়কে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে।

নিম্নে পেশা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো।

১। মানবশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তি যত দক্ষ ও যোগ্যই হোক না কেন কর্মক্ষেত্রে যদি তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয় তবে তাদের কাছ থেকে কাজক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। কর্মীদের আগ্রহ সৃষ্টিতে প্রেষণার কোনো বিকল্প নেই।

২। উচ্চ মনোবল সৃষ্টি: প্রেষণা কর্মীদের উচ্চ মনোবল সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবং কাজের প্রতি কর্মীদের অধিক দায়িত্ব ও আন্তরিক করে তোলে এবং স্বার্থবিরোধী যে কোনো কার্যকলাপে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

৩। দক্ষতা বৃদ্ধি: কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে কর্মীরা সেই কাজে আনন্দ পায় এবং যে কোনো কর্মপ্রচেষ্টা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রেষণা কর্মীদের কাজ শুধু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত করে না, তাদের যোগ্যতা বিকাশেও ভূমিকা রাখে। প্রেষণার অভাবে কর্মীদের কাজের দক্ষতাহ্রাস পায়।

৪। অপচয় হ্রাস: প্রেষণা অপচয় হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রেষণার অভাবে কর্মীদের শ্রম ঘণ্টার অপচয় হয়। উত্তম প্রেষণার বদৌলতে অনেকাংশে কমে যায়।

৫। লক্ষ্য অর্জন: প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে একজন কর্মীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সম্ভব। ফলে প্রতিষ্ঠান তার কাজক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়।

৬। শ্রম ঘূর্ণায়মানতা হ্রাস: প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের কর্মস্থল ত্যাগের বড় একটি কারণ হলো প্রেষণার অভাব। প্রতিষ্ঠান যখন কর্মীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এবং চাকরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে তখন তারা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে চায় না, ফলে শ্রম ঘূর্ণায়মানতাহ্রাস পায়।

৭। উত্তম শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা: উত্তম শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা প্রেমণার দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। প্রেমণার মাধ্যমে কর্মীদের অভাব, চাহিদা ও প্রয়োজন পূর্ণ করা হয় বলে কর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

৮। উদ্যোগ ও উন্নয়ন: প্রেমণা শুধু মানসিক সন্তুষ্টিই সৃষ্টি করে না, তা কর্মীদের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে উত্তম উপায়ে কাজ সম্পাদনের উদ্যোগী করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সকল পর্যায়ে কর্মীদের কাজের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা না গেলে কখনোই লক্ষ্যার্জন সম্ভব নয়। তাই পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধস্তন কর্মীদের প্রেমণা দানে তাদের পছন্দ, অপছন্দ, রুচি ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

৪.৫ সঠিক পেশা নির্বাচনে প্রয়োজনীয় তথ্যসামগ্রীর ব্যবহার

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় সঠিক পেশা নির্বাচনে যেসব উদ্দীপক ব্যবহার করা হয়, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(ক) আর্থিক প্রেমণা: মানুষের জীবনে বহুমুখী চাহিদা রয়েছে। এর চাহিদা পূরণের জন্য কাজের বিনিময়ে অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা পেতে চায়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে সকল প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় তাকে আর্থিক প্রেমণা বলে।

নিম্নে আর্থিক প্রেমণার বিভিন্ন উপাদান আলোচনা করা হলো :

- ১। ন্যায্য বেতন: কাজের বিনিময়ে শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠান থেকে যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তাকে বেতন বলে। ন্যায্য বেতন প্রদান করে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রেমণা দান করা যেতে পারে। কর্মীদের বেতন কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। বেতনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কর্মীদের কাজে উৎসাহিত করা যায়।
- ২। বোনাস: বছরের শেষে অথবা কোনো উৎসবের সময় নিয়মিত বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত ১ মাসের মূল বেতন দেওয়া হলে তাকে বোনাস বলে। বোনাস হলো একধরনের আর্থিক সুবিধা। এ সুবিধা পেলে কর্মীদের মধ্যে কাজ করার উদ্দীপনা জাগে।
- ৩। বাসস্থান সুবিধা: বাসস্থান মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রেমণা দানের অন্যতম উপায় হলো কর্মীদের মৌলিক অভাব পূরণে বাসস্থান সুবিধা প্রদান করা।
- ৪। চিকিৎসা সুবিধা: কর্মীদের সুস্বাস্থ্য উচ্চ মনোবলের পক্ষে অপরিহার্য। তাই কর্মীদের এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তার পরিবারের চিকিৎসা প্রদান কর্মীদের উদ্দীপ্ত করার একটি উল্লেখযোগ্য উপায়।
- ৫। পরিবহন সুবিধা: অনেক শ্রমিকই কর্মক্ষেত্রে হতে দূরে অবস্থান করে। তাই কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হলে কর্মীরা উৎসাহিত হয়।

- ৬। **মুনাফার অংশ:** মুনাফার সবটাই মালিক পক্ষ গ্রহণ না করে তার অংশবিশেষ কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে প্রতিষ্ঠানকে তারা নিজের মনে করে অধিক লাভের আশায় মনোযোগ সহকারে কাজ করবে।
- ৭। **পদোন্নতি:** চাকরিজীবনে পদোন্নতি হোক এটা সবারই কাম্য। পদোন্নতির সাথে আর্থিক সুবিধা জড়িত। তাই পদোন্নতি প্রাপ্তির বিষয়টি কর্মীর মনে উৎসাহ জোগায়।
- ৮। **পুরস্কার:** উত্তম কাজের জন্য বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এ পুরস্কার প্রদান করা হলে কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় আরো মনোযোগ দিয়ে কার্য সম্পাদন করে।
- ৯। **শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি:** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অধিকাংশ কর্মীর পক্ষে অর্থের অভাবে তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তাই কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়া করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের উৎসাহিত করা যায়।
- ১০। **কেন্টিন সহযোগিতা:** কর্মকালীন সময় কর্মীদের নাস্তা খাওয়ার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে সাবসিডি প্রদানের মাধ্যমে কেন্টিন সুবিধা দিয়ে কর্মীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দানে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়।
- ১১। **রেশন সুবিধা:** নির্দিষ্ট সমায়াস্তে কম মূল্যে রেশন প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের মাধ্যমেও কর্মীদের উৎসাহিত করা যায়।
- ১২। **আর্থিক নিরাপত্তা:** ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, যৌথ বিমা, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে পারে। এ ব্যবস্থা করলে কর্মীরা উৎসাহ সহকারে কাজ করে।

(খ) **অনার্থিক প্রেষণা পদ্ধতি:** কর্মীদের প্রণোদিত করার জন্য অর্থের বাইরে যে সকল উদ্দীপক ব্যবহৃত হয় তাকে এক কথায় অনার্থিক প্রেষণা পদ্ধতি বলে। নিম্নে অনার্থিক উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো:

- ১। **চাকরির নিরাপত্তা:** সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চাকরির নিরাপত্তা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকলে কর্মীর মনোযোগ নষ্ট হয়। সুতরাং কোনো কর্মীর কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে হলে তার চাকরির নিরাপত্তা থাকা প্রয়োজন।
- ২। **সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ:** কাজের উপযোগী সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ কর্মীকে কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলে ও তার কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে।
- ৩। **আকর্ষণীয় কাজ:** কাজে তৃপ্তি না পেলে কর্মী উৎসাহিত হয় না। তাই কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করে দক্ষতা অনুযায়ী কার্যভার অর্পণ করতে হবে। এতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কর্মী কাজ করবে।
- ৪। **ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকার:** কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রত্যেক কর্মীই তার কর্মস্থলে ক্ষমতা ও অধিকার পেতে চায়। এরূপ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদত্ত হলে কর্মী উৎসাহিত হয়।

- ৫। ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ: পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন এসব কাজের সাথে কর্মীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলে তাদের কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পাবে।
- ৬। প্রশিক্ষণের সুযোগ: প্রশিক্ষণ কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এতে যে কোনো সমস্যা সমাধানে কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মী আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে কাজ করে।
- ৭। শ্রমিক সংঘ গঠন করার সুযোগ: শ্রমিক সংঘ গঠন করার অধিকার বর্তমানকালে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের অন্যতম দাবি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শ্রমিক সংঘ গঠন করার সুযোগও কর্মীদের উৎসাহের একটি কারণ।
- ৮। মত প্রকাশের স্বাধীনতা: প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শ্রমিক-কর্মীদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিলে তাদের কাজের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।
- ৯। প্রতিষ্ঠানের সুনাম: কর্মী যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার সুনাম কর্মীদের মাঝে উৎসাহ জোগায়। ভালো প্রতিষ্ঠান কর্মীরা সহজে ছাড়তে চায় না। বরং তা তাদের গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।
- ১০। সামাজিক মর্যাদা: প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের চাহিদা পূরণের পর প্রত্যেক কর্মী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এমতাবস্থায় কর্মীকে সম্মানজনক পদমর্যাদা দান করলে উৎসাহের সাথে কাজ করবে।
- ১১। স্বীকৃতি ও পুরস্কার: কর্মীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি এবং তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে প্রেষণা বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, শ্রমিক-কর্মীদের প্রেষণা দানের জন্য আর্থিক ও অনার্থিক উভয় পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নমালা-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রেষণা কী?
২. প্রেষণাকে কোনো ব্যক্তির আচরণের চালিকাশক্তি বলা হয় কেন?
৩. প্রেষণা চক্র কী?
৪. প্রেষণা চক্রটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও।
৫. প্রেষণার স্তর কয়টি ও কী কী উল্লেখ কর।
৬. কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের জনক কাকে বলা হয়?
৭. এসডব্লিউওটি ((SWOT) কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রেষণার সংজ্ঞা দাও।
২. প্রেষণা চক্র বলতে কী বোঝায়?
৩. কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব আলোচনা কর।
৪. প্রেষণার স্তর কয়টি ও কী কী উল্লেখ কর।
৫. SWOT বিশ্লেষণ কৌশলটি আলোচনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবসায় উদ্যোগে প্রেষণার গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. প্রেষণাদানের আর্থিক উপাদানগুলো আলোচনা কর।
৩. প্রেষণাদানের অনর্থক উপাদানগুলো আলোচনা কর।
৪. প্রেষণা চক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর।
৫. কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বটি আলোচনা কর।
৬. কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির নানাবিধ কৌশলগুলো আলোচনা কর।
৭. SWOT বিশ্লেষণের বর্ণনা দাও।
৮. SWOT বিশ্লেষণ কী? ব্যবসায় সাফল্যে এর ভূমিকা কী আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়
ব্যবসা শুরু করার পদ্ধতি
Method of Starting Business

ভূমিকা: ব্যবসা শুরুর প্রথমেই একটি প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে। সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের পর ব্যবসা শুরু করার জন্য বেশ কিছু করণীয় কাজ রয়েছে। এ সকল করণীয় কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি সঠিক প্রকল্প হিসেবে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে নির্বাচন করা হলো। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটি ব্যবসা হিসেবে চালু করার আগে যেমন কোনো স্থানে স্টোরটি স্থাপন করা হবে, তার ব্যবস্থাপনার ধরন কেমন হবে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা কত হবে, তাদের যোগ্যতা কেমন হবে, আইনগতভাবে তার অবস্থান কেমন হবে, সে সম্পর্কে আগেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগঠন করতে হবে। ব্যবসা শুরুর আগেই ব্যবসা সম্পর্কে একটি সুগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ের প্রকৃতি, কতটুকু পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হবে, কীভাবে বাজারজাত করা হবে, ব্যবস্থাপনার ধরন কেমন হবে, প্রাথমিক অর্থসংস্থান কীভাবে হবে এবং লাভ-ক্ষতি কেমন হবে ইত্যাদি সবকিছু ব্যবসা শুরুর পূর্বে নির্ধারণ করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যত সুন্দর ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা যাবে ব্যবসায় তত বেশি সাফল্য লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

৫.১ ব্যবসার ধরন ও সাংগঠনিক কাঠামো

ব্যবসায়ের সংজ্ঞা (Definition of Business)

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদন, বণ্টন ও এর সহায়ক সকল বৈধ কাজকেই ব্যবসায় বলা হয়।

নিম্নে ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১. বি.ও. হুইলার (B. O Wheeler)-এর মতে, 'সমাজে পণ্য ও সেবাসামগ্রী সরবরাহ করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকেই ব্যবসায় বলে।'
২. অধ্যাপক নরম্যান রিচার্ড ওয়েনস (N.R. Owens)-এর মতে, ব্যবসায় হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টন কাজের অথবা মূল্যের বিনিময়ে সেবাদান কাজে নিয়োজিত থাকে।
৩. বি.বি. গোস (B.B. Goss)-এর মতে, 'পণ্যসামগ্রী উৎপাদন অথবা বিক্রয়ের মাধ্যমে ধনসম্পদ অর্জনে নিয়োজিত মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যবসায় বলে।'

৪. ড. গ্লস ও বেকার (Dr. Glos & Baker)-এর মতে, “দেশের প্রয়োজনে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টন অথবা সেবাকর্ম প্রদানের উদ্দেশ্যে মানুষ এককভাবে অথবা যৌথভাবে যে প্রয়াস চালায় তাকেই ব্যবসা বলে’।

ব্যবসায়ের ধরনসমূহ (Types of Business)

জীবিকা অর্জনের জন্য যারা ব্যবসায় করে তাদের কার্যাবলি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সবাই একই ধরনের ব্যবসায়ে নিয়োজিত নয়। কারণ সব ব্যবসায়ের ধরন এক রকম নয়। তাদের কেউ শুধু পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে, কেউ পণ্যদ্রব্য তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে, আবার কেউ গ্রাহকের কোনো জিনিস মেরামত করে জীবিকা নির্বাহ করে।

ধরন অনুযায়ী ব্যবসাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : যথা :

১. ক্রয়-বিক্রয়জাতীয় ব্যবসা
২. সেবামূলক ব্যবসা
৩. উৎপাদনমূলক ব্যবসা

নিম্নে ব্যবসার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. ক্রয়-বিক্রয়জাতীয় ব্যবসা: তৈরি পণ্য উৎপাদক, পাইকার বা অন্য কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পণ্য কিনে এনে ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করার মধ্যে সীমিত ব্যবসাকে ক্রয়-বিক্রয় জাতীয় ব্যবসা বলে। এক্ষেত্রে পণ্যের গুণ বা আকৃতিগত কোনো পরিবর্তন করা হয় না। এ জাতীয় ব্যবসায়ের উদাহরণ মুদি দোকান, ওষুধের দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারি দোকান ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যবসা খুচরা বা পাইকারি উভয় ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

২. সেবামূলক ব্যবসা: পণ্য বা দ্রব্যের গুণ পরিবর্তন করে কিংবা অন্য কোনো ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয় উপার্জনে নিয়োজিত ব্যবসাকে সেবামূলক ব্যবসা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন টেলিভিশন বা রেডিও মেকানিক একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া টেলিভিশন বা রেডিওকে তার কারিগরি জ্ঞান ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে সারিয়ে তুলে। এজন্য অনেক সময় তার টুলস এবং যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয় যা সে নিজেই সরবরাহ করে। এ কাজের বিনিময়ে সে পারিশ্রমিক পায়। এক্ষেত্রে তার কাজটি সেবামূলক ব্যবসায়ের অন্তর্গত। এছাড়া হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পরিবহন, ট্রাভেল এজেন্সি, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি সেবামূলক ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

৩. উৎপাদনমূলক ব্যবসা: যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সাহায্যে কাঁচামালের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধন করে নতুন পণ্য তৈরি করার কাজে নিয়োজিত ব্যবসাকে উৎপাদনমূলক ব্যবসা বলে। এ ধরনের ব্যবসায়ে কাঁচামালকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপ পরিবর্তন করে উৎপাদিত পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রয় করা হয়। যেমন- কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি, গম থেকে আটা, এমএস শিট থেকে আলমারি তৈরি, প্লাস্টিক দানা থেকে বলপেন তৈরি ইত্যাদি। উৎপাদনমূলক ব্যবসাকে শিল্প নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসার ধরন মূলত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক কার্যাবলির উপরই নির্ভরশীল।

ব্যবসায় সাংগঠনিক কাঠামো:

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছোট বা বড় আকারের হতে পারে। ব্যবসার জন্য যেসব আইনানুগ সাংগঠনিক কাঠামো সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. একমালিকানা ব্যবসা
২. অংশীদারি ব্যবসা
- ৩। যৌথ মূলধনি ব্যবসা
৪. সমবায় সমিতি
৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবসা

১. একমালিকানা ব্যবসা

একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসা বলে।

ব্যাপক অর্থে একমালিকানা ব্যবসা হলো এমন এক ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যার মালিক, পরিচালক, সংগঠক ও পুঁজি সরবরাহকারী একজন মাত্র ব্যক্তি, যিনি এককভাবে সকল ঝুঁকি বহন করেন এবং সমুদয় মুনাফা ভোগ করেন। গ্লেস ও বেকার-এর মতে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একক ব্যক্তির মালিকানাধীন ব্যবসায়ই হলো একমালিকানা ব্যবসা। ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে জনপ্রিয়। আমাদের দেশে মুদি দোকান, কনফেকশনারি, রেস্টোরা এবং যাবতীয় খুচরা দোকান একমালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

২. অংশীদারি ব্যবসা (Partnership Business)

সাধারণ অর্থে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কারবার গঠন ও পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করলে তাকে অংশীদারি ব্যবসা বলে।

ব্যাপক অর্থে: কমপক্ষে দুজন এবং সর্বোচ্চ বিশজন (ব্যতিক্রম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন) ব্যক্তি মুনাফা অর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে বন্টনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসা বলে।

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় অংশীদারি ব্যবসার নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, ‘সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজন দ্বারা পরিচালিত ব্যবসার মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে অংশীদারি, যারা এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসাকে অংশীদারি ব্যবসা বলে।’

১৮৯০ সালের ব্রিটিশ অংশীদারি আইনের ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যৌথভাবে পরিচালিত ব্যবসায় কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কে অংশীদারি ব্যবসা বলে। এ জাতীয় ব্যবসায় সদস্যসংখ্যা ২০ জনের বেশি হতে পারে না। অংশীদারগণ ব্যবসার যাবতীয় মূলধন সরবরাহ করেন এবং অর্জিত মুনাফা নিজেদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টন করেন। সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে এক বা একাধিক অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনা করেন।

৩। যৌথ মূলধনি ব্যবসা (Joint Stock Business)

সাধারণ অর্থে কোম্পানি আইন অনুযায়ী যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে যে ব্যবসা গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে যৌথ মূলধনি ব্যবসা বলে।

ব্যাপক অর্থে কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যৌথভাবে মূলধন সরবরাহ করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আইনের আওতায় কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করলে তাকে যৌথ মূলধনি ব্যবসায় বলে।

১. ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়।

২. অধ্যাপক ওয়াই.কে. ভূষণ (Y.K. Bhushan)-এর মতে, যৌথ মূলধনি ব্যবসায় বলতে আইন স্বীকৃত এমন একটা চিরন্তন অস্তিত্ববিশিষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাকে বোঝায়, যার একটা নাম, সাধারণ সিল ও যৌথ মূলধন থাকে এবং সীমিত দায় বিশিষ্ট ও হস্তান্তরযোগ্য নির্দিষ্ট মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত।

কোম্পানির মোট মূলধনকে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। এক একটি অংশকে শেয়ার বলে। শেয়ার ক্রেতারাই কোম্পানির মালিক। যৌথ মূলধনি কোম্পানি দুই প্রকারের। যথা-

i. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

ii. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

i. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি : যে কোম্পানির সদস্যসংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ এর শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ, যা শেয়ার ও ঋণপত্র জনগণের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের লক্ষ্যে আবেদন জানাতে পারে এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য তাকেই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-এ) ধারায় বলা হয়েছে যে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলতে এ আইন বা এ আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ কোনো আইনের অধীনে নির্গমিত এমন কোনো কোম্পানিকে বোঝাবে বা যা প্রাইভেট কোম্পানি নয়।

ii. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Private Limited Company): যে কোম্পানির সদস্যসংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জনে সীমাবদ্ধ এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়, তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। বাংলাদেশে বহাল ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ট) ধারায় এরূপ কোম্পানির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলতে এমন কোম্পানিকে বোঝাবে যা এর নিয়মাবলি অনুসারে এর সদস্য সংখ্যা ৫০ জনে সীমাবদ্ধ রাখে, সদস্যদের শেয়ার হস্তান্তরের অধিকারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান নিষিদ্ধ করে।

সদস্যসংখ্যা সীমিত হওয়ায় এরূপ কোম্পানি তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতিতে গড়ে ওঠে। কোম্পানির গঠন থেকে পরিচালনার বিভিন্ন স্তরে একে আইনগত কড়াকড়ি হতে অনেকটা রেহাই দেওয়া হয়। এর মোট

মূলধনকে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। একজন সদস্য একাধিক শেয়ার ক্রয় করতে পারে। সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী ব্যবসা পরিচালনা করে।

৪. সমবায় সমিতি (Co-operative Society)

সাধারণ অর্থে নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সমবায় সমিতি বলে।

ব্যাপক অর্থে সমাজের স্বল্প আয়ের লোকেরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সংগঠন গড়ে তুলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

মি. হেনরি কালভার্ট-এর মতে, ‘সমবায় হলো এমন একটি সংগঠন যাতে সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে একত্রিত হয়।’

সমাজের বিত্তহীন বা একই পেশাভুক্ত ব্যক্তিরা পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। সমবায় সমিতিতে কমপক্ষে ১০ জন সদস্য থাকে। একজন সদস্য একাধিক শেয়ার ক্রয় করতে পারে কিন্তু একটি বেশি ভোট দিতে পারে না। বাংলাদেশে বর্তমান ২০০১ সালের সমবায় আইন ও ২০০৪ সালের সমবায় সমিতি বিধিমালার আওতায় এরূপ সমিতি গঠন ও পরিচালনা করতে হয়।

৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবসা (State Enterprise)

রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত বা পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত কোনো ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব ও মালিকানা সরকারের অধীনে থাকলে তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা বলে। এ ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ করা, স্বয়ং রাষ্ট্রই এ ব্যবসার মালিক। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক এ ধরনের ব্যবসা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতীয় সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে এরূপ ব্যবসার সৃষ্টি হয়। মোট কথা, জনসাধারণের কল্যাণ ও স্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা গড়ে ওঠে। যেমন- ডেসকো, ওয়াপদা, বিটিসিএল, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে। যেমন- গ্যাস ফিল্ড, সার কারখানা ইত্যাদি।

৫.২ ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক বিচার্য বিষয়সমূহ

ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক বিচার্য বিষয় বলতে এরূপ বিষয়কে বোঝানো হয় যার আলোকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন করা হয়। অর্থাৎ যে বিশেষ বিচার্য বিষয়সমূহ ব্যবসা পরিচালনা করার প্রাথমিক স্তরেই বিবেচনা করতে হয় তাকে ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক বিচার্য বিষয় বলে।

ব্যবসায় পরিকল্পনা (Business Plan)

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনার জন্য একজন উদ্যোক্তার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। অনেকেই ব্যবসা পরিকল্পনাকে ব্যবসার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ভিত্তি বা আয়না বলে থাকেন। সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় প্রণয়ন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কাজক্ষত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়। ব্যবসা পরিকল্পনা হলো ব্যবসা পরিচালনার পথচিত্র, যা অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালনা করলে ব্যবসার উন্নতি ও অবনতি পরিমাপ করা হয়। মোট কথা, ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো

একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে তুমি কী করতে চাও এবং তোমার কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে কীভাবে তুমি তোমার সম্পদ কাজে লাগাবে তার লিখিত বিবরণী বিশেষ।

ব্যবসায় পরিকল্পনা সংজ্ঞা (Definition of Business Plan)

ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সামগ্রিক কার্যাবলির অগ্রিম রূপরেখা।

ব্যাপক অর্থে: ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো একজন উদ্যোক্তার উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় থেকে শুরু করে পরবর্তী সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কিত পূর্বনির্ধারিত ছক।

একজন নাবিক যেমন যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য দিকনির্দেশক ব্যবহার করে, তেমনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসা উদ্যোক্তার কাছে পথচলার মানচিত্র।

নিম্নে ব্যবসায় পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো

১। এল.এ. এলেন (L.A. Allen)-এর মতে, 'ব্যবসায় পরিকল্পনা হচ্ছে একটি ফাঁদ বা খাঁচা যা কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎকে অগ্রিম কর্ম পরিকল্পনার আওতায় বন্দি করে।'।

২। ডব্লিউ.এইচ নিউম্যান (W.H. Newman) এর মতে, কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন ভবিষ্যতে কী করবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাকে ব্যবসায় পরিকল্পনা বলে।

৩। ডেবিট এইচ হল্ট এর মতে, 'সাংগঠনিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং তারপর ঐ উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল এবং কার্যাবলির সমন্বয় করার প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় পরিকল্পনা বলে।'।

৪। জি.আর. টেরি (G.R. Terry) এর মতে, 'পারস্পরিক তথ্য নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ক অনুমান প্রণয়ন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে কাম্য ফললাভের তাগিদে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবিত কার্যাবলির ধারণা করা ও কার্যাবলির রূপরেখা প্রণয়ন করাই হচ্ছে ব্যবসায় পরিকল্পনা।'।

পরিশেষে বলা যায়, যে প্রতিবেদন থেকে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয় ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়, সে প্রতিবেদন ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে তাকে, ব্যবসায় পরিকল্পনা বলে।

ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব Importance of Business Plan)

বর্তমান জগতে ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসায়িক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং ব্যবসার অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য ব্যবসায় পরিকল্পনার আবশ্যিকতা রয়েছে। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে ব্যবসায় উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীনভাবে চলতে থাকে। নিম্নে ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১। **অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন:** প্রতিটি ব্যবসায় সংগঠনের পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা হচ্ছে প্রাথমিক ও মুখ্য সোপান। গন্তব্যস্থল নির্ণয় করে নাবিক যেমন যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রস্তুত করে সে অনুসারে কাজ করে যেতে হয়। ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যবসার কাজ ঠিকমতো চালানো যায় না।

২। **অনিশ্চয়তা দূরীকরণ:** ব্যবসার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব খুব বেশি। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যবসা কীভাবে কোন পথে চলবে ব্যবসায় পরিকল্পনা সে সম্পর্কে একটি অগ্রিম চিত্র প্রদান করে। ফলে ব্যবসায়ীর পক্ষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়।

৩। **কার্যের সুষ্ঠু সমাধান:** ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যাদি পরিচালনার সর্বশ্রেষ্ঠ ও মিতব্যয়ী পথ নির্দেশ করে। এতে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কখন কী কাজ কীভাবে করতে হবে এবং কত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হবে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে।

৪। **নিয়ন্ত্রণের সুবিধা:** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যবসার মালিককে কেবল ব্যবসায় পরিকল্পনার জন্য দিকনির্দেশনাই দেয় না নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে। অতএব নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতার দিক থেকে ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

৫। **কার্য মূল্যায়ন ও খরচ নিয়ন্ত্রণ:** ব্যবসার বিভিন্ন কার্যাবলি মূল্যায়ন ও খরচ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও ব্যবসায় পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬। **তথ্যসূত্র দলিল:** ব্যবসা পরিকল্পনা অনেক সময় ব্যবসার নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যের দলিল হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সরকার ও জনসাধারণ ব্যবসার বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। যা ব্যবসায় উদ্যোক্তার পক্ষে অতিরিক্ত মূলধনের চাহিদা পূরণে সহায়তা করে।

৭। **সম্পাদিত কাজের তুলনা:** ব্যবসা পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিকল্পিত কাজের সাথে সম্পাদিত কাজের তুলনা করা যায়।

৮। **সঠিক কর্মধারা অনুসরণ:** ব্যবসা পরিকল্পনা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করে এবং এরূপ রূপরেখা অনুযায়ী পরিকল্পিত কাজ সম্পাদন করা হয়।

৯। **ভবিষ্যৎ দর্শন:** ব্যবসায় পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ কর্মসূচি বিষয়ক একটি প্রতিচ্ছবি। ভবিষ্যতে কী করা হবে সে সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যবসায় পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবসার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়।

১০। গতিশীল নেতৃত্বের সুযোগ: ব্যবসা পরিকল্পনায় একজন ব্যবস্থাপককে গতিশীল নেতৃত্বের সুযোগ দান করে। ব্যবস্থাপক কী কাজ কখন ও কীভাবে করবে তা পূর্বেই পরিকল্পনা করা থাকে এবং ব্যবস্থাপক সে অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয় যা সুষ্ঠু ব্যবসার পরিকল্পনা দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যবসায় পরিকল্পনার বিষয়বস্তু (Contents of Business Plan)

ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের পাঁচটি প্রধান দিক রয়েছে যাকে ব্যবসা পরিকল্পনার বিষয়বস্তু বলা হয়। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পাঁচটি দিককে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। নিম্নে ব্যবসা পরিকল্পনার বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হলো:

১। উৎপাদনসংক্রান্ত পরিকল্পনার বিষয়: উৎপাদন পরিকল্পনায় যে সব বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো হলো:

- (ক) কী উৎপাদন করা হবে,
- (খ) কীভাবে উৎপাদন করা হবে,
- (গ) কতটুকু উৎপাদন করা হবে,
- (ঘ) কোথায় উৎপাদন করা হবে,
- (ঙ) কী ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদন করা হবে,
- (চ) কোন ধরনের শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করা হবে ইত্যাদি।

২। ক্রয়সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিষয়: ক্রয়সংক্রান্ত পরিকল্পনায় যে সমস্ত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো হলো:

- (ক) কোন উৎস থেকে কাঁচামাল ক্রয় করা হবে,
- (খ) কতটুকু কাঁচামাল ক্রয় করা হবে,
- (গ) কাঁচামাল কোথায় সস্তায় পাওয়া যাবে,
- (ঘ) কোন উৎস থেকে কাঁচামাল ক্রয় করলে পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচ কম হবে ইত্যাদি।

৩। বিক্রয় ও বিপণনসংক্রান্ত বিষয়: বিক্রয় ও বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উদ্যোক্তাকে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হয় তা নিম্নরূপ:

- (ক) উৎপাদিত পণ্য কার কাছ থেকে বিক্রয় করা হবে,
- (খ) কী পরিমাণ বিক্রয় করা হবে,
- (গ) কোথায় বিক্রয় করা হবে,
- (ঘ) কী পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হবে ইত্যাদি।

৪। অর্থসংক্রান্ত বিষয়: বিপণন ও উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের পর অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে অর্থসংক্রান্ত পরিকল্পনা হলো:

- (ক) কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে,
- (খ) কে অর্থের জোগান দেবে,
- (গ) কীভাবে অর্থ ব্যয় করা হবে,
- (ঘ) কীভাবে ব্যয় নির্ধারণ করা হবে,
- (ঙ) কীভাবে মুনাফা অর্জিত হবে,

৫। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিষয়: সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়বস্তু বিবেচনা করতে হয় তা নিম্নরূপ:

- (ক) ব্যবসাকে কীভাবে সংগঠিত করা যাবে,
- (খ) ব্যবস্থাপনা কার্য কীভাবে চলবে,
- (গ) কে ব্যবস্থাপনা কার্য চালাবে,
- (ঘ) কর্মী সংস্থান কীভাবে হবে,
- (ঙ) প্রয়োজনে কীভাবে ব্যবসার সম্প্রসারণের উদ্যোগে নেওয়া হবে,

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসা পরিকল্পনা উপরোক্ত বিষয়সমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

ব্যবসা পরিকল্পনা প্রোফরমা (Business Plan Proforma)

১। সাধারণ তথ্যাবলি:

ব্যবসায় উদ্যোক্তা বা প্রশিক্ষণার্থীর নাম

জন্ম তারিখ:

প্রকল্পের বিবরণ (প্রকল্পের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য):

ভূমি ও দালানকোঠা ভাড়া

বা নিজ

ব্যবসায় প্রকৃতি

ব্যবসার নাম

অবস্থানের ঠিকানা

১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১.২ পূর্ব অভিজ্ঞতা

২. প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ:

উৎপাদনমূলক	
ক্রয়-বিক্রয়	
সেবামূলক	

২.১ উৎপাদন কর্মসূচি (Production Programme)

(১ম, ২য় ও ৩য় বছরের জন্য হতে হবে)

আইটেম	প্রাক্কলিত উৎপাদনের	প্রাক্কলিত বিক্রয়ের পরিমাণ টাকায়	প্রস্তাবিত ক্ষমতার ব্যবহার
১।			
২।			
৩।			

২.২ মেশিন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (Machines, Tools and Equipmen

মেশিন ও আবশ্যিকীয় যন্ত্রাংশ	প্রয়োজনীয় সংখ্যা	দাম (টাকায়)	মোট দাম (টাকায়)
১।			
২।			
৩।			

(বি: দ্র: এখানে গুচ্ছ ও কর, প্যাকিং, ফরওয়ার্ডিং খরচাদি, বৈদ্যুতিক খরচ, স্থাপনা বাবদ খরচ যোগ হবে)

২.৩। কাঁচামাল (Raw Materials)

আইটেম	মোট বাৎসরিক প্রয়োজনীয়		
	পরিমাণ	দাম	সরবরাহের উৎস
১।			
২।			
৩।			

২.৪। উপযোগিতাসমূহ (Utilities)

বিবরণ	বাৎসরিক প্রয়োজন	মোট বাৎসরিক ব্যয়
বিদ্যুৎ গ্যাস/কয়লা/অন্যান্য জ্বালানি পানি অন্যান্য		

২.৫। প্রয়োজনীয় শ্রমিক/মানবসম্পদ (Necessary labours/Human resources)

বিবরণ	সংখ্যা	মোট মজুরি টাকা (বছরে)
দক্ষ আধাদক্ষ অদক্ষ অফিস কর্মচারী মোট		

৩। বাজার সমীক্ষা (Market Survey)

বাজারের আকার, বাজার, অঞ্চল, পণ্যের অংশ (%), প্রতিযোগীর সংখ্যা, প্রতিযোগীর প্রকৃতি, বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা, বাজারের প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে হবে।

৪। প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ (Cost of the Project)

৪.১। স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital)

ভূমি, দালান ও কারখানা গৃহ	-----
মেশিন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	-----
আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র	-----
অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যয়	-----
মোট ব্যয় :	-----

৪.২: চলতি মূলধন (Working Capital)

কাঁচামালের স্টক	-----
আধা প্রস্তুত পণ্যের স্টক	-----
প্রস্তুতকৃত মজুত মালের স্টক	-----
ধারকৃত কাঁচামাল (যদি থাকে)	-----
ধারকৃত অর্থ (যদি থাকে)	-----
অন্যান্য	-----
মোট ব্যয়	-----

৪.৩। প্রকল্পের মোট ব্যয় (Total Cost of the Project)

স্থায়ী মূলধন (৪.১)	-----
চলতি মূলধন (৪.২)	-----
প্রাথমিক এবং প্রাক-পরিচালনা বাবদ ব্যয়	-----
মোট	-----

৪.৪। প্রকল্পের অর্থায়ন পদ্ধতি (Financial Arrangement of the Project)

নিজস্ব তহবিল	-----
টার্ম লোন (স্থায়ী মূলধন)	-----
চলতি মূলধন	-----
অন্যান্য উৎস যদি থাকে	-----
মোট প্রকল্প ব্যয়	-----
(প্রকল্পের মোট ব্যয় অর্থসংস্থানের সমান হবে)	

৫.০। প্রকল্পের লাভজনকতা (Profitability of the Project): (১ বছর থেকে কয়েক বছরের জন্য হতে পারে)

	টাকা
৫.১ বিক্রয় আয়	-----
৫.২ উৎপাদন ব্যয় (২.৩+২.৪+২.৫)	-----
৫.৩ বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	-----
৫.৪ প্রশাসনিক ব্যয়	-----
৫.৫ সুদ	-----
৫.৬ মোট লাভ ৫.১-(৫.২+৫.৩+৫.৪+৫.৫+৫.৬)	-----
৫.৭ আয়কর	-----
৫.৮ নিট লাভ বা ক্ষতি (৫.৬-৫.৭)	-----

৬.০। আর্থিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ (Other Statement for Financial Planning)

- ৬.১ প্রোফরমা ব্যালেন্সশিট (Proforma balance sheet),
- ৬.২ ক্যাশ ফ্লো হিসাব (Cash flow accounts),
- ৬.৩ ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণ বা মুনাফা পরিকল্পনা (Break even Analysis or Profit Planning):
- ৬.৪ সহায়ক দলিলাদি (Auxiliary document)
- ৬.৫ পার্টনারশিপ চুক্তি,
- ৬.৬ বিক্রি চুক্তি,
- ৬.৭ কারখানা গৃহের নকশা, উৎপাদনের নকশা,
- ৬.৮ ব্যবসাসংক্রান্ত লাইসেন্স।

৭.০। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচি (Project Implementation Programme)

- ৭.১ পণ্য নির্বাচন ও বাজার সমীক্ষা,
- ৭.২ প্রকল্প রিপোর্ট প্রণয়ন,
- ৭.৩ কারখানার স্থান প্রণয়ন,
- ৭.৪ স্থায়ী পুঁজি ও চলতি পুঁজির জন্য আবেদন
- ৭.৫ কারখানা নির্মাণ,
- ৭.৬ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন,
- ৭.৭ কর্মচারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

পরিশেষে, শিক্ষার্থীর উপরোক্ত ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রোফরমাকে বিশেষভাবে অনুধাবন ও অনুসরণ করে শিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এখানে ৩ থেকে ৪ জন ছাত্র নিয়ে গঠিত দল ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরি করবে। প্রতি দলের ব্যবসার ক্ষেত্র ও পণ্য আলাদা হবে।

ব্যবসায় পরিকল্পনা নমুনা প্রতিবেদন

Proforma Business Plan Report

কাল্পনিক তথ্যের সাহায্যে একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা উপস্থাপনা করা হলো:

পোলার আইসক্রিম কো: (প্রা:) লি:

তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

(ক) ভূমিকা: উপরোক্ত প্রকল্পটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্নতমানের আইসক্রিম নেই। ফলে বিশেষ করে শিশুদের ও বয়স্কদের জন্য এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। কোম্পানিটি ২০১১ সালের জানুয়ারি হতে উৎপাদন শুরু করবে।

(খ) উদ্যোক্তাদের পরিচিতি

- ১। জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, এমকম, মিরপুর, ঢাকা।
- ২। জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, এমবিএ, শেওড়াপাড়া, ঢাকা।
- ৩। জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, এমএ (অর্থনীতি), শেওড়াপাড়া, ঢাকা।
- ৪। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, সেকশন-৫, মিরপুর, ঢাকা।
- ৫। জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন, এমএসসি, সেকশন-৫, মিরপুর, ঢাকা।

(গ) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা: কোম্পানির সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য ৫ সদস্যের একটি পরিচালনা বোর্ড থাকবে। সদস্যদের মধ্য হতে একজন পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন।

(ঘ) কারখানা ও অফিস: সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ৫০ কাঠা জমি ক্রয় করে তার উপর কারখানা ও অফিস স্থাপন করা হবে।

(ঙ) মেশিন ও যন্ত্রপাতি: প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন ও যন্ত্রপাতি জার্মানি থেকে আমদানি করা হবে।

(চ) কাঁচামাল: আইসক্রিমের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইসক্রিমের জন্য নিম্নলিখিত কাঁচামাল প্রয়োজন:

- ১। স্প্রাই: (ক) সেকারিন, (খ) সবজির চর্বি (মারগারিন) (গ) প্রাকৃতিক রং।
- ২। নিপিন: (ক) চিনি, (খ) চর্বি ক্রিম, (গ) পাউডার দুধ, (ঘ) স্থায়ী করা উপাদান।
- ৩। ইউটিলিটি সেবাসমূহ: বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির কাম্য পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে পাওয়া যাবে।

(ছ) দক্ষ জনশক্তি: কোম্পানির উৎপাদন নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল নির্ধারণ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এ সকল লোক নির্বাচন ও নিয়োগ করা হবে।

প্রয়োজনীয় লোকবল নিম্নরূপ :

ধারণ	সংখ্যা	বার্ষিক বেতন
(ক) ব্যবস্থাপক-কাম-কেমিষ্ট	১ জন	৮৪,০০০ টাকা
(খ) হিসাবরক্ষণ-কাম-ক্যাশিয়ার	১ জন	৭২,০০০ টাকা
(গ) বিক্রয়-কর্মী	২ জন	৪৮,০০০ টাকা
(ঘ) সুপারভাইজার	২ জন	১,০৮,০০০ টাকা
(ঙ) ইলেকট্রিশিয়ান	১ জন	৪৮,০০০ টাকা
(চ) দক্ষ শ্রমিক	৬ জন	২,১৬,০০০ টাকা
(ছ) অদক্ষ শ্রমিক	১০ জন	১,৮০,০০০ টাকা
(জ) পিয়ন	২ জন	৬০,০০০ টাকা
মোট:	২৫ জন	৮,১৬,০০০ টাকা

বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা: বাজার সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বাজারে এ ধরনের আইসক্রিমের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাজারে মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের আইসক্রিম প্রস্তুত করে। তবে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ খুবই অল্প যা সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে পারে না। যাই হোক, আপাতত মোট ৭টি জেলার আইসক্রিম বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা হলো- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর। দুই ভাগে এগুলো বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন- (ক) নিজস্ব গাড়ি ও লোক নিয়ে এবং বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটির সম্ভাব্য মূলধনি ব্যয়, আয়-ব্যয় বিবরণী সম্ভাব্য, উদ্ধৃতিপত্র প্রস্তুত করা হলো:

	স্থায়ী মূলধন
১। জমি	: ১২,০০,০০০ টাকা
২। দালান	: ২৬,০০,০০০ টাকা
৩। রাখার ট্যাক	: ৫০,০০০ টাকা
৪। মোটর ২টা	: ১,০০,০০০ টাকা
৫। রেডিং ট্যাক	: ১,৫০,০০০ টাকা
৬। এমানিয়া পাইপ	: ৫০,০০০ টাকা
৭। রেফ্রিজারেটর	: ৭৫,০০০ টাকা
৮। ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি	: ২০,০০০ টাকা
৯। পাস্তুরাইজিং যন্ত্র:	: ১,৫০,০০০ টাকা
১০। যন্ত্রপাতি স্থাপন ব্যয়	: ১,০০,০০০ টাকা
১১। কন্টিনজেন্সি	: ৫০,০০০ টাকা

১২। অন্যান্য	:	৫০,০০০ টাকা
মোট	:	৪৬,৪৫,০০০ টাকা
কর্মী ও কর্মচারীবৃন্দের জন্য	:	৮,১৬,০০০ টাকা
মোট স্থায়ী খরচ	:	৫৪,৬১,০০০ টাকা

সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ

ধারণা করা হচ্ছে যে, বছরে ৩০০ দিন কাজ করা হবে দুই শিফটে। প্রতিদিন কমপক্ষে ২০০০টি আইসক্রিম তৈরি করা হবে। বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়েছে প্রতিটি দশ টাকা। উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয়েছে, প্রথম বৎসর ৬,০০,০০০টি; দ্বিতীয় বৎসর ৬,৬০,০০০টি এবং তৃতীয় বৎসর ৭৫,০০,০০০টি।

বৎসর	উৎপাদনের পরিমাণ	বিক্রয়ের পরিমাণ	মোট টাকা
১ম	(২০০০ × ৩০০) টি	৬,০০,০০০ × ১০	৬০,০০,০০০ টাকা
২য়	(২২০০ × ৩০০) টি	৬,৬০,০০০ × ১০	৬৬,০০,০০০ টাকা
৩য়	(২৫০০ × ৩০০) টি	৭,৫০,০০০ × ১০	৭৫,০০,০০০ টাকা

মূলধনের উৎস

১। নিজস্ব মূলধন (৬০%) = ৫,৮৮,৯,৬০০ টাকা

২। ব্যাংকঋণ (৪০%) = ৩৯,২৬,৪০০ টাকা

সম্ভাব্য আয় বিবরণী

বিবরণ	১ম বৎসর (টাকা)	২য় বৎসর (টাকা)	৩য় বৎসর (টাকা)
বিক্রয় আয়	৬০,০০,০০০	৬৬,০০,০০০	৭৫,০০,০০০
উৎপাদন খরচ	৪৩, ৫৫,০০০	৪৩,৫৫,০০০	৪৩,০০,০০০
মোট লাভ	১৬,৪৫,০০০	২২,৪৫,০০০	৩২,০০,০০০

কাঁচামাল

১। ফ্যাট ক্রিম ২০,০০০ কেজি

২। মিল্ক পাউডার ১০০০ কেজি

৩। স্থায়ীকরণ বস্তু

৪। চিনি ১০০০ কেজি

৫। কন্টেইনার, কাপ কাঠি

৬। র‍্যাপিং পেপার

মোট কাঁচামাল বাবদ

চলতি মূলধন

১৫,০০,০০০ টাকা

১২,০০,০০০ টাকা

২,১০,০০০ টাকা

৯০,০০০ টাকা

২,০০,০০০ টাকা

১,০০,০০০ টাকা

৩৩,০০,০০০ টাকা

ইউটিলিটিজ

১। বিদ্যুৎ	:	৩,০০,০০০ টাকা
২। গ্যাস	:	১,০০,০০০ টাকা
৩। পানি	:	৫০,০০০ টাকা
৪। ভাড়া	:	৪০,০০০ টাকা
৫। ডাক ও মনিহারি	:	২৫,০০০ টাকা
৬। টেলিফোন	:	২৫,০০০ টাকা
৭। রক্ষণাবেক্ষণ	:	৫০,০০০ টাকা
৮। যাতায়াত	:	৬০,০০০ টাকা
৯। বিক্রয় খরচ	:	১,০০,০০০ টাকা
১০। বিমা	:	২৫,০০০ টাকা
১১। ট্যাক্স	:	৩০,০০০ টাকা
১২। বিজ্ঞাপন	:	২,০০,০০০ টাকা
১৩। বিবিধ	:	৫০,০০০ টাকা
মোট	:	১০,৫৫,০০০ টাকা

মোট চলতি মূলধন: (৩৩,০০,০০০+১০,৫৫,০০০) টাকা = ৪৩,৫৫,০০০ টাকা

মোট মূলধনের পরিমাণ (স্থায়ী ও চলতি) = ৫৪,৬১,০০০+৪৩,৫৫,০০০ টাকা = ৯৮,১৬,০০০ টাকা

প্রশাসনিক খরচ	৮,১৬,০০০	৮,১৬,০০০	৮,১৬,০০০
ঋণের সুদ (১২%)	৪,৭১,১৬৮	৪,৭১,১৬৮	৪,৭১,১৬৮
অপচয়	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
নিট লাভ (কর পূর্ব)	৩,৩৭,৮৩২	৯,৩৭,৮৩২	১৮,৯২,৮৩২
কর (১০%)	৩৩,৭৮৩	৩৩,৭৮৩	৩৩,৭৮৩
নিট লাভ	৩,০৪,০৪৯	৯,০৪,০৪৯	১৮,৫৯,০৪৯

নগদ প্রবাহ বিবরণী

বিবরণ	১ম বৎসর (টাকা)	২য় বৎসর (টাকা)	৩য় বৎসর (টাকা)
আন্তঃপ্রবাহ			
বিক্রয় আয়	৬০,০০,০০০	৬৬,০০,০০০	৭৫,০০,০০০
বহিঃপ্রবাহ উৎপাদন খরচ	৪৩,৫৫,০০০	৪৩,৫৫,০০০	৪৩,৫৫,০০০
সুদ	৪,৭১,১৬৮	৪,৭১,১৬৮	৪,৭১,১৬৮
মোট বহিঃপ্রবাহ	৪৮,২৬,১৬৮	৪৮,২৬,১৬৮	৪৮,২৬,১৬৮
নগদ উদ্ভূত	১১,৭৩,৮৩২	১১,৭৩,৮৩২	১১,৭৩,৮৩২
	৬০,০০,০০০	৬০,০০,০০০	৭৫,০০০,০০০

পরিকল্পিত উদ্ধর্তপত্র (১ম বর্ষ)

মূলধন	টাকা	সম্পদ	টাকা
ঋণ	৩৯,২৬,৪০০	দেনাদার	১২,০০,০০০
মালিকের মূলধন	৫৮,৮৯,৬০০	যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা	৭৫,০০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১০,০০,০০০	৪৬,৪৫,০০০	
	৩,০৪,০৪৯	(-) অবচয় : ২০,০০০	
নিট আয়	১,১১,২০,০৪৯		৪৬,২৫,০০
		নগদ তহবিল :	১১,৭৩,৮৩২
		বিজ্ঞাপন :	২,০০,০০০
		মজুদ মাল :	৩৯,২১,২১৭

(!) সম আয়-ব্যয় বিন্দু (Break-Even Point)

স্থির ব্যয়

সম আয়-ব্যয় বিন্দু = _____

এককপ্রতি বিক্রয় মূল্য - একক পরিবর্তনশীল খরচ

৪৩,৫৫,০০০ টাকা

এক্ষেত্রে প্রতি একক পরিবর্তনশীল খরচ হচ্ছে = _____ = ৭.২৫ টাকা

৬,০০,০০০ ইউনিট

৫৪,৬১,০০০

সম আয়-ব্যয় বিন্দু = _____

১০,০০-৭.২৫

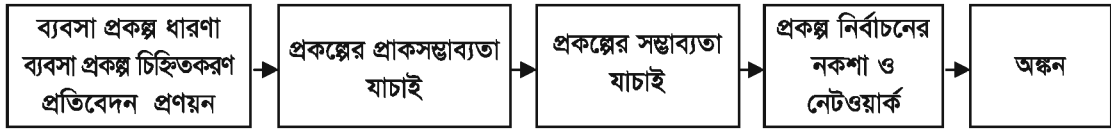
= ১৯,৮৫,৮১৮

বা, ১,৯৮,৫৮১ ইউনিট।

ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতপ্রণালি বা পদক্ষেপ (Steps of Business Plan)

একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা ব্যবসার কর্মকাণ্ড শুরু করার পূর্বে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। এ সমস্ত তথ্য বিভিন্ন প্রতিবেদন, গবেষণা সংস্থা, শিল্প জরিপ, জনসংখ্যা গণনা রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রশ্নমালার উত্তর গ্রহণ করার মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়।

একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কতগুলো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এগুলোকে ব্যবসায় পরিকল্পনার ধাপ বা পর্যায় বলা হয়ে থাকে। নিম্নে ব্যবসায় পরিকল্পনার পদক্ষেপ বা ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো:



চিত্র : ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ বা ধাপ

১। ব্যবসায় প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ: ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বিভিন্ন ধারণা উৎস থেকে উদ্যোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্য এমন কিছু প্রকল্পসংক্রান্ত ধারণা চিহ্নিতকরণ। এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে এদের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হয়। এ মাস্টার প্লানে যে কোনো ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ হচ্ছে ধারণার ভিত্তিতে একটি বিকল্প প্রকল্প তালিকা প্রস্তুত করা।

২। প্রকল্পের প্রাকসম্ভাব্যতা যাচাই: প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ পর্যায়ে যে সকল প্রকল্পের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় সে সকল প্রকল্প প্রাথমিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে যথোপযুক্ত প্রকল্পগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হয় এ স্তরে। ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের এ পর্যায়কে প্রাকসম্ভাব্যতা যাচাই বলে। সাধারণত ব্যবসায় বিকল্প প্রকল্পগুলো বিস্তারিতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার পূর্বে ম্যাক্রো বা সামষ্টিক পরিবেশগত উপাদানগুলোর ম্যাক্রো স্ক্রিনিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকসম্ভাব্যতা পরীক্ষাটি সম্পন্ন করে প্রকল্পগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

৩। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই: প্রকল্পের প্রাকসম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ফলাফল অনুকূলে হলে বাস্তব প্রকল্প প্রণয়নে কাজ শুরু হয়। এ পর্যায়ে প্রকল্প ধারণাগুলোকে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

(ক) সম্ভাব্য যাচাই পরীক্ষা: এ স্তরে একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা ম্যাক্রো স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে বাছাই করা প্রকল্পগুলোকে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে পুনরায় যাচাই-বাছাই করেন। যেমন—

(i) বাজার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা: প্রস্তাবিত পণ্যের চাহিদা আছে কিনা, চাহিদার পরিমাণ কত ইত্যাদি যাচাই করাকে সম্ভাব্যতা যাচাই বলে।

(ii) প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা পরীক্ষা: এ পর্যায়ে যেসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় তা হলো বিদ্যুৎ, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, যোগাযোগ সুবিধা, কারিগরি দক্ষতা উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ।

(iii) আর্থিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা: এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য স্থায়ী মূলধন ও কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ, মোট উৎপাদন ব্যয়, আনুমানিক পণ্য মূল্য ইত্যাদি যাচাই করতে হয়।

(iv) বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাই: নির্বাচিত প্রকল্পটি বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক হবে কিনা, হলেও মুনাফার পরিমাণ অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় বেশি কিনা সে বিষয়ে যাচাই করতে হয়।

(v) ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাজনিত সম্ভাব্য পরীক্ষা: ব্যবসা মানেই ঝুঁকি। প্রস্তাবিত প্রকল্প চালুর ক্ষেত্রে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের ঝুঁকির পরিমাণ যাচাই করতে হয়। ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বাজার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, প্রযুক্তিগত ঝুঁকি, সরকারি নীতির পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি।

(খ) মাইক্রো স্কিনিং: মাইক্রো স্কিনিং হলো এমন এক কৌশল, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপাদানের নিরিখে প্রকল্পের যথার্থতা যাচাই করা হয়। এ পর্যায়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পকে আর্থিকভাবে সাজানোর জন্য উদ্যোক্তাকে মাইক্রো স্কিনিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। এখানে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের মূলধন ব্যয়, উৎপাদন ব্যয়, বিক্রয় আয় ও নগদান প্রবাহ প্রাক্কলন করা হয়।

৪। প্রকল্প নির্বাচন: এ পর্যায়ে মাইক্রো স্কিনিং পদ্ধতির মাধ্যমে যে প্রকল্পের র‍্যাংক বেশি হবে সেটিকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা বিনিয়োগের জন্য নির্বাচন করে এবং উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের যদি একাধিক প্রকল্প যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হয় তবে মূলধন বাজেটিং কৌশল প্রয়োগ করে সবচেয়ে উত্তম প্রকল্পটি একজন উদ্যোক্তা নির্বাচন করতে পারে।

৫। ব্যবসায় প্রতিবেদন তৈরি: ব্যবসায় পরিকল্পনার শেষ ধাপ বা পর্যায় হলো বাছাই করা প্রকল্পের একটি প্রতিবেদন তৈরি করা। ব্যবসা প্রকল্প প্রতিবেদনে যে সমস্ত বিষয় সংযুক্ত করতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) প্রকল্পের মোট ব্যয়, (খ) আয়-ব্যয় বিবরণী, (গ) বিক্রীত পণ্যের ব্যয়। (ঘ) উদ্ধৃত পত্র। (ঙ) সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয়।

পরিশেষে, বলা যায় যে উপরোক্ত পদক্ষেপ বা ধাপসমূহ ব্যবসায় পরিকল্পনার সাথে জড়িত। যদি কোনো উদ্যোক্তা উপরোক্ত ধাপগুলো যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

প্রকল্প হিসেবে কোনো ব্যবসাকে নির্বাচন করার পরই ব্যবসা স্থাপনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। ব্যবসার প্রাথমিক কাজ হলো ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ। ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণের উপর ব্যবসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। ব্যবসার অবস্থান কোথায় হবে তা নির্ভর করে উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত কাঁচামালের জোগান এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের উপায়। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা হতে বেশি মুনাফা অর্জন করা। মালামালের অপচয় রোধ, পরিবহন খরচ কমিয়ে ও স্বল্প সময়ে ব্যাপক উৎপাদন করে উৎপাদন খরচ কমানো যেতে পারে। কোনো একটি পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে, তা অত্যন্ত জরুরি বিষয় কাঁচামালের মূল্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রায় সমান থাকে কিন্তু পরিবহন খরচের তারতম্যের উপর মোট উৎপাদন খরচ কম-বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি চা পাতা প্রসেসিং কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে এর অবস্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চা-বাগান থেকে তাজা পাতা সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করা হয়। সুতরাং এই কারখানাটি চা-বাগানের যত বেশি নিকটে স্থাপন করা যায় ততই মোট খরচ কম হবে। কারণ চা-বাগান থেকে চা-পাতা প্রসেসিং কারখানায় আনার জন্য পরিবহন খরচ কম হবে।

আর একটি প্রকল্প যেমন ইটের ভাটায় কাঁচামাল হিসেবে প্রচুর পরিমাণ আঠালো মাটির প্রয়োজন হয়। ঢাকার অদূরে সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুর এলাকায় প্রচুর এটেল মাটি পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত এলাকাগুলোতে যদি ইটের ভাটা স্থাপন করা হয় তবে অল্প খরচেই উন্নতমানের ইট প্রস্তুত করা যাবে। ইট পোড়াতে কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রয়োজন হয়। তাই ইটের ভাটা এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেখানে কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ আছে। এ ধরনের ইটের ভাটা অবশ্যই যশোর বা খুলনায় স্থাপন করা যাবে না। কেননা এখানে এঁটেল মাটি, কয়লা বা গ্যাসের সরবরাহ নেই। সুতরাং কাঁচামাল অল্প খরচে সংগ্রহ করা যায় এবং প্রাকৃতিক শক্তি সহজলভ্য এমন স্থানে কারখানা স্থাপন করতে হবে যাতে মোট উৎপাদন খরচ কম হয়।

কাঁচামালের জোগান যেমন প্রয়োজনীয় দিক, তেমনি উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের দিকও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারখানার উৎপাদিত পণ্য যত কারখানার নিকটে বিক্রয় করা যাবে, বিক্রয় খরচ তত কম হবে। বিক্রয় খরচ যত কম হবে মুনাফার পরিমাণ তত বেশি হবে। কোনো ব্যবসায় উদ্যোক্তা তার ব্যবসার কারখানা খুলনায় স্থাপন করে কিন্তু তার উৎপাদিত পণ্য ঢাকায় এনে বিক্রয় করতে হয় এতে তার পরিবহন ব্যয় বেশি হবে। পরিবহন ব্যয় বেশি হলে মোট ব্যয় বেশি হবে এবং মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। একজন প্রকৃত উদ্যোক্তা অবশ্যই এমন স্থানে তার ব্যবসায় স্থাপন করতে চাইবেন না। কারণ তিনি চাইবেন এমন স্থানে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে, যেখানে তার মোট ব্যয় কম হবে, বিক্রয় বেশি হবে এবং লাভ বেশি হবে।

একজন সফল ব্যবসা উদ্যোক্তা হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার ফিরোজ হায়দারের কথা আমরা উল্লেখ করব। তার ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি কার্যকর ছিল। তিনি কম্পিউটারের সাথে ব্যবহার্য একটি যন্ত্র তৈরি করেন। এই যন্ত্র তৈরির কারখানা তিনি ঢাকা শহরের মধ্যেই সোবাহানবাগে স্থাপন করেছেন। কারণ তিনি জানেন যে, যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন তারাই এই যন্ত্রটি ব্যবহার করেন। অন্যান্য শহরের তুলনায় ঢাকা শহরেই

সবচেয়ে বেশি কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার ফিরোজ অতি অল্প খরচে তার তৈরি যন্ত্রটি ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করতে পারছেন। যদি তিনি ঢাকাতে কারখানা স্থাপন না করে দিনাজপুরে স্থাপন করতেন, তবে তার বিতরণ খরচের সাথে অতিরিক্ত পরিবহন খরচ যুক্ত হতো এতে তার মোট ব্যয় বেশি হওয়ার দরুন মুনাফার পরিমাণ খুবই কম হতো।

সুতরাং একজন সফল ব্যবসা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চাইলে অবশ্যই ব্যবসা শুরু করার পূর্বে ব্যবসার অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

৫.৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যে সকল বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. পরিবহন ও যাতায়াতের সুবিধা (Transport and Traffic Facility): ব্যবসার সফলতা উন্নত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। এজন্য এর অবস্থান নির্বাচনে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্যবসার অবস্থান কেন্দ্রের সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানের পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হলে একদিকে ক্রেতারা সহজেই ঐ স্থানে আগমন করতে পারে অপরদিকে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে অতি সহজে সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য পরিবহন ও যাতায়াত সুবিধার কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা গড়ে উঠেছে।

২. ব্যবসার প্রকৃতি (Nature of Business): ব্যবসার অবস্থান নিরূপণের জন্য এর প্রকৃতি বিবেচনা করা হয়। এজন্য দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা সংগঠন ভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠে। যেমন বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো শহরের কেন্দ্রস্থলে গড়ে উঠলেও ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামের যে কোনো সুবিধামতো স্থানে গড়ে ওঠে। যেমন- নারায়ণগঞ্জে পাটশিল্প ও টঙ্গীর বস্ত্রশিল্প এলাকা।

৩. গুদামজাতকরণ সুবিধা (Ware housing Facility): ব্যবসায়ী ক্রেতা বা ভোক্তাদের উদ্দেশ্যে উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারীর কাছ থেকে একসাথে ব্যাপক পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে আনে। এজন্য তাকে গুদামজাত করে রাখতে হয়। তাই দেখা যায় বিভিন্ন শহর, বন্দর ও বাজার এলাকার আশপাশে প্রচুর গুদাম ঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্যবসায়ীগণ তাদের পণ্য সংরক্ষণের সুবিধার জন্য এ সকল স্থানকে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনকে বিবেচনায় আনে।

৪. কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা (Availability of Raw Materials): পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবস্থান নির্বাচনের জন্য কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনা হয়। কারণ কাঁচামাল উৎপাদন এলাকায় গড়ে উঠলে উৎপাদন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ চা উৎপাদন অঞ্চলে চা শিল্প, ইক্ষু উৎপাদন অঞ্চলের আশপাশে চিনিশিল্প প্রভৃতি ব্যবসা গড়ে ওঠে।

৫. শ্রমশক্তির সহজপ্রাপ্যতা (Availability of Manpower): যে সমস্ত ব্যবসায় প্রচুর শ্রমশক্তি ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর অবস্থান নির্বাচনে শ্রমিক কর্মীর সহজপ্রাপ্যতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। কারণ শ্রমশক্তির সহজপ্রাপ্যতার কারণে আমাদের দেশে বহু বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন—বাটা কোম্পানি। তাছাড়া আমাদের দেশে সস্তায় এবং সহজে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় বিধায় এখানে অনেক গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠেছে।

৬. জ্বালানিশক্তির সহজপ্রাপ্যতা (Availability of Fuel): ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনে জ্বালানিশক্তির সহজপ্রাপ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে সহজে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও কয়লা প্রভৃতি সহজে পাওয়া যায় সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৭. ক্রেতাদের অবস্থান (Standard of Customer): ক্রেতাদের মান, রুচি ও চাহিদা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবসার অবস্থানগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

৮. জমির মূল্য (Value of Land): বর্তমানে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনে প্রস্তাবিত ব্যবসার প্রয়োজনীয় জমির মূল্যকে বিবেচনায় আনা হয়। যেখানে উঁচু জমি বন্যামুক্ত সস্তায় পাওয়া যায় সেখানে ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৯. বাজারের সান্নিধ্য (Adjacent of Market): ব্যবসার অবস্থান সাধারণত বাজার এলাকায় গড়ে ওঠে। কারণ ব্যবসা মূলত বাজারকেন্দ্রিক। এজন্য ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনে পণ্যের বাজার এলাকাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

১০. মূলধনের পরিমাণ (Amount of Capital): ব্যবসার উদ্যোক্তা কী পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করতে পারবে তার উপর ভিত্তি করে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন করতে হয়। অধিক পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করতে পারলে এবং তা যদি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হয় তবে শহর এলাকায় বিবেচনায় আনতে হয়। অন্যথায় মূলধন স্বল্প হলে এবং তা যদি ক্ষুদ্রায়তন হয় সেক্ষেত্রে সুবিধামতো যে কোনো স্থানে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন করা যায়।

১১. ভাড়া অগ্রিম (Rent Advance) : অনেক সময় ব্যবসায়ীকে একসাথে প্রচুর টাকা অগ্রিম দিয়ে একটি নির্ধারিত ভাড়া চুক্তিতে ব্যবসার স্থান নির্বাচন করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর পক্ষে টাকা সরবরাহ দেওয়ার সামর্থ্য কতটুকু সে বিষয়ে বিবেচনাপূর্বক ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন করা হয়।

১২. সহযোগী ব্যবসার উপস্থিতি (Existence of Subsidiary Business): ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়। আর এজন্য দেখা যায় শিল্প কারখানার পাশে খুচরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও মেরামত কারখানার ব্যবসা গড়ে ওঠে।

১৩. সম্প্রসারণের সুযোগ (Facility of Expansion) : ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা কতটুকু তা বিবেচনা করতে হয়। ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের উন্নতির সাথে সাথে যেন এর সম্প্রসারণ করা যায় সে দিক লক্ষ রেখে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন করতে হয়।

১৪. অন্যান্য বিষয় (Other Factors): ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা, বাজারজাতকরণ সুবিধা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা, ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ইত্যাদির নৈকট্য প্রভৃতি সুবিধামতো অবস্থানে নির্বাচন করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনের উপর ব্যবসার সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই ব্যবসার ধরন অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক অবস্থান নির্বাচন করতে হবে।

প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প ব্যয় নিরূপণ ও অর্থায়ন প্রক্রিয়া

Selection of Project, Determination of Project Cost and Project Financing

ব্যবসা উদ্যোক্তার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকল্প প্রণয়ন। ব্যবসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের উপর। দুর্বল ও অবাস্তব প্রকল্প নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে কোনো ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোক্তার পক্ষেই অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই ব্যবসা শুরু করার পূর্বে শিল্পোদ্যোক্তার প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্রকল্প নির্বাচনে রয়েছে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা অনুসরণ করলে একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তা সঠিক প্রকল্প নির্বাচন করতে পারেন।

প্রকল্পের সংজ্ঞা (Definition of Project)

উৎপত্তিগত অর্থে ‘Project’ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Projicare’ হতে এসেছে যার অর্থ ‘অগ্রে নিক্ষেপ করা’।

সাধারণ অর্থে প্রকল্প বলতে একটি সুনির্দিষ্ট কার্যাবলিকে বোঝায় যেখানে মুনাফা অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়।

ব্যাপক অর্থে: কোনো পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাবই হচ্ছে প্রকল্প। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া বা সেবা প্রদান শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যপ্রণালিকেই এক কথায় প্রকল্প বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে উদ্বোধনের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু ছিল একটি প্রকল্প।

নিম্নে প্রকল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো

১। বিশ্ব ব্যাংক (World Bank)-এর মতে, ‘প্রকল্প হচ্ছে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করার সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগের অনুমোদন।’

২। গিটিংগার (Gittinger)-এর মতে, ‘মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পদ ব্যবহারসংক্রান্ত যাবতীয় জটিল কর্মকাণ্ডের সমষ্টিই হচ্ছে প্রকল্প।’

৩। ব্যবস্থাপনা অভিধান (Dictionary of Management)-এর মতে, ‘কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করার জন্য প্রণীত ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ কর্মপন্থাকে প্রকল্প বলে।’

৪। আমেরিকা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (America Management Institute)-এর মতে, ‘প্রকল্প হচ্ছে এমন একটি কার্যক্রম, যা একবারের জন্য গৃহীত হয়, যার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সময় নির্ধারিত থাকে এবং যা সম্পন্ন করতে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও সম্পদের প্রয়োজন হয়।’

৫। লিটল মারলিস (Little Mirless)- এর মতে, ‘প্রকল্প হচ্ছে সম্পদ বিনিয়োগের জন্য তৈরি একটি পূর্ণ কর্মপরিকল্পনা, যেটিকে আলাদা করে ন্যায্যভাবে বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়ন করা যায়।’

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রকল্প বলতে এক গুচ্ছ কাজকর্মকে বোঝায় যার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং যা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ফল পাওয়ার জন্য প্রণয়ন করা হয়। যেমন শিল্প স্থাপন, পাইকারি ও খুচরা দোকান স্থাপন, মৎস্য চাষ, ফল চাষ ইত্যাদি।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থ আরো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হলো : জনাব রহিম এমবিএ পাস করে চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন। ঢাকা শহরের আবাসিক গৃহের সমস্যাটি তার চোখে ধরা পড়ে এবং পরবর্তীতে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য সুখী নিবাস নামক একটি ফার্ম স্থাপন করেন। জনাব রহিম তেজগাঁও এলাকায় চার কামরা নামক একটি ফার্ম স্থাপন করেন। তিনি তেজগাঁও এলাকায় চার কামরা বিশিষ্ট বিশতলা আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করার লক্ষ্যে বন্ধন হাউজিং প্রকল্প নামে ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব তৈরি করেন। এখানে সুখী নিবাস ফার্মের একটি প্রকল্প হলো বন্ধন হাউজিং প্রকল্প। একটি সুষ্ঠু প্রকল্প প্রণয়নের কাজকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (ক) প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ (খ) ধারণা মূল্যায়ন (গ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (৪) প্রকল্প নির্বাচন। ছোট-বড় সব প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়।

প্রকল্পের ধারণা (Idea of Project)

একজন উদ্যোক্তার প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় তার প্রকল্প ধারণা অনুভব করার সময় থেকে। প্রকল্প ধারণা এমন একটি বিষয় যা উদ্যোক্তার সৃজনশীল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা হতে জন্ম নেয়। সমাজের চারদিকের পারিপার্শ্বিকতা, অর্থনৈতিকতা ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে প্রকল্পের ধারণা সৃষ্টি করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মৌসুমের সময় টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও গাজীপুর এলাকায় প্রচুর আনারস ও পেয়ারা নষ্ট হয়। তাই এ সময় অত্র এলাকায় আনারস ও পেয়ারার জেলি তৈরি করার প্রকল্প হাতে নেওয়া যায়। ফলে অল্প খরচে জেলি উৎপন্ন করে বাজারজাতকরণ করা সম্ভব। এতে আনারস ও পেয়ারাচাষিরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হতে পারবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারীও মুনাফা উপার্জন করতে পারবে, সেই সাথে দেশের জনগণ-দেশীয় ফলের জেলি ভোগ করতে পারবে। একইভাবে উত্তরবঙ্গে প্রচুর টমেটো জন্মে। সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের অভাবে এগুলোর অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সেখানে টমেটোর জেলি তৈরির কারখানা স্থাপন করলে টমেটোগুলির যথার্থ ব্যবহার হবে, কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং এ প্রকল্পের সাথে জড়িত প্রতিটি ধারণা আর্থিকভাবে লাভবান হবে। আবার, রাজশাহীতে প্রচুর আম জন্মে। তাই মৌসুমের সময় আম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে সারা বছর সেগুলো ভোগ করা যেতে পারে।

ডেসমন্ড কুক এর মতে, ‘কোনো বিষয়ে গবেষণার ফলাফল থেকে ধারণা নিয়ে তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের ধারণা গ্রহণ করা যায়।’

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রকল্প ধারণা হচ্ছে, প্রকল্পের প্রথম পর্যায় যা সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভবের মাধ্যমে উদ্যোক্তার সৃজনশীলতার দ্বারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ধারণা থেকেই প্রকল্পের জন্ম, যা অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য ও অর্থনৈতিকভাবে যোগ্য ও সফল হওয়া আবশ্যিক।

প্রকল্পের ধারণা উন্নয়নের দিক নির্দেশনা (Guide lines for development of project idea)

প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে, যেগুলোকে প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণের গাইড লাইন বা দিকনির্দেশনা বলে আখ্যায়িত করা যায়। নিম্নে সঠিক প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণের কতিপয় গাইড লাইন উল্লেখ করা হলো:

- ১। যে কাজে নিজের শখ (Hobby) বা আগ্রহ আছে এমন কাজ বা বিষয় থেকে ব্যবসার ধারণা করা উচিত।
- ২। কোনো একটি জিনিসের অভাব অনুভব করলে সে জিনিসটি এখানে কেন পাওয়া যায় না, কারণ অনুসন্ধান করা।
- ৩। অন্য প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা বা উৎপাদকের পণ্য বা সেবাসমূহের অসুবিধা বা খারাপ দিক পর্যবেক্ষণ করা এবং তা থেকে নতুন ধারণা সংগ্রহ করা।
- ৪। কোনো একটি সাধারণ জিনিসের বিশেষ ব্যবহারের আলোকে নতুন ধারণার চিন্তা করা।
- ৫। পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থানসমূহ থেকে নতুন কিছু উৎপাদনের সুযোগ অনুসন্ধান ও উদ্ভাবন করা।
- ৬। আধুনিক কলা-কৌশল ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ থেকে ব্যবসার ধারণা সৃষ্টি করা।
- ৭। বিশেষ পরিস্থিতি দ্বারা চাহিদা পূরণের প্রেক্ষিতে নতুন ধারণা লাভ করা।
- ৮। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা।
- ৯। সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার ক্ষেত্রে পণ্য মিশ্রণের বা নতুন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

উপসংহার: বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। একজন প্রকল্প উদ্যোক্তা উপরোল্লিখিত বিভিন্ন উৎস ও গাইড লাইন অনুসরণ করে প্রকল্প সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন।

প্রকল্প ধারণার উৎসসমূহ (Sources of project Ideas)

প্রকল্প ধারণা হচ্ছে প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায় একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার উদ্যোগ কার্যক্রম মূলত শুরু হয় তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা থেকে।

একটি দুর্বল ও অবাস্তব শিল্প ধারণা একজন উদ্যোক্তার সফলতাকে যেমন সীমিত করে, আবার একটি সঠিক ও বাস্তব প্রকল্প ধারণা একজন উদ্যোক্তার সাফল্যকে অনেকাংশে নিশ্চিত করে।

নিম্নের এক বা একাধিক উৎস থেকে একজন উদ্যোক্তা প্রকল্পসংক্রান্ত ধারণা পেতে পারে।

১। **সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি (Comprehensive Economic policy):** সরকার কর্তৃক ঘোষিত সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি, বিশেষ করে বাণিজ্যিক নীতি, বিনিয়োগ নীতি প্রভৃতি থেকে প্রকল্প ধারণা পাওয়া যায়। কারণ সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন ক্ষেত্র উল্লেখ করে বাণিজ্যিক নীতি, শিল্পনীতি, বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করে। ফলে এ সকল নীতি পর্যালোচনা করে নতুন প্রকল্পের ধারণা পাওয়া যায়। বাণিজ্য নীতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, কোন পণ্য আমদানি করা যাবে, কোন পণ্য রপ্তানি করা যাবে। এতে নতুন নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২। **পণ্যের চাহিদা সরবরাহ বিশ্লেষণ (Analysis of Demand and Supply of Goods):** মানুষের ব্যবহৃত পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ বিশ্লেষণ করে প্রকল্প ধারণা পাওয়া যায়। কারণ এতে বোঝায় যায় যে, কোনো পণ্যের চাহিদা বেশি অথচ সরবরাহ তুলনামূলকভাবে কম। যে পণ্যের চাহিদা রয়েছে অথচ সরবরাহ পর্যাপ্ত নেই, সে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া যায়।

৩। **গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development):** বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করে নতুন পণ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে বা উৎপাদনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে নতুন প্রকল্প ধারণা পাওয়া যায়। যেমন-গবেষণার মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ আবিষ্কার ও উৎপাদন করা যায়, মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন খাদ্য আবিষ্কার করা ইত্যাদি।

৪। **আঞ্চলিক শিল্পায়ন জরিপ (Survey of Regional Industrialization):** অঞ্চলভেদে শিল্পের জরিপ করে বোঝা যায় যে, কোন অঞ্চলে কী ধরনের পণ্য উৎপাদন করা সহজ; কোন অঞ্চলে কী ধরনের পণ্যের চাহিদা রয়েছে অথচ পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। তাই জরিপ থেকে এ ধারণা নিয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া যায়।

৫। **বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মসূচি (Development Programme):** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন-শিল্প ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক প্রভৃতি কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি থেকে নতুন প্রকল্প স্থাপনের ধারণা পাওয়া যায়।

৬। **রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা (Delivered Lecture by Political Leaders):** রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বক্তৃতা করার সময় সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। এ থেকে নতুন প্রকল্প ধারণা গ্রহণ করা যায়।

৭। **দেশের আমদানি-রপ্তানির অবস্থা, শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ (Export-Import Conditions & Industrial Production):** দেশের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের বর্তমানে অবস্থা প্রভৃতি আলোচনা করে দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প ধারণা গ্রহণ করা যায়।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান (University & Research Institution): বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্য হতে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। এ থেকে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যায়।

৯। সরকারি-বেসরকারি সংস্থা (Govt. and Non-Govt. Concern): বিভিন্ন সরকারি সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য, যেমন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশনা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি হতে নতুন প্রকল্প ধারণা পাওয়া যায়। একইভাবে বেসরকারি সংস্থা, যেমন- ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য থেকেও প্রকল্প ধারণা পাওয়া যায়।

১০। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ: এ প্রতিষ্ঠান অনেকগুলো শিল্প পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে এবং অনেক পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করেছে। এ পরিষদের গবেষণা কর্মকাণ্ড সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন প্রকল্প বা শিল্প ধারণার উৎস হতে পারে।

১১। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি): এ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো উদ্যোক্তাদের লাভজনক ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেওয়া। একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তা বাস্তবসম্মত শিল্প ধারণার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারে।

১২। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য কেন্দ্র (বিটাক): এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে দেশের উন্নয়নমুখী প্রযুক্তি সম্বন্ধে সজাগ করে সম্ভাব্য প্রকল্প ধারণার একটি উৎস হিসেবে কাজ করে।

১৩। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক): ব্যবসা বা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে নতুন উদ্যোক্তাদের প্রকল্প ধারণা নির্বাচনে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে থাকে। তাই বিসিকও একজন উদ্যোক্তার কাছে প্রকল্প ধারণার উৎস হতে পারে।

১৪। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (বেপজা): বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত এলাকা কর্তৃক এর প্রকাশনাসমূহ একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে রপ্তানি শিল্পের বাস্তব ধারণা জোগান দিতে পারে।

১৫। অনানুষ্ঠানিক উৎসসমূহ: অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন উৎস থেকেও একজন উদ্যোক্তা প্রকল্প ধারণার উৎস পেতে পারেন। যেমন-

ক. ক্রেতা: ক্রেতাদের কাছ থেকে বর্তমান পণ্যসামগ্রীর দোষ-ত্রুটি সীমাবদ্ধতা জানা যায়, তেমনি নতুন পণ্যের চাহিদা নিরূপণ করে। ক্রেতাদের কাছ থেকে নতুন পণ্য সম্পর্কিত ব্যবসায়িক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

খ. পাইকারি ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারী: একজন উদ্যোক্তা তার বর্তমান পাইকার ও সরবরাহকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন ব্যবসায় সংক্রান্ত ধারণা পেতে পারেন।

গ. ব্যবসায় প্রদর্শনী: প্রকল্পসংক্রান্ত নতুন ধারণা পাওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার ব্যবসায় প্রদর্শনী সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরের উৎসগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক, বিভিন্ন পরামর্শ দাতা প্রতিষ্ঠান বা উৎস থেকে প্রকল্পসংক্রান্ত ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

প্রকল্পের প্রকারভেদ (Types of Project)

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। নিম্নে প্রকারভেদগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

- ১। সরকারি প্রকল্প: সরকারি প্রকল্প সাধারণত জনকল্যাণমুখী ও অমুনাফাভোগী হয়ে থাকে। যেমন- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প, বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্প, পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প, যমুনা বহুমুখী প্রকল্প ইত্যাদি।
- ২। সামাজিক প্রকল্প: সমাজের সকল শ্রেণির লোকের উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় সেগুলোকে সামাজিক প্রকল্প বলে। যেমন- সবার জন্য শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ইত্যাদি।
- ৩। প্রতিস্থাপন প্রকল্প: সম্পত্তি বাতিল বা অকেজো হয়ে পড়লে তার পরিবর্তে নতুন সম্পত্তি প্রতিস্থাপন করার প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তাকে প্রতিস্থাপন প্রকল্প বলে। যেমন- পুরনো যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রকল্প।
- ৪। গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প: ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদা দ্রুত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য ব্যবসায় উদ্যোক্তা গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকেন। বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ যেমন লিভার ব্রাদার্স, বাটা কোম্পানি এ ধরনের প্রকল্প সব সময় গ্রহণ করে।
- ৫। সম্প্রসারণ প্রকল্প: ব্যবসায় উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সম্প্রসারণের জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাকে সম্প্রসারণ প্রকল্প বলে।
- ৬। রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প: কোনো সম্পত্তির বা যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা এবং পণ্যের গুণগতমান রক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাকে রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প বলে।
- ৭। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প: বিভিন্ন ধরনের ব্যয় কমানোর ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাকে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বলে।

প্রকল্প নির্বাচন (Selection of Project)

পণ্য নির্বাচনে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সঠিক পণ্য নির্বাচনের উপরই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে। বাজার জরিপের মাধ্যমে একজন শিল্পোদ্যোক্তা সঠিক পণ্য নির্বাচন করতে পারেন। পণ্য নির্বাচনের পর উদ্যোক্তা সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। এই তালিকা থেকে ম্যাক্রোক্রিনিং-এর মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত প্রকল্প তালিকা তৈরি করবেন। সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে মাইক্রোক্রিনিং-এর মাধ্যমে একটি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবেন।

প্রকল্প নির্বাচনের ধাপগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

ক. ম্যাক্রোস্ক্রিনিং

খ. মাইক্রোস্ক্রিনিং

ক. ম্যাক্রোস্ক্রিনিং (Macro Screening): যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্পের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত, জনসংখ্যাবিষয়ক প্রভৃতি সামষ্টিক পরিবেশের প্রভাব যাচাই করা হয় তাকে ম্যাক্রোস্ক্রিনিং বলা হয়। ম্যাক্রোস্ক্রিনিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো প্রকল্পের উপর এসব উপাদানের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যাচাই করা যায়।

ম্যাক্রোস্ক্রিনিং পরিবেশের উপাদানসমূহ (Influential Factors of Macro-environment)

১। **জনসংখ্যা বিষয়ক (Populational):** কোনো প্রকল্পের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের জনসংখ্যার উপর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, ঘনত্ব, মৃত্যুহার, বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদির উপর ব্যবসা অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রকল্পের ধরন নির্বাচনের সময় প্রকল্পাধীন পণ্যের ভোক্তার সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতি বিবেচনা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিঙ্গার সেলাই কলের প্রস্তুতকারক ভেবেছিল মহিলারা ঘরে বসে সেলাই কাজ করবে। কিন্তু মহিলারা বাইরের কর্মজীবনে প্রবেশ করায় এ ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। তাই প্রকল্প নির্বাচনের সময় জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত আচরণ অবশ্যই বিচার্য বিষয়।

২। **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment):** কোনো এলাকার অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে ঐ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান ও ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা নিরূপণ করতে হবে। প্রকল্প নির্বাচনের সময় যেসব অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বিবেচনা করতে হয় সেগুলো হলো:

ক. **ভোক্তার আয়:** আয়ের ভিত্তিতে ভোক্তাদের উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। কোন শ্রেণির ভোক্তাদের টার্গেট করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা কত সেটা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়।

খ. **খরচ করার প্রবণতা:** ভোক্তার মৌলিক চাহিদা হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদি। এ চাহিদাগুলোর মধ্যে কোনটির জন্য ভোক্তার আয়ের বেশি অংশ ব্যয় করে তা নির্ধারণ করে প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে।

গ. **জীবনযাত্রার মান নির্বাহের খরচ:** প্রকল্প নির্বাচনের সময় জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান ও ব্যয় বিবেচনা করতে হবে। অনেক পণ্য আছে যা মানুষের প্রয়োজন, কিন্তু আয় এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের মান বিবেচনা করে তা ক্রয় করতে পারছে না।

৩। প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural environment): প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আসে। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে মানুষ আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কাজেই নতুন প্রকল্প যেন পরিবেশ দূষণের কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৪। রাজনৈতিক পরিবেশ (Political environment): দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত। তাই প্রকল্প নির্বাচনের পূর্বে বিবেচনা করতে হবে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শন, আচরণ নীতিমালা ইত্যাদি।

৫। সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural environment): একটি দেশের সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় আচার-আচরণ, শিক্ষার হার, কারিগরি শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যবসার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এগুলোও বিবেচনা করতে হবে।

৬। আইনগত পরিবেশ (Legal environment): ব্যবসা-বাণিজ্য সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আইনের ধরন, আইনের যথার্থ প্রয়োগ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ইত্যাদি সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়।

ম্যাক্রো স্ক্রিনিং পদ্ধতির উদাহরণ

ম্যাক্রো স্ক্রিনিং উপাদানসমূহ ম্যাক্রো স্ক্রিনিং ছকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সাজাতে হবে এবং লিজেণ্ডে উল্লিখিত মান উপাদানের বিপরীত বসাতে হবে। মান বসানো শেষ হলে মোট নম্বর অনুযায়ী প্রকল্পগুলোকে র্যাংকিং করতে হবে। এভাবে ৫টি প্রকল্প ধারণার সৎক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

নিম্নে ম্যাক্রো স্কিনিং পদ্ধতির একটি কাল্পনিক উদাহরণ দেওয়া হলো:

ম্যাক্রো স্কিনিং ছক

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	জনসংখ্যা	অর্থনৈতিক	প্রাকৃতিক	প্রযুক্তিগত	রাজনৈতিক	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক	আইনগত	মোট	র্যাংক
১	আবাসিক ফ্ল্যাট প্রকল্প	৪	৫	৩	৪	২	৩	৪	২৫	৩
২	ডেইরি ফার্ম	৫	৪	৩	২	২	৩	৪	২৩	৪
৩	আইসক্রিম	৪	৪	৩	২	২		৩	২১	-
৪	ফাস্ট ফুডস্	৫	৫	৪	৪	২	৪	৩	২৭	১
৫	ফার্নিচার মার্চ	৩	৩	৩	৩	২	৩	৩	২০	-
৬	প্রিন্টিং প্রেস	৫	৫	৪	৪	২	৩	৩	২৬	২
৭	সয়া সস	৩	৩	৩	৩	২	২	৩	১৯	-
৮	টমেটো সস	৪	৪	৫	২	২	৩	২	২২	৫
৯	স্টিল আলমারী	৪	৩	৩	৩	২	২	২	১৯	-

মানদণ্ডসমূহ

৫	-	অতি উত্তম
৪	-	অত্যন্ত সন্তোষজনক
৩	-	সন্তোষজনক
২	-	ভালো
১	-	অসন্তোষজনক

সংক্ষিপ্ত তালিকা (পাঁচটি)

মানদণ্ডের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকল্প বাছাইয়ের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মোট মান	র্যাংক	অবস্থান
৪	ফাস্ট ফুডস	২৭	১	
৬	প্রিন্টিং প্রেস	২৬	২	
৩	ফ্ল্যাট নির্মাণ	২৫	৩	
২	ডেইরি ফার্ম	২৩	৪	
১	টমেটো সস	২২	৫	

বিভিন্ন পরিবেশগত প্রভাবসমূহের নিরিখে প্রকল্পসমূহের মান বণ্টন করে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫টি প্রকল্প বাছাই করা হলো।

মাইক্রো স্ক্রিনিং (Micro Screening)

গ্রহণযোগ্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজিয়ে যে ছক তৈরি করা হয় তাকে মাইক্রো স্ক্রিনিং বলে। মাইক্রো স্ক্রিনিং হলো এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপাদানের নিরিখে প্রকল্পের যথার্থতা বাছাই করা হয়। মাইক্রো স্ক্রিনিং-এর মাধ্যমে প্রকল্পের কারিগরি, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক পরীক্ষা করা হয়। মাইক্রো স্ক্রিনিং করার সময় ছকের বিভিন্ন ঘরে ছকের মান বসিয়ে প্রতিটি প্রকল্পের মোট মান নিরূপণ করে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এরূপে পছন্দের প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। নিম্নে মাইক্রো স্ক্রিনিং-এর একটি কাল্পনিক ছক দেখানো হলো:

মাইক্রো স্ক্রিনিং নমুনা ছক কোম্পানির নাম.....

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মাইক্রো উপাদানসমূহ										
		পণ্যের চাহিদা	কাঁচামালের প্রাপ্যতা	দক্ষ শ্রমিক প্রাপ্যতা	প্রযুক্তি	ঝুঁকি	মূলধনের প্রাপ্যতা	বিবরণ	মুনামি সুবিধা	প্রতিযোগিতার সংখ্যা	মোট	র‍্যাংক
১	ফাস্ট ফুড	৫	৫	৪	৪	৪	৫	৫	৪	৪	৪০	১
২	ফুড জুসপ্লান্ট	৪	৪	৩	৩	২	৩	৩	২	৩	২৭	৪
৩	চমেটো	৫	৪	৩	৩	২	২	২	২	২	২৫	৫
৪	ডেইরি খামার	৫	৪	৪	৩	৪	৩	২	৩	২	৩০	৩
৫	মৎস্য খামার	৫	৫	৪	৪	৪	৪	৩	৪	৪	৩৭	২

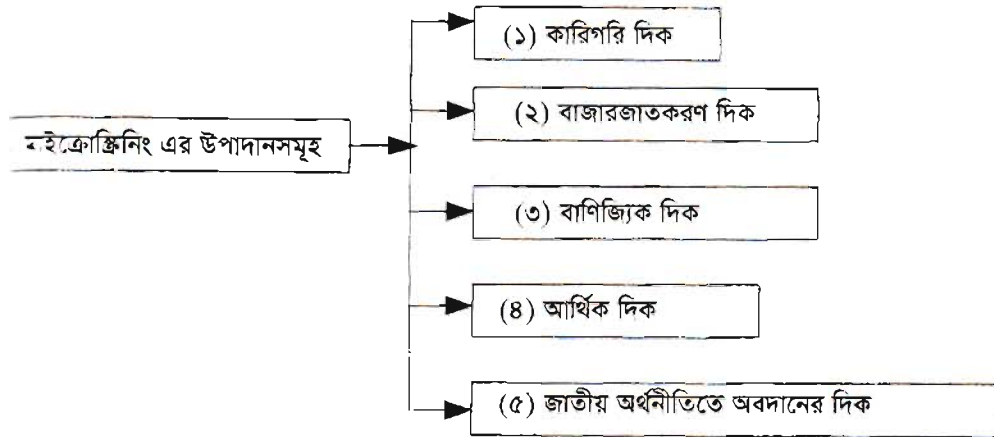
মানদণ্ডসমূহ

অতি উত্তম	৫
সন্তোষজনক	৩
ভালো	২
অসন্তোষজনক	১

উল্লিখিত মাইক্রো স্ক্রিনিং ছক বিশ্লেষণ করে ৫টি প্রকল্পের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ফাস্ট ফুড প্রকল্পটি প্রথম, মৎস্য খামার প্রকল্পটি দ্বিতীয় এবং ডেইরি ফার্ম প্রকল্পটি তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একজন উদ্যোক্তা মাইক্রো স্ক্রিনিং-এ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত প্রকল্পকে সর্বোত্তম প্রকল্প হিসেবে বাছাই করে থাকে।

মাইক্রো স্কিনিং পরিবেশের উপাদানসমূহ

নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে মাইক্রো স্কিনিং-এর উপাদানসমূহ দেখানো হলো :



১। কারিগরি দিক (Technical): একটি প্রকল্পের যথার্থতা প্রথমেই প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হয়। এ ধরনের কাজের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, শ্রমিকের সহজলভ্যতা, কাঁচামালের সহজলভ্যতা ইত্যাদি।

২। বাজারজাতকরণ দিক (Marketing): প্রকল্পের যথার্থতা যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে বাজার জরিপ। এর মাধ্যমে বাজারে কোনো পণ্যের চাহিদা আছে কিনা, বাজারে প্রতিযোগীর সংখ্যা, পণ্য সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি যাচাই করা সম্ভব হয়।

৩। বাণিজ্যিক দিক (Commercial): প্রকল্পের যথার্থতা পরীক্ষার জন্য বাণিজ্যিক দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক দিকসমূহ হলো উৎপাদন খরচ, বিক্রয় মূল্য, আনুমানিক মুনাফা ইত্যাদি বিষয় খুব সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হবে।

৪। আর্থিক দিক (Financial): প্রকল্প নির্বাচনের জন্য আর্থিক দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন। আর্থিক দিক হলো প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ, মূলধন সংগ্রহের উপায়, বিনিয়োগ থেকে মুনাফা প্রাপ্তির পরিমাণ ইত্যাদি।

৫। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের দিক: জাতীয় অর্থনীতিতে প্রকল্পটি কী অবদান রাখবে তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অর্থনীতিতে অবদান যাচাই করার মাপকাঠি হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রকল্পটি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও লাভজনক তা বিনিয়োগের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

প্রকল্প ব্যয় নিরূপণ (Determination of Project cost)

প্রকল্প ব্যয় বলতে ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনের সংশ্লিষ্ট মূলধনকে বোঝায়। প্রকল্পের ব্যয় নিরূপণ করার সময় স্থায়ী সম্পদ এবং নিট চলতি পুঁজিতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রাক্কলন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রকল্প ব্যয় নিরূপণের সময় মূলধনের পরিমাণ কাম্য মাত্রায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। মূলধনকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. স্থায়ী মূলধন নিরূপণ: স্থায়ী মূলধন বলতে স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহের জন্য যে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের প্রয়োজন হয় তাকেই বোঝায়।

১। **ভূমি ও ভূমি উন্নয়ন:** প্রকল্পটি যে স্থানে স্থাপন করা হবে তার জন্য জমি ক্রয়, জমির উন্নয়ন ব্যয়, দেয়াল নির্মাণ, রেজিস্ট্রেশন ব্যয়, পয়গনিষ্কাশন ইত্যাদি বাবদ যাবতীয় খরচ এই ব্যয়ের আওতায় পড়ে। মনে করি প্রকল্পের ক্ষেত্রে মোট খরচ হবে $(8+1) = ৫$ লক্ষ টাকা।

২। **কারখানা বিল্ডিং এবং অফিস ভবন:** কারখানা বিল্ডিং, অফিস ভবন নির্মাণ এবং তৎসহ বিল্ডিং ডিজাইন ব্যয়, কনসালট্যান্টদের ফিস বিল্ডিং ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। মনে করি বিল্ডিং নির্মাণ বাবদ আনুমানিক ব্যয় হবে ১১ লক্ষ টাকা।

৩। **যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম:** সব শিল্পের বেলায়ই যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় প্রকল্পের স্থায়ী ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ খরচ, আমদানি শুল্ক, পরিবহন খরচ, স্থাপনা খরচ ইত্যাদি যাবতীয় খরচ এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানে খরচ প্রকল্প ব্যয়ের ৬০% ধরা হয়। এক্ষেত্রে মোট ব্যয় ধরা হয় ৪৭ লক্ষ টাকা।

৪। **অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র:** ব্যবসা পরিচালনার জন্য অফিস সরঞ্জাম যথা টাইপরাইটার, কম্পিউটার, টেলিফোন, ক্যালকুলেটর, আলমারি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি বাবদ যাবতীয় খরচ অন্তর্ভুক্ত। এখানে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় ৫ লক্ষ টাকা।

৫। **বস্তুসম্প্রদায়ী সম্পত্তি:** কপি রাইটস, ট্রেড মার্ক, প্যাটেন্টস প্রভৃতি বাবদ কিছু খরচ হয় যা স্থায়ী ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এ জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয় ৩ লক্ষ টাকা।

৬। **উৎপাদন পূর্ব ব্যয়সমূহ:** প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ার অনেকগুলো খরচ হয় যেমন- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা, বাজার সমীক্ষা খরচ, দলিল তৈরি সংক্রান্ত খরচ, যাতায়াত খরচ, টেলিফোন খরচ ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে মোট খরচ ধরা হয় ১ লক্ষ টাকা।

৭। **অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি:** ব্যবসার প্রকৃতি ভেদে আরো কিছু প্রয়োজনীয় সম্পদ যেমন- ইলেকট্রিক জেনারেটর, যানবাহন, ডেলিভারি ভ্যান, পানির ট্যাংক, হান্ডটুলস ইত্যাদি এ খরচের আওতায় পড়ে। মনে করি এখানে মোট ব্যয় ধরা হয় ৩ লক্ষ টাকা।

উপরোক্ত হিসাব মতে মোট স্থায়ী সম্পদে মোট ব্যয় ধরা হয় = ভূমি ও ভূমি উন্নয়ন ৫ লক্ষ+কারখানা ও বিল্ডিং ১১ লক্ষ+ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ৪৭ লক্ষ+ অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ৫ লক্ষ +অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ ৩ লক্ষ +বস্ত্রসত্তাহীন সম্পত্তি ৩ লক্ষ, উৎপাদনপূর্ব ব্যয় ১ লক্ষ = ৭৫ লক্ষ টাকা।

খ. চলতি মূলধন নিরূপণ: যেসব সম্পদ এক বছর বা এর কম সময়ের মধ্যে নগদে রূপান্তর করা যায় সেগুলোকে চলতি সম্পদ বলে। এগুলোর মধ্যে কাঁচামাল, মজুতমাল, অর্ধপ্রস্তুত মাল, শ্রম মজুরি, নগদ, বিবিধ দেনাদার প্রভৃতি প্রধান।

১। কাঁচামাল: কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন হয় তা চলতি মূলধনের আওতাভুক্ত। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মূলধন।

২। তৈরি পণ্য আধাপ্রস্তুত মাল: উৎপাদিত পণ্য ছাড়াও কতগুলো আধা প্রস্তুত মাল রয়েছে যার জন্য অবশ্যই মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়।

৩। ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি: কাগজপত্র, স্টেশনারী, টয়লেট পেপার, কলম, পেন্সিল, সাবান ইত্যাদি। উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে, স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন সব কিছু মিলেই প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করতে হয়।

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Project Feasibility Study)

যে কোনো প্রকল্প গঠনের পূর্বে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা একান্ত আবশ্যিক। কারণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে এর সফলতা ও ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যার্জন নিশ্চিত হয়। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে সাধারণত কারিগরি দিক, আর্থিক দিক, বাজারজাতকরণ, আর্থসামাজিক ও ব্যবস্থাপনার দিক বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করা হয়। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উপাদানগুলো নিম্নরূপ।

ক. কারিগরি দিক (Technical Aspect): প্রকল্পের কারিগরি দিক বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যিক। কারণ এর মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য যে কাঠামোগত সুবিধা প্রয়োজন তা অবগত হওয়া যায় এবং সে অনুসারে সব ধরনের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণ করা যায়। কারিগরি দিক বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করতে হয়:

১। প্রকল্পের আকার (Size of Project): কারিগরি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের আকার নির্ধারণ করা আবশ্যিক। কারণ প্রকল্পের আকারের উপর প্রকল্পের কারিগরি বিষয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। আকারের ওপর নির্ভর করে যে একটি প্রকল্পে কারিগরি দিক কেমন হবে। প্রকল্প ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকার হতে পারে।

২। উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তি (Production process): যে কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার যথোপযুক্ততার উপর উৎপাদন খরচ, পণ্যের

মান, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি নির্ভর করে। এমন প্রক্রিয়া বেছে নিতে হবে যাতে সহজে এবং কম খরচে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং প্রক্রিয়াটিও যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৩। **প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা (Technological System):** প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযুক্তি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি যেন আধুনিক ও দীর্ঘস্থায়ী হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। **যন্ত্রপাতির আকার (Size of Machinery):** প্রকল্প নির্বাচনে যন্ত্রপাতির আকার বিবেচনা করতে হবে। যন্ত্রপাতির আকারের উপর উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদনের পরিমাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদি নির্ভর করে।

৫। **যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহ (Selection and Collection of Plant and Machinery):** প্রকল্প নির্বাচনের পূর্বে প্রয়োজন যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সেগুলো সংগ্রহের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা।

৬। **যন্ত্রপাতির বিন্যাস (Plant Layout):** প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভালো অবস্থানের উপর প্রকল্পের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচনে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

৭। **প্রকল্পের অবস্থান (Location of Project):** প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভালো অবস্থানের উপর প্রকল্পের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচনে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

(ক) ভূমি, (খ) কাঁচামাল, (গ) বাজার, (ঘ) শ্রমিক, (ঙ) পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, (চ) যোগাযোগ, (ছ) অবকাঠামোগত সুবিধা, (জ) অন্যান্য শিল্পের উন্নয়ন, (ঝ) বর্জ্য নির্গমনের উপায় ইত্যাদি।

৮। **প্রকল্প বাস্তবায়নের তালিকা (Project Implementation Table):** প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্প বাস্তবায়ন তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। অর্থাৎ প্রকল্পের কোন পর্যায়ে শেষ করে কোন পর্যায়ে শুরু করতে হবে, তা পূর্বাক্কেই ঠিক করতে হবে।

৯। **প্রয়োজনীয় লোকবল (Manpower):** প্রকল্প বাস্তবায়নে কতজন ও কী ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হবে, তা প্রকল্প গ্রহণের সময় নির্ধারণ করতে হবে।

১০। **বাজার গবেষণা (Market Research):** প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বাজার বা বাজারজাতকরণের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করতে হয়। কারণ যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে বাজার না পেলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না, ফলে প্রকল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। প্রকল্পের বাজার গবেষণায় নিম্নের বিষয়াবলি বিবেচনা করতে হয়:

১। চাহিদার পূর্বানুমান ও পূর্বানুমানের কৌশলসমূহ (Demand forecastion and Techniques of Forecasting): প্রকল্প নির্বাচনের সময় উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য চাহিদা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে এবং চাহিদা অনুমানের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

২। বাজারে পণ্য সরবরাহ ও এ ব্যাপারে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা (Product Supply and its Competitoin): যে পণ্যের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, বাজারে সরবরাহের পরিমাণ কত এবং কী ধরনের প্রতিযোগিতা বিরাজমান, তা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

৩। মূল্য নিরূপণ পলিসি (Pricing Policy): অর্থাৎ কীভাবে পণ্যের মূল্য নিরূপণ করতে হবে প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বেই তা নির্ধারণ করতে হবে।

৪। পণ্যের ব্র্যান্ডের নাম (Brand Name): পণ্যের ব্র্যান্ডের নাম কী হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৫। প্যাকেজিং ও পরিবহন (Packging and Transportation): পণ্যের প্যাকেজিং কেমন হবে ও তা বাজারজাতকরণে পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৬। বণ্টন চ্যানেল (Distritbution Channel): পণ্য বণ্টনের দক্ষতার উপর পণ্য বিক্রির পরিমাণ নির্ভর করে। তাই পণ্য বণ্টনে কী ধরনের চ্যানেল ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ বণ্টন ব্যবস্থা কেমন হবে, সে সম্পর্কে পূর্বাঙ্কেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৭। বিক্রয় বৃদ্ধির উপায় (Means to increase Sales): কীভাবে পণ্যের বিক্রয় বাড়ানো যায়, সে সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে।

৮। বাজারে তথ্যের উৎস (Sources of Market Information): পণ্যের বাজার পর্যবেক্ষণ করে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

গ. আর্থিক দিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন (Different Issues of Marketing): প্রকল্প গঠনের পূর্বে এর আর্থিক দিক বিবেচনা করা আবশ্যিক। কারণ আর্থিকভাবে প্রকল্পটি যুক্তিযুক্ত না হলে কিংবা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে না পারলে প্রকল্প কোনোভাবেই টিকিয়ে রাখা যাবে না।

ঘ. আর্থসামাজিক দিক (Socio-Economic Aspect): যে কোনো প্রকল্পেই আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয় যে, প্রকল্পটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে কী না। কারণ দেশের উন্নয়নে প্রকল্পের কোনো ভূমিকা না থাকলে সে প্রকল্প অর্থহীন।

ঙ. ব্যবস্থাপনা দিক বিশ্লেষণ (Management Aspect Analysis): প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এর ব্যবস্থাপনার দিক বিশ্লেষণ করতে হয়। কারণ প্রকল্পের সফলতা-ব্যর্থতা সবই ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর

করে। প্রকল্পের সবকিছু যথাযথভাবে ঠিক থাকলেও ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার কারণে এটি ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তাই প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার দিক পর্যালোচনা করা দরকার।

৮. উদ্যোক্তার গুণাবলি (Qualities of Entrepreneur): প্রকল্প মূল্যায়নে উদ্যোক্তার গুণাবলি বিশ্লেষণ করা আবশ্যিক। এ পর্যায়ে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

(১) সততা, (২) ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা, (৩) বুদ্ধিমত্তা, (৪) ধৈর্য, (৫) আত্মবিশ্বাস।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোনো প্রকল্প গঠনের পূর্বে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় অর্থাৎ গৃহীতব্য প্রকল্পটি কতটুকু বাস্তবসম্মত বা সমাজ, দেশ, দেশের জনগণের কতটুকু কাজে আসবে কিংবা অর্থনৈতিকভাবে এটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত বা টেকসই হবে ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে কি না। এ বিষয়ে উপরোল্লিখিত দিকসমূহ সূষ্ঠ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যিক। তা না হলে প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

প্রকল্প নির্বাচন অনুশীলনী

উদ্দেশ্য: এই অনুশীলনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রকল্প নির্বাচন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাবে।

১ম ধাপ: শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করতে হবে।

২য় ধাপ: প্রতিটি দলকে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বয়সের ভিত্তিতে একটি ছবি যেমন শিশু (১০ বছর) কিশোর-কিশোরী (১১-১৯ বছর), যুবক-যুবতী (২০-৪০ বছর), তদূর্ধ্ব (৪০-এর উপর) ছবি বিতরণ করতে হবে।

৩য় ধাপ: প্রতিটি দলকে তাদের গ্রুপের প্রয়োজনীয়তা চাহিদার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। চাহিদার অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিস পাওয়ার ইচ্ছার পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য।

৪র্থ ধাপ: প্রতিটি দলকে তাদের লক্ষ জনগোষ্ঠীর চাহিদার তালিকা বড় সাদা কাগজে অথবা বোর্ডে লিখতে বলা হবে।

৫ম ধাপ: প্রতিটি দল তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী ব্রেইন স্টর্মিং করে ৮/১০ টি ব্যবসা চিহ্নিত করবে এবং নিচে ম্যাট্রো স্ক্রিনিং ছকে সাজাতে হবে। সাজানোর সময় ম্যাট্রো প্রভাবকের মান প্রকল্পের বিপরীতে বসাতে হবে। মান বসানো শেষ হলে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন প্রথম তিনটি প্রকল্প নির্বাচন করা হবে।

৬ষ্ঠ ধাপ: নির্বাচিত তিনটি প্রকল্প থেকে একটি প্রকল্প নির্বাচন করার জন্য এগুলোকে পুনরায় কারিগরি, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক, আবাসিক এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের দিক থেকে বিশ্লেষণ করে মাইক্রো স্ক্রিনিং ছকে নির্ধারিত মান অনুযায়ী প্রকল্পের বিপরীতে বসাতে হবে। এভাবে যে প্রকল্পের মান সবচেয়ে বেশি হবে সেটি নির্বাচন করা হবে।

শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা এই অনুশীলন সমাধান করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবেন। এছাড়া ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীদের করণীয় কী বুঝিয়ে বলবেন যেমন, ৩য় ধাপে যে দলকে শিশুর চাহিদার দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হলো তাদের তালিকায় পণ্য হতে পারে খেলনা, ছবির বই, পোশাক, সার্পনার, কলম, টিফিন বক্স ইত্যাদি। এগুলো থেকে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করার সময় পরিবেশের প্রভাবক অনুযায়ী মান নির্ণয় করতে হবে। যেমন- অর্থনৈতিক দিক থেকে টিফিন বক্স অতি উত্তম অর্থাৎ মান হবে ৫, আবার প্রাকৃতিক দিক থেকে সন্তোষজনক অর্থাৎ মান হবে ৩। এভাবে ১০টি প্রকল্পের মোট মান নির্ধারণ করার পর সর্বোচ্চ প্রথম তিনটি প্রকল্প মাইক্রো স্কিনিং-এর জন্য নির্বাচন করা হবে। মাইক্রো স্কিনিং-এর বেলায়ও এভাবে মান বসিয়ে প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে। যে প্রকল্পটির মান সবচেয়ে বেশি হবে বিনিয়োগের জন্য সেটি নির্বাচন করবে।

ম্যাক্রো স্কিনিং ছক

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উপাদানসমূহ						
		জনসংখ্যা	অর্থনীতি	প্রাকৃতিক	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক	আইনগত	মোট মান
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								
৮								
৯								
১০								

মান

৫	-	অতি উত্তম
৪	-	অত্যন্ত সন্তোষজনক
৩	-	সন্তোষজনক
২	-	ভালো
১	-	অসন্তোষজনক

ম্যাক্রো স্কিনিং ছক

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উপাদান সমূহ					
		কারিগরি দিক	বাজারজাতকরণ দিক	বাণিজ্যিক দিক	আর্থিক দিক	জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের দিক	মোট মান
১							
২							
৩							

মান		
৫	-	অতি উত্তম
৪	-	অত্যন্ত সন্তোষজনক
৩	-	সন্তোষজনক
২	-	ভালো
১	-	অসন্তোষজনক

প্রকল্প অর্থায়ন (Project Financing): প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ করার পর ব্যবসায় উদ্যোক্তার পরবর্তী কাজ হলো এর অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

সাধারণ অর্থে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহকে প্রকল্প অর্থসংস্থান বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে কোনো প্রকল্পের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়, তার পরিমাণ নির্ধারণ, উক্ত অর্থ বা তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ শনাক্তকরণ, বিভিন্ন নীতি ও শর্ত বিবেচনা করে অর্থ সংগ্রহ, সংগৃহীত অর্থের সঠিক ব্যবহার করে ঐ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়াকে প্রকল্প অর্থায়ন বলে।

নিম্নে প্রকল্প অর্থায়নের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। ই. ডব্লিউ ওয়াকার এর মতে, ‘কোনো প্রকল্পের আর্থিক কার্যাবলির পরিকল্পনা সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ ও কর্মকাণ্ডের প্রয়োগ হচ্ছে প্রকল্প অর্থায়ন।’

২। গুটম্যান ও জুগালের মতে, ‘প্রকল্পের ব্যবহৃত তহবিলের পরিকল্পনা, সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলিকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।’

৩। গ্লস ও বেকার (Gloss and Baker)-এর মতে, ‘একটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস নিরূপণ এবং এই উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ বা ঋণের যথোপযুক্ত ব্যবহারের সাথে প্রকল্পের অর্থ সংস্থান জড়িত।’

যদি সম্পূর্ণ মূলধন নিজস্ব তহবিল থেকে দেয়া সম্ভব হয় তবে উত্তম, না হলে ধার করতে হবে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে। অর্থায়নের প্রকৃতি অনুযায়ী মূলধনকে দীর্ঘ মেয়াদি মূলধন ও স্বল্প মেয়াদি মূলধন হিসেবে ভাগ করা যায়।

ক. স্বল্প মেয়াদি অর্থ সংস্থানের উৎসসমূহ (Sources of short term Financing): স্বল্প মেয়াদি অর্থ সংস্থানের প্রধান উৎসগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। মালিকের নিজস্ব তহবিল: ব্যবসায় মালিক তার নিজস্ব উৎস থেকে স্বল্পমেয়াদি পুঁজি সরবরাহ করে থাকেন।

২। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব: ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণ কারবারি প্রয়োজনে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ঋণ করে স্বল্পমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম উৎস। বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে ঋণের ব্যবসায়ী। এ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের নগদ ঋণ আকারে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। মেয়াদ শেষে এ ধরনের ঋণ পরিশোধ করে থাকে।

৪। ব্যবসায়িক ঋণ: ধারে বা বিলম্বিত পরিশোধের ভিত্তিতে মাল ক্রয় করে স্বল্পমেয়াদি পুঁজির চাহিদা মেটানোকে ব্যবসায়িক ঋণ বলে। ব্যবসায়িক ঋণ স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৫। অর্থ ঋণদানকারী মহাজন: গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ীরা স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান করে থাকেন। তবে এ ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি বিধায় এ উৎসবের ব্যবহার খুবই সীমিত। এটি গ্রামাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের একটি অন্যতম উৎস।

৬। সমবায় ব্যাংক: সমবায় ব্যাংকসমূহ দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে স্বল্পমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন মেটায়।

৭। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাংক: এ জাতীয় ব্যাংক বড় আকৃতির প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৮। বিল বাট্টাকরণ: ব্যবসায়ীগণ সংগৃহীত বিনিময় বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন।

৯। গ্রামীণ ব্যাংক: গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জামানতবিহীন স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

১০। বেসরকারি সংস্থা: বেসরকারি সংস্থার মধ্যে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা অন্যতম। গ্রামের মানুষকে স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান করে থাকে। তবে লক্ষণীয় বিষয়ম এ সমস্ত সংস্থার সুদের হার বেশি।

১১। সমবায় ঋণদান সমিতি: সমবায় ঋণদান সমিতির কাছ থেকে জামানত প্রদানের মাধ্যমে স্বল্পকালীন ঋণ গ্রহণ করে অর্থসংস্থান করা যায়।

১২। বন্ধকী ব্যাংক: বন্ধকী ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদের ঋণ দিয়ে থাকে।

১৩। কমার্শিয়াল পেপার হাউজ: যে সকল প্রতিষ্ঠানের ভালো গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তারা ছড়ি অঙ্গীকারপত্র ইত্যাদি মেয়াদ পূর্তির পূর্বে এখানে বিক্রয় করে আগাম অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

১৪। অন্যান্য উৎস: উপরোক্ত উৎস ছাড়াও শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা মূলধনজনিত সমস্যা সমাধানে স্বল্পমেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে।

খ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস (Sources of Long term Financing)

কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য যে অর্থ ঋণ সংগ্রহ করে তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান বলে। এ ঋণের অর্থ সাধারণত ঋণ গ্রহণের দশ বছরের অধিক সময়ে পরিশোধের ব্যবস্থা থাকে। এ ঋণের অর্থ স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীগণ যেসব উৎস থেকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করে থাকেন তা নিম্নরূপ:

- ১। মালিকের নিজস্ব তহবিল: ব্যবসায়ের মালিকগণ দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের মূল উৎস। মালিক তার সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ের দীর্ঘ মেয়াদি মূলধনের জোগান দেন।
- ২। শেয়ার বিক্রয়: যৌথ মূলধনি কোম্পানিসমূহ শেয়ার বিক্রয় করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করতে পারে।
- ৩। সঞ্চিত তহবিল: যৌথ মূলধনি কোম্পানিসমূহ তার সঞ্চিত তহবিল ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করতে পারে।
- ৪। বিমা কোম্পানিসমূহ: বর্তমানে বিমা কোম্পানিসমূহ যৌথ মূলধনি কারবারের দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।
- ৫। ঋণপত্র বিক্রয়: ঋণপত্র হলো কারবারের ঋণ স্বীকারের দলিল। এ ঋণপত্র বিলি করে কারবারের দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করতে পারে।
- ৬। বাণিজ্যিক ব্যাংক: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ধরনের জামানতের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সরবরাহ করে থাকে।
- ৭। শিল্প ব্যাংক: বাংলাদেশের শিল্প ব্যাংক দেশের শিল্পায়নের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।
- ৮। বিনিয়োগ সংস্থাসমূহ: এরা জনসাধারণের কাছে শেয়ার ও সিকিউরিটি বিক্রয় করে অর্থসংস্থান করে থাকে।
- ৯। বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ: বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা প্রভৃতি। দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যাপারে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
- ১০। লিজিং কোম্পানি: আজকাল বেশ কিছু লিজিং কোম্পানি রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থ জোগান দিয়ে থাকে।
- ১১। পুঁজি বিনিয়োগ বোর্ড: বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ বোর্ডও ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে।
- ১২। বিসিক (BSIC): ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স দীর্ঘমেয়াদি মূলধন জোগানের অন্যতম উৎস।
- ১৩। সরকারি তহবিল: রাষ্ট্রীয় কারবারে সরকার দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।
- ১৪। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন: নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের জোগান দেওয়া সম্ভব না হলে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে।
- ১৫। আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ব্যাংক ও সংস্থা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থান করে থাকে। যেমন-এডিবি।
- ১৬। বিশ্ব ব্যাংক: বিশ্ব ব্যাংক উন্নয়নশীল দেশসমূহে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত।

১৭। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সরবরাহ করে থাকে।

চলতি মূলধন (Current Capital)

ব্যবসার দৈনন্দিক কাজ বা যাবতীয় উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাই চলতি মূলধন। সাধারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে বিক্রি করার জন্য পণ্য ক্রয় করচ, কর্মচারীদের বেতন, পণ্য স্টক প্রভৃতি বাবদ চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনমূলক ব্যবসার ক্ষেত্রে কাঁচামালের ব্যয়, পরিবহন খরচ, আধাপ্রস্তুতকৃত পণ্য, শ্রমিকদের মজুরি, জ্বালানি খরচ, পণ্য বহন করার জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। চলতি মূলধনের টাকা খরচ হয়ে যাবার পর ফেরত আসে কাস্টমার পণ্য বা সেবার মূল্য প্রদান করে। সে টাকা দিয়েই আবার পরবর্তী সময়ে পণ্য তৈরির জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। ব্যবসার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের পরিমাণ আগেই হিসাব করে নিতে হবে।

মূলধন ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি

প্রকল্প ব্যয় নিরূপণের একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক। জনাব আব্দুল মান্নান একটি ছোট আকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ফার্ম প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন, যার উৎপাদন পণ্য হবে ব্রেড। ফার্মটি স্থাপন করতে তার স্থায়ী ও চলতি মূলধন বাবদ মোট প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ হবে চার লক্ষ টাকা। নিচে খাতওয়ারি মূলধন ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলো

স্থায়ী মূলধন

জমি (১৪০০ স্কয়ার ফুট)	৫০,০০০.০০
কারখানা ঘর (১৫ × ২০)	১,০০,০০০.০০
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১,০০,০০০.০০
আনুষঙ্গিক খরচ	৩০,০০০.০০
মোট =	২,৮০,০০০.০০

চলতি পুঁজি

স্থানীয় কাঁচামাল (১ মাসের)	৪০,০০০.০০
মজুরি ও বেতন (১ মাসের)	৫০,০০০.০০
প্যাকিং দ্রব্যাদি	১০,০০০.০০
অন্যান্য ক্যাশ খরচাদি	২০,০০০.০০
মোট =	১,২০,০০০.০০

মোট প্রকল্প ব্যয়

স্থায়ী মূলধন	২,৮০,০০০.০০
চলতি মূলধন	১,২০,০০০.০০
মোট =	৪,০০,০০০.০০

প্রকল্প অর্থ সংস্থান	
নিজস্ব তহবিল	১,২০,০০০.০০
বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ঋণ	৬০,০০০.০০
ব্যাংক ঋণ	২,২০,০০০.০০
মোট =	৪,০০,০০০.০০

ব্যাংক ঋণ (Bank Credit)

ব্যাংক মূলত ঋণের ব্যবসায়ী। তাই ব্যাংকের ঋণদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় কার্যক্রমে ব্যাংক ঋণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের অর্থসংস্থান করে থাকেন। ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সংগৃহীত আমানত থেকে যে টাকা অর্থসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন মেয়াদের জন্য ধার হিসেবে প্রদান করে তাকে ব্যাংক ঋণ বলে।

এর মতে, ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদি ঋণই হলো ব্যাংক ঋণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, ধারের শর্ত সাপেক্ষে ব্যাংক প্রদত্ত নগদ অর্থ বা সেবা প্রদানকে ব্যাংক ঋণ বলে।

ব্যাংক প্রদত্ত প্রধান প্রধান ঋণ (Main advances of Bank Loan): বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন প্রকার ঋণ সৃষ্টি করে থাকে। ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের মধ্যে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় ঋণ হচ্ছে তিনটি। যেমন-১। ধার বা ঋণ, ২। নগদ ঋণ, ৩। জমাতিরিক্ত ঋণ।

ক। ধার বা ঋণ (Loan or Credit): ব্যাংক সুনির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে ঋণ প্রদান করে তাকে ধার বা ঋণ বলে। সাধারণত জামানত বা সম্পত্তির বিপক্ষে এ ধরনের ঋণ প্রদান করা হয়।

খ। নগদ ঋণ (Cash Credit): সুনির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি বিশেষ ব্যবসার উদ্দেশ্যে চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক মক্কেলকে যে ঋণ দেয় তাকে নগদ ঋণ বলে।

গ। জমাতিরিক্ত ঋণ (Bank orver draft): ব্যাংক তার কোনো মক্কেলকে চলতি হিসাবে মক্কেলের জমার অতিরিক্ত যে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয় তাকে অতিরিক্ত ঋণ বলে। ব্যাংক খুব পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ দিয়ে থাকে।

ব্যাংক ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া (Proces of Bank Loan): ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে ব্যাংক ঋণ। একজন ব্যবসা উদ্যোক্তা দেশের বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় মূলধনের চাহিদা পূরণ করতে পারে। সারা দেশেই কোনো না কোনো ব্যাংকের শাখা রয়েছে। প্রতিটি ব্যাংকের নিজস্ব ঋণদান পদ্ধতি রয়েছে। যেমন-মঞ্জুরীকৃত ঋণের নিরাপত্তা, সততা ও সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা, জামানতের মান, জামানতের বিক্রয়যোগ্যতা। ব্যবসায়িক দক্ষতা, ঋণের পরিমাণ প্রভৃতি। ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তা স্থানীয় ব্যাংক শাখা থেকে শাখা ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করে ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া জেনে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে।

ব্যাংক ঋণ গ্রহণের সময় একজন উদ্যোক্তাকে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হয় তা নিম্নরূপ:

১। ব্যাংক নির্বাচন, ২। প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ, ৩। জামানত প্রদান, ৪। ঋণের মেয়াদ, ৫। সুদের হার, ৬। ঋণের ব্যয়, ৭। ঋণ নীতি ইত্যাদি।

ব্যাংক যে কোনো ঋণ প্রদান করার পূর্বে ব্যবসা প্রকল্পের যথোপযুক্ততা টেকনিক্যাল, আর্থিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক প্রযুক্তির দিক থেকে সম্ভাব্যতা এবং উদ্যোক্তার ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনা ক্ষমতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য উদ্যোক্তা ও প্রকল্পসংক্রান্ত অনেক তথ্য প্রয়োজন। একজন উদ্যোক্তা যাতে ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-সরবরাহ করে ঋণের আবেদন করতে পারে সে জন্য ব্যাংকের কাছে নির্দিষ্ট ছকের আবেদন ফরম পাওয়া যায়। একজন ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তা সেই আবেদন ফরম সংগ্রহ করে সঠিকভাবে পূরণ করে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে।

ঋণের যথার্থ ব্যবহার (কেস/ইতিবৃত্ত)

বাংলাদেশের আর দশটি গ্রামের মতই একটি গ্রাম হচ্ছে মেলুদিয়া। গ্রামের জনসাধারণের আয়ের একমাত্র উৎস হচ্ছে জমি। জমিগুলো একফসলি, তাও আবার বন্যাকবলিত। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে গ্রামে সচ্ছল পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ১০%। গ্রামের ৯০% জনসাধারণের একমাত্র সম্বল হচ্ছে বসতভিটা। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাই বেশির ভাগ গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীকে শ্রম বিক্রি করতে হয়। তাছাড়া কাঁচামাল বিক্রি, ফেরি করা, দোকান করা, চিড়ামুড়ির ব্যবসা ইত্যাদি হচ্ছে এ গ্রামের মুষ্টিমেয় লোকের পেশা। এদের বার্ষিক গড় আয় ১০/১২ হাজার টাকা। গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু এখানে শিক্ষিতের হার মাত্র ৫%। নানা রকম কুসংস্কার মহিলাদের করে রেখেছে পশ্চাৎপদ। তালাক, বহুবিবাহ যদিও এ গ্রামে তেমন জটিল আকারে নেই, কিন্তু যৌতুক এখানে অত্যন্ত প্রকট। মহিলাদের আয়ের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার হার যেহেতু কম, সেহেতু সামাজিক সচেতনতাও অত্যন্ত কম। ১৯৮২ সালে সিঙ্গাইর উপজেলায় একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়।

প্রথমেই গ্রামের ৮৫% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য ৪ মাস ধরে উদ্বুদ্ধ করার কাজ চলতে থাকে। এ সংস্থার কর্মীদের কর্মতৎপরতায় এ গ্রামের বেশ কিছু মহিলা উৎসাহিত হয় ও গ্রামে ৪/৫ টি মহিলা সংগঠন গঠিত হয়।

দক্ষিণ পাড়ার মহিলা উন্নয়ন সংগঠনের ২৬ সদস্যের একজন জামিলা। অত্যন্ত পরিশ্রমী, উদ্যমী ও সংগঠনের অধিকারী। এই সদস্যের পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৫। স্বামীর তেমন কিছু রোজগার নেই। সারা বছর মজুরি খেটে যা কিছু আয় হয় তাই কোনো রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন চলছিল তাদের। সংসারের কাজে সহযোগিতা করার জন্য জামিলাও পরের বাড়িতে কাজ করতেন। কিন্তু তারপরও এমন দিন গেছে যে, সারাদিনে শুধু একবেলা খাবার জুটেছে।

একবার জামিলার স্বামী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। জামিলা তখন চারদিকে অন্ধকার দেখতে পান। এই অবস্থায় সাহায্য সংস্থাটির মাঠকর্মীরা তাকে সংগঠন করার পরামর্শ দিলে জামিলা প্রথমে অসম্মতি জানান। কারণ তিনি ভাবেন তার এমনি দুঃখের সংসার, সারাদিন কাজ করে আহার জোটে না। সেখানে সংগঠন করার তার সময় কোথায়? কিন্তু মাঠ সংগঠনের সভানেত্রী পরপর বেশ কয়েকবার জামিলাসহ অন্যদের নিয়ে সভার আয়োজন করেন ও তাদের সংগঠন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। জামিলা স্বামীর অনুমতি নিয়ে সংগঠনে যোগ দেন। কারণ তাদের সংসারে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মতামত সাপেক্ষে।

সংগঠন যখন মোটামুটি এগিয়ে যাচ্ছে ও সদস্যদের ঋণ দেওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তখন জামিলাও অন্যদের মতো ঋণ নেওয়ার কথা চিন্তা করেন। যেহেতু টাকার পরিমাণ অল্প, সেহেতু অল্প পুঁজিতে কীভাবে আয় করা সম্ভব তা নিয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করেন। সংগঠন থেকে ঋণ নিয়ে একটি খাসি ক্রয় করেন। সেই খাসি এক বছর পালার পর লাভ হয় ৬৫০ টাকা (সংগঠন ঋণ সুদসহ ফেরত দিয়ে)। পরবর্তী বছর খাসির লাভের টাকা ও সংগঠন থেকে পুনরায় ৬০০ টাকা ঋণ নিয়ে ও জামিলার স্বামীর কিছু পুঁজি একত্রিত করে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নেন। ৬ মাস পর কোরবানি ঈদের সময় বিক্রি করে যা আসে তা থেকে সংগঠনের টাকা, খাসির লাভের টাকা, জামিলার স্বামীর টাকা এবং গরুর জন্য খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন সময়ে যা ক্রয় করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে জামিলার লাভ হয় ২ হাজার ৪৮০ টাকা। এই লাভ দিয়ে পরবর্তী বছর কোনো ঋণ না নিয়েই জামিলা স্বামীর সহযোগিতায় গরু-খাসি মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নেন। পূর্বের খাসির লাভ এবং স্বামীর পুঁজিতে কেনা হয় দুটো খাসি। জামিলা এবং তার স্বামী দুজনের যেহেতু দৃঢ় সংকল্পটা ছিল নিজেদের অবস্থার উন্নতি করা, সেহেতু ভীষণ প্রয়োজনেও তাদের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত টাকা কিছুতেই খরচ করতেন না। তবে ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু কেনা-কাটা করতেন। এভাবে গরু ও খাসি থেকে তাদের পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ হাজার টাকা।

মেদুলিয়া গ্রামের মাটি আখ চাষের জন্য খুবই উপযোগী বিধায় জামিলা ও তার স্বামীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা কিছু পরিমাণ জমি বর্গা নিয়ে আখ চাষ করার। তাছাড়া ১ বছরে একই জমিতে পর পর আখ ও সরিষা দুটো অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করা যায়। তাছাড়া আখ মাড়াই করে গুড় তৈরি একটি লাভজনক ব্যবসা। এ উদ্দেশ্যে

জামিলা সংগঠন থেকে ৪ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। নিজের সঞ্চিতে পুঁজি ও ঋণ মিলিয়ে ৪০ শতক জমি ১০ হাজার টাকায় ইজারা নেন। ১ বছরে জমিতে চাষ হয় আখ ও সরিষা। জামিলা সব সময় স্বামীকে কৃষিকাজে সহায়তা করেন। খরচ বাদ দিয়ে এক বছরে তাদের লাভ হয় ১০ হাজার টাকা। আল্লাহর কাছে এ জন্য শুকরিয়া জানান এবং সংসারে সুখের মুখ দেখতে থাকেন জামিলা। শুধু টাকা আয় করাই জামিলার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বর্তমানে তার দুই ছেলেকে স্কুলে পড়াচ্ছেন। এই ফাঁকে থাকার ঘরের ছাউনি ও পাশের বেড়াগুলো মজবুত করে তৈরি করে নিয়েছেন। গরু পালন যেহেতু তাদের একটি লাভজনক ব্যবসা হিসাবে দাঁড়িয়েছে তাই পাকের ঘরের পাশাপাশি স্থায়ীভাবে একটি গোয়াল ঘরও তৈরি করেছেন জামিলা তার স্বামীর সহযোগিতায়।

মেয়েকে বিয়ে দেন দেখেও। মেয়ের বিয়েতে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়। তবে জামিলা ও তার স্বামী বেহিসাবি ছিলেন না। তার প্রামাণ হচ্ছে এতগুলো টাকা হাতে পেয়েও তারা অপচয় করেননি। হাতে কিছু পুঁজি ঠিকই রেখে দিয়েছিলেন।

এবার জামিলা নিজের মূলধন ১২ হাজার টাকা এবং সংগঠনের ঋণ ৩ হাজার টাকা, মোট ১৫ হাজার টাকা খাটিয়েছেন-আখ চাষের জমিতে। এবারে জমির পরিমাণ হলো ২ পাখি। জামিলার বক্তব্য আল্লাহ যদি না মারেন অর্থাৎ বন্যা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটে তবে প্রতি পাখিতে ১০ হাজার টাকা লাভ হবে। আসলে উদ্যম ও প্রচেষ্টার সাথে সাথে দলীয় সুযোগ-সুবিধা মানুষকে উন্নতির দিকে ধাবিত করে।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিবেচ্য বিষয়/সাবধানতা/নীতিমালা

Factors to be considered for granting loan

যদিও ঋণ মঞ্জুর করা ব্যাংকের অন্যতম কাজ, তবে এ ঋণের অর্থ যাতে গ্রহীতার কাছ থেকে যথাসময়ে ফেরত পাওয়া যায় তার জন্য ঋণ প্রদানের সময় ব্যাংক যে সকল বিবেচ্য বিষয় অনুসরণ করে তা নিম্নরূপ:

১. মঞ্জুরীকৃত ঋণের নিরাপত্তা: মঞ্জুরীকৃত ঋণের নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে উপযুক্ত জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করতে হবে।

২. সততা ও সুনাম: ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার সততা ও ব্যবসায়িক সুনাম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। কেননা ঋণগ্রহীতা যদি প্রতারক হয় তাহলে উক্ত গ্রহীতার কাছ থেকে যথাসময়ে ঋণ আদায় করা সম্ভব নয়। এ কারণে ঋণগ্রহীতার সততা ও সুনাম ঋণ দানের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

৩. আর্থিক সচ্ছলতা: ঋণগ্রহীতা আর্থিক দিক হতে সচ্ছল কিনা, ঋণ পরিশোধের সময় তার পর্যাপ্ত সম্পদ আছে কিনা সে সম্পর্কে ঋণ মঞ্জুরের সময় বিবেচনা করা উচিত।

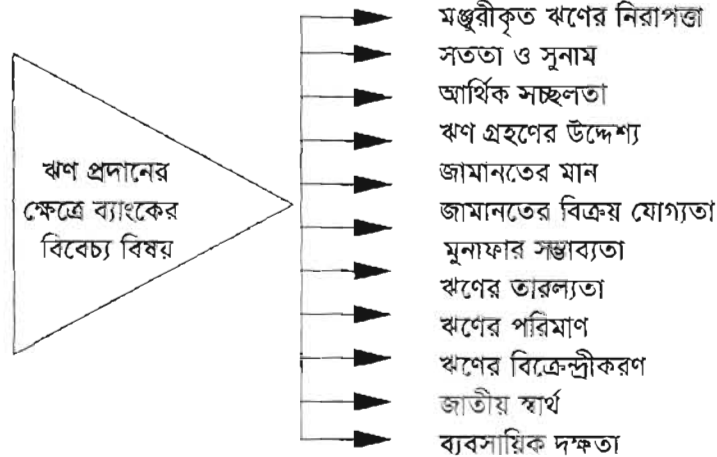
৪. ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য: ঋণগ্রহীতা কি উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে চায় সে সম্পর্কে ব্যাংককে অবহিত হতে হয়। কারণ মানুষ অর্জন করা ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও ইহা একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

৫. জামানতের মান: জামানতকৃত দ্রব্যের মান নির্ণয় করা ও ঋণ প্রদানের সময় একটি নীতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। জামানতকৃত দ্রব্যসামগ্রী যদি নিকট হস্তান্তরের অযোগ্য হয় তাহলে উক্ত জামানতের মাধ্যমে ব্যাংক প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করতে পারে না।

৬. জামানতের বিক্রয়যোগ্যতা: জামানতের বিক্রয়যোগ্যতাও ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচিত হয়ে থাকে।

৭. মুনাফার সম্ভাব্যতা: মঞ্জুরীকৃত ঋণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন হবে কিনা তা সম্পর্কে ঋণ বিবেচনা করতে হবে। কারণ ব্যাংক যে আমানতী অর্থ মঞ্জুর করে উক্ত আমানতী আমানতকারীদেরকে সুদ দিয়ে থাকে।

৮. ঋণের তারল্যতা: সম্পদকে নগদ অর্থে রূপান্তর করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে। মঞ্জুরীকৃত স্বল্প সময়ে বা সংক্ষিপ্ত নোটিশে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অর্থ আদায় করা যায় সে বিষয়টি ঋণ ব্যাংককে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।



৯. ঋণের পরিমাণ: মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ও ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অন্যতম নীতি হিসাবে থাকে। একজন ঋণগ্রহীতাকে অধিক পরিমাণে ঋণ না দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া অধিকতর নিরাপদ ও সুবিধাজনক।

১০. ঋণের বিকেন্দ্রীকরণ: মঞ্জুরীকৃত ঋণ যাতে কেবল কতিপয় ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ হয় ব্যাংককে তা বিবেচনা করতে হবে।

১১. জাতীয় স্বার্থ: ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে অবশ্যই জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে উৎপাদনমুখী খাতসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাধান্য দিতে হবে।

১২. ব্যবসায়িক দক্ষতা: ঋণগ্রহীতা একজন ব্যবসায়ী হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় তার দক্ষতা সম্পর্কে ব্যাংককে অবশ্যই যাচাই করে দেখতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, ঋণ মঞ্জুরের সময় ব্যাংককে নানাবিধ বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে।

ব্যাংক ঋণ গ্রহণের সময় উদ্যোক্তার বিবেচ্য বিষয় (Factors to be considered by entrepreneur for advances)

একজন উদ্যোক্তার শুধু ঋণ গ্রহণের বিষয়টি মাথায় রাখলে চলবে না, উক্ত ঋণ পরিশোধের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। তাই ঋণ গ্রহণের পূর্বে ঋণের প্রকৃতি, ঋণের পরিমাণ, ঋণ পরিশোধের ধরন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি উদ্যোক্তার মনোযোগী হতে হবে। নিম্নে ঋণ গ্রহণের সময় উদ্যোক্তার যে সকল বিষয় বিবেচনা করা উচিত তা আলোচনা করা হলো :

১। ব্যাংক নির্বাচন (Selection of Bank): একজন উদ্যোক্তার প্রাথমিক কাজ হলো ঋণের জন্য ব্যাংক নির্বাচন। ব্যাংক নির্বাচনে উদ্যোক্তাকে বা আর্থিক ব্যবস্থাপককে যে সকল বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় তা হলো ব্যাংকের অবস্থান, প্রকৃতি, সুনাম, সেবাদান, নীতি ও ব্যয়, সততা, ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ক ইত্যাদি।

২। প্রস্তাবিত পরিমাণ (Amount of Loan): একজন উদ্যোক্তা ব্যাংক হতে কী পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই পর্যায়ে কোন ব্যাংক হতে কি পরিমাণ অর্থ, কত হার সুদে গ্রহণ করা যৌক্তিক হবে তা যাচাই করা উচিত।

৩। জামানত (Security): ঋণের বিপরীতে উদ্যোক্তাকে কী পরিমাণ জামানত প্রদান করতে হবে তা দেখতে হবে। যদি জামানতের পরিমাণ বেশি হয় তবে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের জন্য অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি বিবেচনায় আনতে পারে।

৪। মেয়াদ (Period): উদ্যোক্তা কর্তৃক গৃহীত ঋণ কোন মেয়াদের ভিত্তিতে নেওয়া হবে তা বিবেচনায় আনতে হবে। অর্থাৎ ঋণটি দীর্ঘ, মধ্যম না স্বল্পমেয়াদের ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে তা দেখতে হবে।

৫। সুদের হার (Rate of Interest): ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সুদের হার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণ করলে সুদের হার কম হয় সে পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করবে। তাছাড়া সুদের হার কম হলে ঋণের পরিমাণ বেশি হতে পারে এবং বেশি হলে ঋণের পরিমাণ কম হতে পারে।

৬। ঋণের ব্যয় (Cost of loan): ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করলে সুদ প্রদান করতে হয়। কিন্তু সুদ প্রদান ছাড়াও আরও কিছু আনুষঙ্গিক ব্যয় রয়েছে। যেগুলো ঋণের সাথে সংযুক্ত। এ সকল ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে ছোট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সামগ্রিক ঋণের ব্যয় বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই ঋণ গ্রহণের পূর্বে ঋণসংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যয়কে মূল্যায়ন করা উচিত।

৭। ঋণ নীতি (Loan Policy): উদ্যোক্তা ব্যবসা কার্যক্রম শুরু করলে তাকে ধারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজও সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ঋণ দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে কোন ধরনের নীতি অনুসরণ করবে তার উপর ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। উদ্যোক্তা যদি আগ্রাসী ঋণ নীতি অনুসরণ করে তবে স্বল্পমেয়াদি ঋণের মাধ্যমে স্থায়ী মূলধনের সংস্থান করতে পারে। আবার যদি রক্ষণশীল নীতি

অবলম্বন করে তবে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দ্বারা চলতি, পুঁজি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দ্বারা স্থায়ী পুঁজির অর্থসংস্থান করতে পারে।

একজন উদ্যোক্তাকে ঋণ গ্রহণের পাশাপাশি তার সুদ এবং পরিশোধিত কিস্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ের পরিশোধে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাই উদ্যোক্তাকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়সমূহ ভালোভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। তা না হলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে।

ব্যাংক ঋণ গ্রহণের নমুনা আবেদনপত্র

Proporma Application form of Bank Loan

এ.বি.সি ব্যাংক লি:

..... শাখা

ঋণসীমা মূল্যায়ন ফরম/পত্র

(ঋণ আবেদনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হবে)

অংশ 'ক'

- ১। আবেদনকারীর/প্রতিষ্ঠানের নাম :
- ২। ঠিকানা: (ক) বর্তমান: ১। হিসাব নম্বর:
(খ) স্থায়ী: ২। হিসাব লেখার তারিখ:
(গ) ফ্যাক্টরি/শোরুম: ৩। টেলিফোন নম্বর:
(ক) অফিস:
(খ) বাসা:
(গ) ফ্যাক্টরি/শোরুম:
- ৩। প্রতিষ্ঠানের ধরন: ব্যক্তিগত/ব্যক্তি মালিকানাধীন/অংশীদারি/প্রাইভেট লি. কোং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (টিক) চিহ্ন দিন)
- ৪। ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মালিক/অংশীদার/পরিচিতি/বিবরণ:

নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ঠিকানা	বয়স	পদের নাম	ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য
(ক)					
(খ)					
(গ)					
(ঘ)					
(ঙ)					
(চ)					
(ছ)					

৮। ব্যক্তি/ব্যক্তি মালিকানাধীন/অংশীদারি প্রতিষ্ঠান/লিমিটেড কোম্পানির নামে সকল সম্পত্তির বিবরণ:

সম্পদের ধরন	পরিমাণ/আয়তন	মূল্য	অবস্থান
(ক) জমি			
(খ) দালান/ঘর			
(গ) যন্ত্রপাতি			
(ঘ) মজুদ মালামাল/পরিবহন যান			
(ঙ) নগদ			
(চ) অন্যান্য			
মোট			

(লক্ষ টাকা
অংকে)

সাল	উৎপাদন/ক্রয়	বিক্রয়	কার্যাদেশ প্রাপ্তি	কার্যাদেশ সম্পাদন	আমদানি	রপ্তানি	অন্যান্য আয়	লাভ/ক্ষতি
(ক)								
(খ)								
(গ)								

(লক্ষ টাকা
অংকে)

শাখার নাম	ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যবসায়ের ধরন	ঋণের ধরন	লিমিট	মেয়াদ	বর্তমান স্থিতি	সহজামানতের মূল্য

১১। ঋণ আবেদনকারী ও সহযোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-এর নামে অন্যান্য ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের বিবরণ (মঞ্জুরীপত্রের কপি ও গত এক বছরের ঋণ হিসাবের বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে):

(লক্ষ টাকা
অংকে)

শাখার নাম	ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের নাম	ব্যবসায়ের ধরন	ঋণের ধরন	লিমিট	মেয়াদ	বর্তমান স্থিতি	সহজামানতের মূল্য

১২। ঋণ আবেদনকারী ও সহযোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-এর নামে জনতা ব্যাংক বা অন্য কোনো ব্যাংকের সহিত জমা হিসাবের বিবরণ (লক্ষ টাকা অংকে)

ব্যাংক ও শাখার নাম	ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের নাম	হিসাবের ধরন	হিসাব নম্বর	বর্তমান স্থিতি

১৩। প্রস্তাবিত/আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ:

১৪। ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য:

১৫। আবেদনকৃত ঋণের বিপরীতে প্রাথমিক জামানতের বিবরণ:

- (ক) প্লেজ/হাইপোথিকেশন প্রদানের নিমিত্তে বর্তমান মজুদ মালের মূল্য টাকায়:
- (খ) কার্যাদেশের পরিমাণ টা:(কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র ও পেন্ডিং বিলের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করুন)।
- (গ) ক্রয়তব্যা/নির্মিতব্য সম্পদের (পরিবহন যান, অন্যান্য সামগ্রী, জমি ইত্যাদি) মূল্য টা:(কোটেসন বায়নাপত্র) সংযুক্ত করুন)।
- (ঘ) রপ্তানির নিমিত্তে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণপত্র/ফার্ম কন্ট্রাক্ট-এর মোট মূল্য টা:(এল/সি ও কন্ট্রাক্টের কপি সংযুক্ত করুন)।
- (ঙ) আমদানিকৃত/আমদানিতব্য মালের অবতরণ মূল্য টা:(ইভেন্ট/ইনভয়েন্স/বিল অব লেডিং-এর কপি সংযুক্ত করুন)।
- (চ) অন্যান্য।

১৬। আবেদনকৃত ঋণের বিপরীতে প্রস্তাবিত জামানত/সহজামানতের বিবরণ:

- (ক) সম্পত্তির মালিকের নাম: গ্রামের/মহল্লোর নাম:
দাগ নম্বর: খতিয়ান নম্বর: মৌজা:
থানা: মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নম্বর: জিলা:
জমির পরিমাণ: শতাংশ/কাঠা, নির্মাণাদির বিবরণ ও আয়তন.....
প্রকৌশলীর মতে মোট মূল্য টা:(মূল্যায়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে)।

- (খ) মেয়াদি আমানত/ডিপিএস/সঞ্চয়পত্র: রসিদ নম্বর/ডিপিএস নম্বর
 বেনিফিসিয়ারীর/ডিপিএসধারীর নাম:
 মেয়াদ পূর্তির তারিখ:
 মেয়াদি আমানত /ডিপিএস হিসাবে বর্তমান স্থিতি টা:
 (গ) শেয়ার: শেয়ারের সংখ্যা:
 কোম্পানির নাম:
 অভিহিত মূল্য: বাজার মূল্য:
 ক্রেতার নাম:
 (ঘ) অন্যান্য

আমি/আমরা শপথ করে বলছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণসমূহ সত্য। আমি/আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, আমার/আমাদের নামে জনতা ব্যাংক হতে ঋণ মঞ্জুর করা হলে আমি/আমরা জনতা ব্যাংকের লিখিত সম্মতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যাংক হতে কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণ করব না।

সাক্ষী:

- ১। স্বাক্ষর: তারিখ: আবেদনকারীর স্বাক্ষর (ঋণ গ্রহণকারী)
 নাম: পূর্ণ নাম:
 ঠিকানা: ঠিকানা:
 ২। স্বাক্ষর: তারিখ:
 নাম: পূর্ণ নাম:
 ঠিকানা: ঠিকানা:

ক্ষুদ্রশিল্প ঋণের জন্য আবেদনপত্র

(সংক্ষিপ্তসার)

‘ক’ বিভাগ

প্রকল্প উদ্যোক্তা, মালিকানা স্বত্ব এবং ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত তথ্যাবলি

- ১। প্রকল্পের বিবরণ:

(ক) প্রকল্পের নাম:

(খ) প্রকল্পের অবস্থান:

- কারখানা

- অফিস

(গ) শিল্পখাতের নাম:

- ২। প্রকল্পের মালিকানা স্বত্ব:

ব্যক্তিমালিকানা/অংশীদারি কারবার/প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

- ৩। উদ্যোক্তাগণের বিবরণ: নাম, ঠিকানা, শেয়ারের ব্যবস্থাপনার অংশ, দায়িত্ব।
- ৪। (ক) উদ্যোক্তা কিংবা উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেউ অত্র প্রকল্প বা অন্য কোনো প্রকল্পের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করে থাকলে উক্ত ফলাফলের বিবরণসহ আবেদনের ফলাফল ব্যক্ত করুন।
(খ) উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেউ সমাজসেবামূলক বা অন্য কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন কিনা, থাকলে সেখানে তাদের অবস্থান/পদ মর্যাদা উল্লেখ করুন।
- ৫। ব্যবসায়িক অথবা বক্তৃগত পরিচিতি (সম্মানিত ব্যক্তির অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান) যাদের সাথে আবেদনকারীর সাম্প্রতিক লেনদেন বা সম্পর্ক আছে।
- | | | | |
|------|---------|------------|----------------|
| নাম, | ঠিকানা, | টেলিফোন নং | ব্যবসা/সামাজিক |
| | | যদি থাকে | অবস্থান |
- ৬। (ক) উদ্যোক্তাদের দায় এবং সম্পদের বিবরণী সংযুক্ত ফরম-১ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।
(খ) আপনার ব্যাংক ম্যানেজারের বরাবর লিখিত পত্র ফরম-২ মোতাবেক সংযুক্ত করতে হবে।
(গ) প্রত্যেক উদ্যোক্তার জীবন বৃত্তান্ত/শিক্ষাগত/ব্যবসায়িক ও কারিগরি জ্ঞান যোগ্যতা ফরম-৩ অনুযায়ী সংযুক্ত করতে হবে।
(ঘ) প্রত্যেক পরিচালক/উদ্যোক্তাদের সহসহ ঘোষণাপত্রের বিবরণী ফরম-৪ অনুযায়ী সংযুক্ত করতে হবে।

প্রকল্পের বিবরণ:

৭। প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্য:

পণ্যসামগ্রী	পূর্ণ উৎপাদন	উৎপাদন ক্ষমতা	প্রতিটি
বিক্রয় মূল্য			
বয় ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা পণ্যের মূল্য			
ক্ষমতা (পরিমাণ) ————— ১ম বছর/২য় বছর/৩য় বছর			
১ম বছর/২য় বছর/৩য় বছর			

৮। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান:

(ক) প্রকল্পের জন্য কী পরিমাণ জমির প্রয়োজন:

(খ) ইতোমধ্যে কেনা হয়েছে কিনা? হ্যাঁ/না

(গ) জমির বিবরণ (যদি ইতোমধ্যে বাছাই/কেনা হয়) তবে-

পরিমাণ গুট/হোল্ডিং নং

খতিয়ান নম্বর

মৌজা

উপজেলা

জেলা

জমির মূল্য :

নিষ্কটক জমি কিনা? হ্যাঁ/না-

যদি জমি বায়না করা হয়ে থাকে তবে বায়নাপত্র এবং ক্রয় বা ইজারা নেওয়া হলে সাফ কবলা। ইজারা দলিল সংযুক্ত করুন।

(ঘ) ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন কিনা?

যদি না হয়ে থাকে তবে প্রকল্প উপযোগী করে তুলতে কী পরিমাণ খরচের প্রয়োজন এবং কত সময় লাগতে পারে;

৯। দালান/ঘর এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্ম:

প্রাক্কলিত ভূমি ও দালান ঘরের ব্যয়। যেমন: কারখানা ঘর, গুদাম ঘর এবং অন্যান্য যদি প্রয়োজন হয়। তবে নিম্নলিখিত ছকে সংযুক্ত সড়ক, সীমানা দেয়াল, ট্যাংক, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জেটি ইত্যাদিসহ পেশ করুন:

দালান ঘর এবং অন্যান্য	নির্মাণকাজের	ভূমির	দর/প্রতি প্রাক্কলিত	
নির্মাণ কর্মের বিবরণ	বিবরণ	পরিমাণ	বর্গফুট	ব্যয়

অনুগ্রহ করে খসড়া নীল নকশা এবং অবস্থান নকশা (সাইট প্ল্যান্ট) আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করুন।

যন্ত্রপাতি: সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ক্যাটালগ ও ক্ষেচ সংযুক্ত করুন।

যন্ত্রপাতির বিবরণ	প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা	কত ইউনিট প্রয়োজন	মূল্য		
			সিএন্ডএফ মূল্য	কর এবং অন্যান্য খরচ	মোট

১০। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি:

যন্ত্রপাতির বিবরণ	প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা	কতটি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন	মোট খরচ
-------------------	------------------------	------------------------------	---------

অনুগ্রহ করে স্থানীয় এবং আমদানিতব্য যন্ত্রপাতির তিনজন সরবরাহকারীর কাছ থেকে প্রতিযোগিতামূলক তিন কপি দরপত্র এবং সাথে ক্যাটালগ ও বিশদ বিবরণীপত্র সংযুক্ত করুন।

১১। যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং সংযোজন:

যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং সংযোজনের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, কিংবা গ্রহণ করা হবে এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন নকশা ও প্রাক্কলিত খরচের বিশদ বিবরণ দিন।

১২। উপযোগসমূহ:

প্রকল্পের প্রয়োজনীয় নিম্নবর্ণিত তথ্যাদির বিবরণ দিন:

(ক) বিদ্যুৎ:

(খ) জ্বালানি:

(গ) লুব্রিকেটিং তেল:

(ঘ) গ্যাস:

(ঙ) পানি:

(চ) যোগাযোগ ব্যবস্থা:

১৩। কাঁচামাল:

শতকরা ১০০ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতায় বছরের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত ছকে বর্ণনা করুন (প্রতিদিন প্রতি শিফট ৮ ঘণ্টা হিসাবে)।

কাঁচামালের ১০০% ক্ষমতায় সিএন্ডএফ ডিউটি অন্যান্য মোট
বিশদ বিবরণ প্রয়োজনে পরিমাণ মূল্য এবং বিক্রয়
প্রতি ইউনিট, কর

বিদ্যমান ক্ষমতায়
(যদি থাকে)
প্রস্তাবিত ক্ষমতায়
(খ) স্থানীয়:

কাঁচামালের বিবরণ	উৎস	১০০% ক্ষমতায় প্রয়োজনে পরিমাণ	মোট মূল্য ফ্যাক্টরি পর্যন্ত পৌছানো খরচ
বিদ্যমান ক্ষমতায়			
প্রস্তাবিত ক্ষমতায়			

১৪। জনশক্তি:

(ক) প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা:

পদের নাম	সংখ্যা	মাসিক বেতন	প্রতি মাসে দেয় অন্যান্য সুবিধাদি	মোট বছরের ব্যয়
----------	--------	------------	--------------------------------------	-----------------

(খ) বিক্রয় ও বিতরণ:

পদের নাম		সংখ্যা	মাসিক বেতন		প্রতি মাসে দেয় সুবিধাদি		মোট বছরের ব্যয়		
বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত

(গ) শ্রমিক ও কারিগরি:

মোট সংখ্যা		মাসিক মঞ্জুরির হার		মাসিক অন্যান্য সুবিধাদি		মোট বছর	
বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত

(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উৎপাদন স্তরে তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসনিক এবং কারিগরি বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত
পরিচালক/কর্মকর্তাদের নাম, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসহ উল্লেখ করুন:

‘গ’ বিভাগ

প্রকল্প ব্যয় ও অর্থ সংকুলানের উৎস

১৫। নিম্নে বর্ণিত ছকে প্রকল্পের খরচের বিস্তারিত বিবরণ দিন:

স্থানীয়	বৈদেশিক	(সহস্র টাকা হিসাবে)	মোট
(ক) ভূমি			
(খ) ভূমি উন্নয়ন			
(গ) দালান			
(ঘ) অন্যান্য কর্ম (সিভিল ওয়ার্ক)			
(ঙ) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি এবং কলকবজা			
(চ) স্থানীয় যন্ত্রপাতি এবং কলকবজা			
(ছ) গুচ্ছ কর, বিমা ইত্যাদি			
(জ) অভ্যন্তরীণ ভাড়া			
(ঝ) সংযোজন এবং স্থাপন			
(ঞ) আসবাবপত্র			
(ট) প্রাথমিক এবং প্রারম্ভিক ব্যয় (যেমন আইন বিষয়ক, নিবন্ধন, পরামর্শ ইত্যাদি)			
(ঠ) বিবিধ আনুষঙ্গিক খরচ এবং এই খরচ			
প্রকল্পের স্থায়ী খরচের শতকরা কত ভাগ			
মোট:			
নিট কার্যকরী মূলধন:			
মোট প্রকল্প ব্যয়:			

১৬। অর্থ সংকুলানের উৎস:

প্রকল্প ব্যয় সংকুলানের প্রস্তাবিত উৎস উল্লেখ করুন:

মূলধন	স্থায়ী সম্পদ		কার্যকরী মূলধন		মোট
	স্থানীয়	বৈদেশিক	স্থানীয়	বৈদেশিক	

- (ক) নিজস্ব তহবিল
- (খ) ব্যাংক ঋণ
- (গ) ঋণ ও নিজস্ব তহবিলের শতকরা হার
- ঋণের ব্যবহার
- মোট:

১৭। প্রকল্পের লাভ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব প্রাক্কলন এবং সেটি কোন ভিত্তিতে করা হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত ছকে লিপিবদ্ধ করুন:

.....			
উৎপাদন ক্ষমতার সদ্যবহার	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর

(ক) বিক্রয় রাজস্ব :

(খ) বিক্রিত পণ্যেৎপাদনে খরচ :

(১) কাঁচামাল ক্রয় ও পরিবহন

(২) প্রত্যক্ষ শ্রম

(৩) বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পানি ও গ্যাস

(৪) মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

(৫) খাজনা, কর ও বিমা

(৬) অপচয়

মোট উৎপাদন ব্যয়:

(গ) মোট মুনাফা:

(ঘ) সাধারণ প্রশাসনিক এবং ওভারহেড ব্যয়:

(১) পরিচালকগণের বেতন ও সম্মানী (প্রশাসনিক ও বিক্রয়)

(২) অন্যান্য অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি

(৩) মনিহারি ও ছাপা খরচ

(৪) ডাক, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, বিদ্যুৎ, টেলেক্স ইত্যাদি

(৫) ভ্রমণ ও যাতায়াত

(৬) বিজ্ঞাপন এবং বিক্রয় উন্নয়নসহ বিক্রয় ব্যয়

(৭) অফিস সম্পদের উপর অপচয়

(৮) প্রারম্ভিক ব্যয়ের এমোরটাইজেশন

(৯) নির্মাণকালীন সময়ের সুদের এমোরটাইজেশন

(১০) অন্যান্য খরচাদি

মোট:

(ঙ) আর্থিক ব্যয় (ঋণের উপর সুদ)

(চ) মোট সাধারণ প্রশাসনিক ও আর্থিক ওভারহেড (ঘ+ঙ)

(ছ) করপূর্ব নিট মুনাফা (গ-চ)

(জ) ঋণ পরিশোধ করার নিমিত্ত ষান্মাসিক কিস্তি হিসাবে সুদসহ কখন থেকে এবং কত বছরে পরিশোধ করা হবে তার একটি তফসিল সংযোজন করুন।

‘ঘ’ বিভাগ**বাজারজাতকরণ ও বিক্রয় ব্যবস্থা**

- ১৮। উৎপাদিত পণ্য যে এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হবে তা উল্লেখ করুন:
- ১৯। কে বা কারা প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উৎপাদক ও ভোক্তা তা উল্লেখ করুন:
- ২০। (ক) প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যের /পণ্যসমূহের বিক্রয় ব্যবস্থা উল্লেখ করুন (প্রতিনিধির মাধ্যমে, পাইকারি বিক্রেতার মাধ্যমে, খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে অথবা সরাসরি ভোক্তার কাছে)
(খ) প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় উল্লেখ করুন:
- চাহিদা ও সরবরাহের উল্লেখ করুন।

পণ্যাদি	প্রতিটি পণ্যের মূল্য	প্রস্তাবিত বিক্রয় মূল্য	একই পণ্যের/পণ্যাদির বর্তমান মূল্য
			স্থানীয় প্রস্তুতজাত আমদানিকৃত

- (গ) প্রস্তাবিত ও বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা আছে কিনা।
প্রতিযোগিতা থাকলে তার ধরন বর্ণনা করুন।
- ২১। যদি প্রস্তাবিত ও বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যাদি (আংশিক অথবা সম্পূর্ণ) রপ্তানি বাজারের জন্য হয়ে থাকে তবে তা যে সকল দেশে যে পরিমাণে রপ্তানির প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা উল্লেখ করুন (প্রতি পণ্যের এফবি মূল্যসহ):

‘ঙ’ বিভাগ**অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা**

- ২২। আপনার প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যের অনুকূলে অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা উল্লেখ করুন।
- ২৩। অন্য যে কোনো তথ্য যদি থাকে।
- ২৪। বিদ্যমান প্রকল্পের বিএমআরই এর ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরকালের নির্বাচিত উদ্ভূতপত্র এবং লাভ-লোকসানের হিসাব জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে পরিমাণ এবং মূল্যসহ উৎপাদিত এবং বাজারজাতকরণ পণ্যের তালিকা দাখিল করতে হবে:
- ২৫। উদ্যোক্তাগণের দস্তখত ও বর্তমান ঠিকানা:

নাম

ঠিকানা

দস্তখত

৫.৪ ব্যবসা স্থাপনে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। তাই আমাদের দেশে ব্যবসা বা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা ও শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হলো উদ্যোক্তা শ্রেণির অভাব। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনা একটি জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

যেমন-মূলধন ও কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কাজ অন্যের সাহায্য ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তিকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে অনেক সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। এসব সাহায্য-সহযোগিতা পেলে অনেক তরুণ এ কাজে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হবে। যে দেশে দক্ষ উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বেশি, সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি।

একজন ব্যবসায়ীর সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Assistance for a Business man)

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা একটি কঠিন কাজ। এ কাজে সফলতা অর্জন করার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে সৃজনশীল মনোভাবসম্পন্ন এবং গঠনমূলক চিন্তাভাবনার অধিকারী হতে হবে। উক্ত গুণাবলি থাকার পরও একজন ব্যক্তিকে সফলভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন। যেমন-ব্যবসা নির্বাচন কৌশল, ব্যবসা স্থাপনসংক্রান্ত প্রক্রিয়া, মূলধন সংগ্রহ, পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত। চাকরির বিকল্প পেশা ব্যবসাকে কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এসব সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এসব সাহায্য-সহযোগিতার ফলে বেকার জনসাধারণ ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। যেসব কারণে ব্যবসায়ীর সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- ১। অনুপ্রেরণা সৃষ্টি: সাহায্য-সহযোগিতার ফলে সম্ভাব্য ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসা স্থাপনের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত হন। ফলে তারা ব্যবসা স্থাপনের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসেন।
- ২। বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ: ব্যবসার ক্ষেত্রে যেসব সাহায্য-সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান কাজ করে, সেগুলো বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রেও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিবিধ সংবাদ বা তথ্য প্রচার করে। এসব সংবাদ বা তথ্য ব্যবসায়ীকে প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা করে।
- ৩। সম্পদের সদ্যবহারে সহায়তা: সম্পদের সদ্যবহার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের সংস্থান, প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা ব্যবসায়ীর কাজকে অনেকাংশে সহজ করে তোলে।
- ৪। উদ্যোগ সৃষ্টি: কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তথ্য সরবরাহ পরামর্শ দানের মাধ্যমে সাহায্য-সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
- ৫। বাজার অনুসন্ধান: একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পণ্যের জন্য বাজার অনুসন্ধানের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।
- ৬। প্রশিক্ষণ: ব্যবসা উদ্যোক্তাদেরকে নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

৭। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার উত্তরণের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে।

৮। **ব্যবসায় টিকে থাকা:** ব্যবসা আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ, ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি, পণ্য বাজারজাতকরণের নতুন পন্থা উদ্ভাবন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবসা টিকে থাকার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসার প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য ব্যবসার শুরু থেকে প্রতিটি পদক্ষেপেই সাহায্য-সহযোগিতার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের কার্যাবলি Function of Entrepreneur Development

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো

১। **উদ্দীপনামূলক কার্যাবলি:** উদ্যোগ উন্নয়ন চক্রের প্রথম কর্মসূচি হলো উদ্দীপনামূলক কার্যাবলি। উদ্দীপনামূলক কার্যাবলি উদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে উদ্যোগ সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং যে কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।

২। **সমর্থনমূলক কার্যাবলি:** উদ্যোগ উন্নয়ন চক্রের দ্বিতীয় কর্মসূচি হলো সমর্থনমূলক কার্যাবলি। যে সমস্ত কার্যাবলি উদ্যোক্তাকে তার প্রতিষ্ঠান গঠন এবং দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠান চালাতে সহায়তা করে তাকে সমর্থনমূলক কার্যাবলি বলে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং সহায়ক দ্রব্যাদি সংগ্রহ এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে সমর্থনমূলক কার্যাবলি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩। **সংরক্ষণমূলক কার্যাবলি:** উদ্যোগ উন্নয়ন চক্রের তৃতীয় কর্মসূচি হলো সংরক্ষণমূলক কার্যাবলি। সংরক্ষণমূলক কার্যাবলির মাধ্যমে উদ্যোক্তা তার প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্যোগ উন্নয়ন চক্রের প্রতিটি স্তরই একটি অপরটির সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে উদ্দীপনামূলক কার্যাবলিতে একজন সম্ভাব্য নবীন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ কার্যক্রমে উদ্দীপ্ত করা হয়। সমর্থনমূলক কার্যাবলিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয় এবং সংরক্ষণমূলক কার্যাবলিতে প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগ কার্যক্রম যেন চালু থাকে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ (Sources of Assistance)

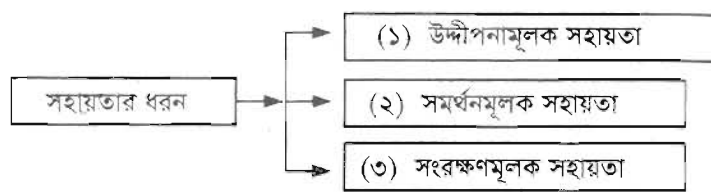
একটি শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেক ধরনের সহায়তার প্রয়োজন। এসব সহায়তা একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কোনো শিল্পোদ্যোক্তাকে যে সাহায্য সহযোগিতা করা হয় তাকে সহায়তার উৎস বলে।

সহায়তার ক্ষেত্রসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: উদ্দীপনামূলক সহায়তা, সমর্থনমূলক সহায়তা, সংরক্ষণমূলক সহায়তা।

সহায়তার ক্ষেত্রসমূহ (Types of Assistance)

যে কোনো দেশের শিল্পায়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ উদ্যোক্তার কার্যকলাপ দেশের শিল্পের উন্নয়নের সহায়ক। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিগত ধরন অনুযায়ী এদেরকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো:



১। উদ্দীপনামূলক সহায়তা (Stimulatory Assistance)

উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে ঐ সকল কর্মতৎপরতাকে বোঝায় যা একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকে শিল্প স্থাপনে অনুপ্রেরণা জোগায়। শিল্প বা ব্যবসা স্থাপন করা একটি সৃজনশীল, গঠনমূলক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। যে কারণে অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে চায় না। অর্থাৎ ঝুঁকি গ্রহণ করতে রাজি হয় না। যদি কোনো ব্যক্তিকে একথাটি ভালোভাবে বোঝানো যায় যে, বেতন বা মজুরিভিত্তিক পেশার চেয়ে অধিক লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা হচ্ছে ব্যবসায়। তাহলে সে ব্যক্তি হয়তো ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত হবে। উদ্দীপনামূলক সহায়তার উপাদানগুলো হলো- (ক) উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা (খ) অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ (গ) বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা (ঘ) শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহায়তার ব্যাপক প্রচার (ঙ) প্রকল্প প্রণয়ন ও নির্বাচনে সাহায্য ও পরামর্শ দান (চ) কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা (ছ) প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান দেওয়া (জ) নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা ফোরাম গঠন ইত্যাদি।

২। সমর্থনমূলক সহায়তা (Supportive Assistance)

শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে অগ্রহী কোনো ব্যক্তিকে তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য সমর্থনমূলক সহায়তা প্রয়োজন হয়। সমর্থনমূলক সহায়তা একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপন, পরিচালনা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং আরও বহুবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করে।

সমর্থনমূলক সহায়তাসমূহ নিম্নরূপ:

- (ক) ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রিকরণ
- (খ) কাঁচামাল সংগ্রহে সহায়তা
- (গ) স্থায়ী ও চলতি মূলধনের সংস্থান
- (ঘ) শিল্পের অবকাঠামোগত সহায়তা
- (ঙ) মেশিনারি নির্বাচন ও সংগ্রহে সাহায্য
- (চ) কাঁচামাল সংগ্রহে সহায়তা
- (ছ) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় পরামর্শ দান
- (জ) কর অবকাশ ও ভর্তুকি প্রদান
- (ঝ) পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য ইত্যাদি।

৩। সংরক্ষণমূলক সহায়তা (Sustaining Assistance)

উদ্যোক্তা কর্তৃক শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরও তাকে উৎপাদন কার্য অব্যাহত গতিতে চালিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে সকল সহায়তার প্রয়োজন হয় সেগুলোকে সংরক্ষণমূলক সহায়তা বলে।

সংরক্ষণমূলক সহায়তার প্রকৃতি নিম্নরূপ:

- (ক) শিল্প ও ব্যবসায়ের আধুনিকীকরণ
- (খ) নতুন কলাকৌশল ব্যবহার
- (গ) ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা
- (ঘ) পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণে সহায়তা
- (ঙ) শিল্প সম্প্রসারণে পরামর্শ দান
- (চ) উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থসংস্থান
- (ছ) ঋণের সুযোগ সৃষ্টি
- (জ) পণ্য বিপণনের নতুন নতুন পন্থা সৃষ্টি ইত্যাদি।

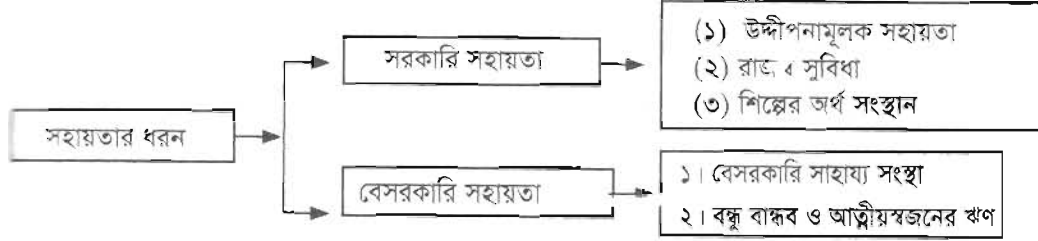
উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

৫.৫ আর্থিক সহায়তা গ্রহণের উৎসসমূহ**সহায়তার উৎসসমূহ (Source of Assistance)**

বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে। যেগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। শিল্পায়নে সহায়তাকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-(১) সরকারি সহায়তাকারী উৎস (২) বেসরকারি সহায়তাকারী উৎস।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে সহায়তার উৎসমূহ দেখানো হলো:



৫.৬ ব্যবসায় সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যাবলি

১। সরকারি সহায়তা (Government Assistance): ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প স্থাপনে সরকারিভাবে যে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়ে থাকে তাকে সরকারি সাহায্য-সহায়তা বলে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকারি উৎসসমূহ শিল্পোদ্যোগ সহায়তার মূল উৎস হিসেবে পরিগণিত। কারণ দ্রুত শিল্পায়ন সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অন্যতম ক্ষেত্র। সরকার দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যেমন- শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি, রাজস্ব নীতি, রপ্তানি নীতি, বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধাদানের নীতি ইত্যাদি। নিম্নে সরকারি সহায়তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

(ক) শিল্পনীতি: সরকার দ্রুত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার জন্য শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষণার মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার দিক নির্দেশ করে থাকে। শিল্পায়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময় সময় শিল্পনীতির সংশোধন ও পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা হয়। একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(খ) রাজস্ব সুবিধা: ব্যবসায়-বাণিজ্য সহায়তার জন্য সরকার বিভিন্ন রাজস্ব সুবিধা দিয়ে থাকে। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(i) কর অবকাশ: উন্নত, স্বল্পোন্নত এবং অনূন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপন করা হলে যথাক্রমে পাঁচ বছর, সাত বছর এবং নয় বছরের কর অবকাশ থাকে। এরূপ অবকাশ উৎপাদন শুরুর মাস থেকে গণনা করা হয়। এছাড়া মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পুত্তর খামারে দশ বছরের কর অবকাশ দেওয়া হয়।

(ii) বর্ধিত হারে অবচয় ধার্যের সুযোগ: নতুন মেশিনারি ও প্ল্যান্টের বেলায় প্রথম বছর শতকরা ৮০ ভাগ দ্বিতীয় বছর শতকরা ২০ ভাগ অবচয় ধার্য করার সুযোগ রয়েছে।

(iii) বিনিয়োগ ভাতা: কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনারি ও প্ল্যান্টের প্রকৃত মূল্যের শতকরা ২০-২৫ ভাগ বিনিয়োগ ভাতা দেওয়া হয়।

(গ) শিল্পের অর্থসংস্থান: সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদের শিল্পায়নে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থা নিয়েছে।

(ঘ) শিল্পায়নে সাহায্যকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ: কোনো একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন সাফল্যজনকভাবে পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের নানাবিধ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। শিল্পোদ্যোক্তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান শিল্পোদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে শিল্পায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (BSCIC): বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে উন্নত ও সাহায্য করার জন্য ১৯৫৭ সালে সরকারি উদ্যোগে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো এ শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শ দান। এ সংস্থার অন্য কার্যগুলো নিম্নরূপ:

- (i) শিল্পসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ
- (ii) উদ্যোক্তা শনাক্তকরণ
- (iii) সাহায্যমূলক সেবা
- (iv) শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন,
- (v) প্রকল্প নির্বাচন,
- (vi) প্রকল্প মূল্যায়ন
- (vii) সম্ভাব্যতা পরীক্ষা
- (viii) ঋণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান
- (ix) অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- (x) ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন
- (xi) পণ্য ডিজাইন
- (xii) কাঁচামাল সরবরাহে সাহায্য
- (xiii) উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিপণনে সহায়তা
- (xiv) গবেষণা ও উন্নয়ন
- (xv) পণ্যের বাজার সমীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রবিশেষে এ সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে সংস্থার সাহায্যসমূহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করেছে।

২। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (BSB): ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অনুমোদিত মূলধন ২০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৩২ কোটি টাকা। বাংলাদেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার উদ্দেশ্যে নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপন এবং চালু শিল্প প্রকল্পগুলোর সুসমকরণ,

আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ-প্রদান ও পরামর্শ দেওয়া শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজ।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে এবং ব্যাংকের সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সীমিত পরিমাণে স্বল্পমেয়াদি চলতি মূলধন সরবরাহ করে। এছাড়া সীমিত পরিমাণে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিসমূহের শেয়ার সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে ইকুইটি সমর্থন দান, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোর শেয়ার জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের জন্য অবলিখন (Underwriting) এবং এ ধরনের কোম্পানিগুলোর জন্য স্বল্পমেয়াদি সম্পূরক অর্থ জোগানের ব্যবস্থা করে। ব্যাংক বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং প্রকল্প নির্বাচনে, বাস্তবায়নে ও পরিচালনায় বিনিয়োগকারীকে বিনামূল্যে কারিগরি পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে।

৩। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (BSRS): শিল্পক্ষেত্রে ঋণদানের সুযোগ সৃষ্টি, শিল্প সম্পর্কিত সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার কাজ হচ্ছে ঋণ আদায়ের সামগ্রিক অবস্থা তথা ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষজ্ঞমূলক ভূমিকার উন্নয়ন। সংস্থার নিজস্ব পোর্টফলিওভুক্ত শিল্প প্রকল্পগুলোর সুশমকরণ ও আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান। বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, অনুন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা। শিল্পায়ন, গবেষণা ও শিল্প সম্পর্কিত পরামর্শ দান।

৪। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB): এটি বাংলাদেশের একমাত্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সালের পহেলা অক্টোবর বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান, বিনিয়োগের সম্প্রসারণ, পুঁজিবাজার উন্নয়নে সাহায্য প্রদান, সঞ্চয়কে অর্থকরী কাজে লাগানো ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে এ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় হতেই আইসিবি সাধারণ সীমিত কোম্পানির বৈশিষ্ট্য অধিকারী প্রকল্পসমূহে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাই ও বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক নির্ধারণের প্রেক্ষিতে অবলিখন ও ঋণপত্র (Debenture) ঋণের যাচাইয়ে সহায়তা করে আসছে। আইসিবি-এর কার্যাবলি সম্পাদনের সময় বাণিজ্যিক দিক ছাড়াও পুঁজিবাজার, বিনিয়োগকারী ও জনসাধারণের দিক বিবেচনা করে থাকে। বিনিয়োগ ঝুঁকি দূর করার জন্য আইসিবির নেতৃত্বে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করা হয়েছে।

৫। বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank): শিল্প ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক যথা- সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক দেশব্যাপী শাখা বিস্তারের মাধ্যমে সর্বস্তরের শিল্পোদ্যোক্তাদের

ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া ব্যাংকিং সেবাকে আরও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ব্যাংক শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদি পুঁজিও সরবরাহ করছে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা মূলধন ছাড়াও ব্যাংক থেকে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত বিনিয়োগ-পূর্ব পরামর্শ, পণ্য নির্বাচন এবং বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারে।

৬। আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক (CIE): শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করতে একজন উদ্যোক্তাকে মেশিনারী, কাঁচামাল এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার পূর্বে সরকারি অনুমোদন নিতে হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক বিদেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করার লাইসেন্স এবং রপ্তানিকারককে রপ্তানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে।

৭। বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁতশিল্প দ্রব্য রপ্তানি কর্পোরেশন (BHPECO): এ কর্পোরেশনের প্রধান লক্ষ্য হস্তচালিত তাঁতশিল্প দ্রব্যসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের তাঁত ও কুটির শিল্পের পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এ কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে তাঁত শিল্প দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

৮। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য সংস্থা (BITAC): দেশের শিল্পায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন ডিজাইন ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করা, যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে উপদেশ প্রদান, বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার, গ্রুপ আলোচনা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান দান ইত্যাদি।

৯। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR): এ পরিষদ শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার দিক নির্দেশ, নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও পরিষদের বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাস্তব প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া এটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সেল স্থাপনে উৎসাহিত করে। দেশীয় প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া উন্নয়ন এবং শিল্প ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করাও পরিষদের অন্যতম কাজ। একজন শিল্পোদ্যোক্তা এ পরিষদের আবিষ্কৃত পণ্য বা প্রক্রিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে উৎপাদন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

১০। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি: (আইডিএলসি): দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য লিজিং কোম্পানির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আইডিএলসি ইজারা চুক্তির ভিত্তিতে মেশিনারী ও অফিস ইকুইপমেন্ট প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করছে।

১১। শিল্প ও বণিক সমিতি: শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের উন্নয়নে ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যবসায় শিল্প ও বণিক সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন সমিতি তাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করে। ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন, সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি এ

সমিতির কাজ। এসব সমিতির মধ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বারস অব কমার্স (এমসিসি), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (নাসিব) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১২। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব): এ দুটি ব্যাংক কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান ছাড়াও কৃষিভিত্তিক ও কুটির শিল্পসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। সারা দেশে এদের অনেক শাখা রয়েছে।

১৩। এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (ইপিবি): বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইপিবি শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে। এসব সাহায্যের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি পণ্যের প্রচার, বিদেশি আমদানিকারকের সাথে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকের যোগাযোগ স্থাপন, রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান, অক্স সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, রপ্তানিকারকের বিদেশ সফরের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান এবং এক্সপোর্ট গ্যারান্টি প্রদান।

১৪। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি): এ করপোরেশন শিল্পোদ্যোক্তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে সাহায্য করে। এছাড়া কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান ও উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৫। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (BSTI): এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করা যাতে দেশি ও বিদেশি বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্য দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য এ সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১৬। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি) ও রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (আরইবি): বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

১৭। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম): শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপক সরবরাহের জন্য এ সংস্থা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। এসব কোর্সে শিল্পোদ্যোক্তা নিজে বা তার ফার্মের ব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

অধিকন্তু শিল্প ও বাণিজ্য খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপক ও কারিগরি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ/প্রকৌশলী সরবরাহ করার লক্ষ্যে দেশের শিল্প ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউট, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, টেকনিকেল ট্রেনিং সেন্টার, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট সরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২। বেসরকারি সহায়তা (Non Government Assistance): কোনো শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ বা সহায়তা বেসরকারি উৎস থেকেও পাওয়া যায়। বর্তমান শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তার চেয়ে বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (এনজিও) উপদেষ্টা ফার্ম, ব্যবসায় বা বণিক সমিতি থেকে শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা নিতে পারে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে বেসরকারি উৎস উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বেসরকারি সহায়তার উৎসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

(ক) বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ: ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানের একটি স্বীকৃত উপায় বা উৎস হিসেবে আমাদের সমাজে পূর্বকাল থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে, আত্মীয়স্বজনও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা।

(খ) বেসরকারি সাহায্য সংস্থা: বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য সংস্থাগুলো উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন—গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা প্রভৃতি সংস্থা আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও কুটির শিল্প স্থাপনে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে থাকে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থার কার্যক্রম বর্ণনা করা হলো :

১। গ্রামীণ ব্যাংক (Grameen Bank)

১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক নামকরণের মাধ্যমে একটি গবেষণা কাজ হাতে নেন। পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে বিত্তহীনদের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। সাধারণত বিত্তহীনদের ৫ বা ১০ জনের একটি দলকে একত্র করে এ ব্যাংক কোনো বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল একজনকে পৃথকভাবে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। মাথাপিছু গড় ঋণ ২ থেকে ৩ হাজারের বেশি হয় না। ঋণের টাকা গ্রুপের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে লাভজনক ব্যবসায় বা ক্ষুদ্র শিল্পে খাটাতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়াও গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানেও উদ্বুদ্ধ করে।

২। ব্র্যাক (Bangladesh Rural Advancement Committee)

ব্র্যাক সর্ববৃহৎ বেসরকারি সাহায্য সংস্থা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নিয়ে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। কিন্তু এরপর থেকে দারিদ্র দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক যে কার্যক্রমগুলো হাতে নিয়েছে সেগুলো হচ্ছে—

ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম: এর মধ্যে রয়েছে কাপড় বুনন, হাঁস-মুরগি পালন, আসবাবপত্র, তৈল উৎপাদন, গুড়, দড়ি, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি, ধান ভানা প্রভৃতি।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন: এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন লোকদের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। যথা- ইট তৈরি প্রকল্প।

উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়ন: আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পজাত সামগ্রীর মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে সিল্ক, জামদানি, নকশিকাঁথা প্রভৃতি।

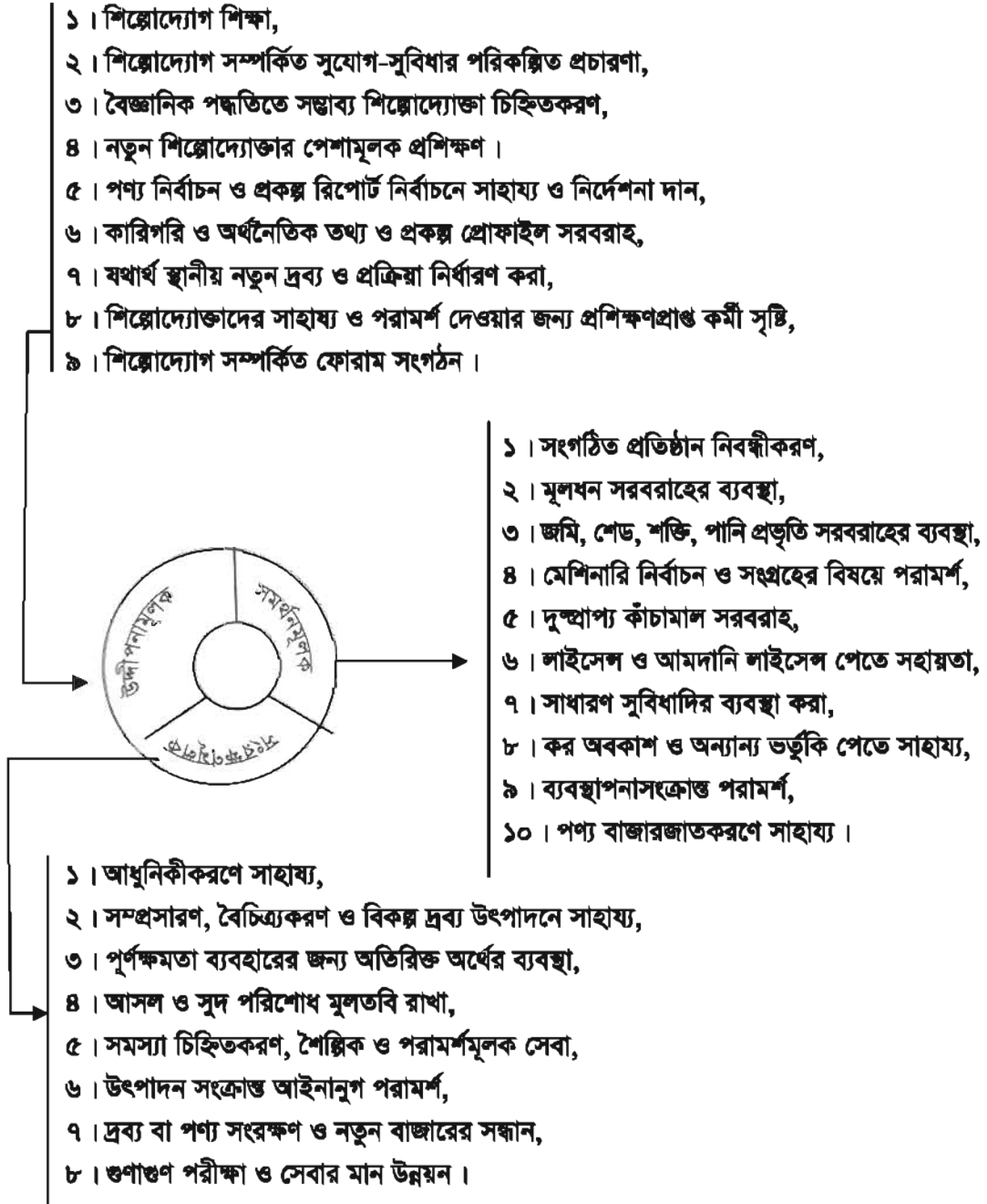
৩। **বেসরকারি ব্যাংকসমূহ:** দেশি-বিদেশি ব্যাংক মিলে বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি খাতে অনেক ব্যাংক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক লি., ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি., আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, ইন্দোসুয়েজ ব্যাংক, সিটি ব্যাংক (আমেরিকা), ন্যাশনাল ব্যাংক (পাকিস্তান) লি., মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক (পাকিস্তান) লি., এ বি ব্যাংক লি., ঢাকা ব্যাংক লি., সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. প্রভৃতি। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান এসব ব্যাংকের অন্যতম কাজ। এসব ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যও সম্পাদন করে।

৪। **বিমা কোম্পানি:** সাধারণ বিমা করপোরেশন ও জীবন বিমা করপোরেশন দুটি সরকারি বিমা কোম্পানির পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বেশ কয়েকটি বিমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে ইস্টার্ন ইনসিউরেন্স, ইস্টল্যান্ড ইনসিউরেন্স, গ্রীনল্যান্ড ইনসিউরেন্স ও প্রগতি ইনসিউরেন্স প্রধান। এছাড়াও কিছু সংখ্যক বিদেশি ইনসিউরেন্স কোম্পানিও বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছে।

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্র (Entrepreneurship Development Cycle)

উদ্যোগ উন্নয়ন চক্র হলো সেই সকল উদ্যোগ উন্নয়নমূলক কার্যাবলি যা ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। অর্থাৎ এ সকল কার্যাবলি চক্রাকারে এমনভাবে চলতে থাকে যেন একটি চেইন। নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ সকল কার্যাবলি চলতে থাকে বিধায় এটিকে শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্র বলে।

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন হয়। এসব সাহায্যকে উদ্দীপনামূলক, সমর্থনমূলক ও সংরক্ষণমূলক এ তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা পর্যায়ক্রমিকভাবে একটির পর একটি অনুভূত হয় এবং এগুলো একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপনামূলক সহায়তা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে, সমর্থনমূলক সহায়তা শিল্প স্থাপন, পরিচালনা ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এবং সংরক্ষণমূলক সহায়তা ব্যবসায়ের নানারূপ প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে একে টিকে থাকতে সহায়তা করে। এভাবে এ সকল সহায়তা চক্রাকারে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে আবর্তিত হয়ে শিল্পের উন্নয়ন ঘটায় যা শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্র নামে অভিহিত। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্রটি নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:



বৈদেশিক সাহায্যের উৎসসমূহ (Sources of Foreign Aids)

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্যের কারণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে পারে না। তাই এ সকল দেশকে উন্নয়ন কর্মসূচি

বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশ এ অর্থ ঋণ ও সাহায্য হিসেবে সংগ্রহ করে থাকে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নে বৈদেশিক সাহায্যের উৎসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) আন্তর্জাতিক সাহায্য দান সংস্থা

১। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund)

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটেন উডস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ থেকে এ সংস্থার কাজ শুরু হয়। এ সংস্থার উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা করা (২) বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা (৩) মুদ্রা বিনিময়সংক্রান্ত জটিলতা দূর করা (৪) অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা (৫) বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত ও সম্প্রসারণে সহায়তা করা (৬) লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূরীকরণে সাহায্য করা (৭) গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে কোনো দেশকে বেসরকারি ঋণ পেতে সাহায্য করা (৮) সদস্য দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ সংস্থা গঠিত হয়।

২। বিশ্ব ব্যাংক (World Bank): বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত ব্রিটেন উডস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development) তথা IBRD প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থা সংক্ষেপে বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালের মে মাসে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি:

- ১। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সাহায্য করা।
- ২। বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা।
- ৩। গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে কোনো দেশকে বেসরকারি ঋণ পেতে সাহায্য করা।
- ৪। কোনো দেশের লেনদেনের ভারসাম্যে প্রতিকূলতা থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা করা।
- ৫। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সাহায্য করা।
- ৬। সদস্য দেশগুলোতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৩। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (Asian Development Bank = ADB): এশিয়া মহাদেশের বেশির ভাগ দেশই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল। এসব দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ মূলধন থাকা প্রয়োজন তা তারা নিজস্ব সম্পদ থেকে সংগ্রহ করতে পারে না। তাই বাধ্য হয়েই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ নিতে হয়। এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের

চিন্তা করা হয়। যার ফলে ১৯৬৬ সালে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় 'এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক' নামে একটি আঞ্চলিক আর্থিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলি

- (i) এ ব্যাংক সদস্য দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণদান করে।
- (ii) ব্যাংক সদস্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি মূলধনের বিনিয়োগে সহায়তা করে থাকে।
- (iii) এ ব্যাংক সদস্য দেশগুলোর কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে ঋণ দেয়।
- (iv) ব্যাংক সদস্য দেশগুলোকে উন্নয়ন প্রকল্প ও বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান করে।
- (v) এ ব্যাংক স্বল্প সুদে সদস্য দেশগুলোকে ঋণ প্রদান করে।
- (vi) ব্যাংক সদস্য দেশগুলোকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ঋণ প্রদান করে।
- (vii) এ ব্যাংক সদস্য দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।
- (viii) ব্যাংক সদস্য দেশগুলোর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
- (ix) এ ব্যাংক ঋণদানযোগ্য বিভিন্ন খাতের প্রাক মূল্যায়ন করে।

৪। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank = IDB)

ইসলাম সুদকে হারাম করেছে কিন্তু ব্যবসাকে হালাল করেছে। এ জন্য মুসলিম দেশগুলোতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার চিন্তা ধারণা শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সৌদি আরবের জেদ্দায় মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর জেদ্দায় ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি

- (i) সদস্য দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে আর্থিক সহায়তা দান।
- (ii) সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী প্রকল্পসমূহে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দান।
- (iii) মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নে যে কোনো শরীয়তসম্মত মুসলিম জনগণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন ও পরিচালনায় সহযোগিতা করা।
- (iv) সদস্য দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটায় এমন সব প্রকল্পে সহায়তা করা।
- (v) ব্যবসায়িক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও বিনিয়োগ সুদবিহীনভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা দান।

৫। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization) হলো জাতিসংঘের একটি সহযোগী সংস্থা। ১৯৪৬ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, জেনেভায় এ সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বের শ্রমিকদের

কল্যাণ সাধনই এর কাজ। ইহা আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের মজুরি, কাজের সময়, কাজের শর্ত এবং নিয়োগের সর্বনিম্ন বয়স ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকে।

৬। আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)

UNESCO জাতিসংঘের একটি সহকারী সংস্থা। ইহা বিশ্বব্যাপী সকল সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান করে থাকে। ১৯৪৬ সালে UNESCO প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সদর দপ্তর প্যারিসে অবস্থিত।

৭। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জাতিসমূহের সংস্থা আসিয়ান (ASEAN)

আসিয়ান (Association of South East Asian Nations) একটি উপ-আঞ্চলিক সংস্থা: ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা চালানোই এর কাজ। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ক্ষুধা, রোগ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ এর লক্ষ্য।

৮। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organization) জাতিসংঘের একটি সহকারী সংস্থা। ১৯৪৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইটালির রোম শহরে এ সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। খাদ্যের অভাব দূর করার জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষিকার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, কৃষি বিষয়ে গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে মানব জাতির সেবা করা এর লক্ষ্য।

৯। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) জাতিসংঘের একটি সহযোগী সংস্থা। ১৯৪৬ সালে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত। বিশ্বের সমগ্র জাতির উন্নত স্বাস্থ্য এবং রোগ মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উন্নত ধরনের শিক্ষা দিয়ে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

৫.৭ ব্যবসা পরিচালনায় বিদ্যমান আইন সম্পর্কে ধারণা

ব্যবসায় আইনগত দিক (Legal Aspects of Business)

মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য যেসব বৈধ পেশা রয়েছে তার মধ্যে ব্যবসা অন্যতম। যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই চাকরির পরিবর্তে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যবসা করতে পারে। এতে আইনের কোনো বাধা নিষেধ নেই। তবে প্রতিটি দেশের সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করে থাকে। কাজেই ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনাসংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে ব্যবসায় উদ্যোক্তার জ্ঞান থাকা ব্যবসায় সাফল্যের পূর্বশর্ত। বিভিন্ন ধরনের আইন দ্বারা ব্যবসার

কার্যাবলি প্রভাবিত হয়। যেমন- শ্রম ও শিল্প আইন, কারখানা আইন, ব্যবসায় সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণমূলক আইন, নিম্নতম মজুরি আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, শিল্প বিরোধ আইন, শ্রমিক সংঘ আইন, দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, মূল্য সংযোজন কর আইন ইত্যাদি।

ব্যবসায় সংগঠন আইন: ব্যবসা সংগঠনের পাঁচটি আইনগত স্বীকৃত ধরন রয়েছে। যেমন-

ক. একমালিকানা ব্যবসা (Sole Proprietorship) : যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক মাত্র একজন ব্যক্তি থাকেন এবং তিনি নিজেই ইহা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাকে একমালিকানা ব্যবসা বলে। ব্যাপক অর্থে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো ব্যক্তি, নিজ দায়িত্বে পুঁজির সংস্থান করে যে ব্যবসায় গঠন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমুদয় মুনাফা একাই ভোগ করে তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। এ ধরনের ব্যবসা সংগঠন অতি সহজ এবং আইনের ন্যূনতম বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী পৌর এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করার বিধান রয়েছে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা মেনে চলতে হয়।

খ. অংশীদারি ব্যবসা (Partnership Business) : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে কোনো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। ১৯৩২ সালের অংশীদারি (যা বাংলাদেশেও প্রযোজ্য) আইন অনুযায়ী ব্যবসা গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হয়। চুক্তি অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি। চুক্তি লিখিত ও মৌখিক যে কোনো ধরনের হতে পারে। ভবিষ্যৎ বিবাদ বিসংবাদ এড়ানোর জন্য এরূপ চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে। দেশের আইন অনুযায়ী এরূপ ব্যবসায়ের জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। তবে এ ব্যবসার উদ্দেশ্য অবশ্যই আইনসম্মত হতে হবে।

গ. যৌথ মূলধনি ব্যবসা (Joint Stock Company): সাধারণ অর্থে কতিপয় ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে স্বেচ্ছায় যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে কোম্পানি আইনের আওতায় যে ব্যবসায় সংগঠন গঠন করে তাকে যৌথ মূলধনি কারবার বলে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঘ) ধারা অনুযায়ী এ কারবার গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

ঘ. সমবায় সমিতি (Co-operative Society) : নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে দেশের প্রচলিত সমবায় আইন অনুযায়ী স্বেচ্ছায় যে ব্যবসায় গঠন করা হয় তাকে সমবায় সমিতি বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের নিজেদের আর্থিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়ে সম-অধিকারের ভিত্তিতে সমবায় আইনের আওতায় যে সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে। বাংলাদেশে গৃহীত ২০০১ সালের সমবায় আইন এবং বিপরীত মর্মে কিছু না থাকলে সমবায় বিধিমালা ২০০৪ এর আওতায় এরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা হয়ে থাকে।

মোট কথা, একজন ব্যবসা উদ্যোক্তা ব্যবসা বিভিন্ন আইনগত সাংগঠনিক কাঠামোর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে তার প্রকল্পের জন্য একটি সংগঠন কাঠামো নির্বাচন করতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাসমূহ জানা থাকলে উদ্যোক্তার পক্ষে ব্যবসায় ধরন নিরূপণ করা সহজ হবে।

ক. একমালিকানা ব্যবসায়ের নিবন্ধন বা ট্রেড লাইসেন্সের নিয়মাবলি: একমালিকানা ব্যবসায়ের নিবন্ধনের কোনো বিধান নেই। তবে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে। এর ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করা খুবই সহজ। একমালিকানা ব্যবসাটি পৌর এলাকায় স্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট পৌর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। পৌর এলাকার বাইরে স্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বা ট্রেড লাইসেন্সের নিয়মাবলি: বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। ব্যবসায়ের নিবন্ধন সম্পূর্ণ অংশীদারদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অংশীদারি আইনের ৫৮(১) ধারায় নিবন্ধনের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ব্যবসায় নিবন্ধনের জন্য যে স্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে উক্ত এলাকার সরকার নিযুক্ত নিবন্ধনের অফিসে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হয়। অত্র ধারায় বর্ণনা অনুযায়ী আবেদনপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকে:

১. অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম;
২. প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিসের ঠিকানা;
৩. অন্য কোথাও ব্যবসার শাখা থাকলে তার ঠিকানা;
৪. ব্যবসার উদ্দেশ্য;
৫. ব্যবসা শুরুর কার্যকাল;
৬. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা;
৭. যে তারিখের প্রত্যেক অংশীদার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এবং স্বাক্ষর করেছে তার উল্লেখ।
৮. প্রতিষ্ঠানটি কত সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এর মেয়াদ উল্লেখ (যদি থাকে)।

আবেদনপত্রটি সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়। আবেদনপত্রের বিবৃতিতে আইনের ৫৮ ধারা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা নিবন্ধক তা পরীক্ষা করবেন এবং সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধন বইতে ব্যবসার নাম তালিকাভুক্ত করবেন। এরূপ তালিকাভুক্তির পর হতেই অংশীদারি ব্যবসাটি নিবন্ধিত হয়েছে বলে ধরা হয়।

ট্রেড লাইসেন্স: অংশীদারি ব্যবসার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এরূপ ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, ব্যবসা গঠনের পরেও ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করা যায়। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্য অবশ্যই আইনসম্মত হতে হবে।

যৌথ মূলধনি কোম্পানি নিবন্ধনের নিয়মাবলি: ১৯৯৪ সালের কোম্পানির আইন অনুযায়ী যৌথ মূলধনি কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের দপ্তর থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হয়। উক্ত আবেদন ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফিস ও দলিলপত্রসহ নিবন্ধকের কাছে পেশ করতে হয়।

আবেদনপত্রের সঙ্গে যেসব দলিলপত্র দাখিল করতে হয় সেগুলো হলো:

১. প্রবর্তকগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি।
২. কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের বিবরণী।

৩. কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলি।
৪. প্রাথমিক পরিচালকের নাম, ঠিকানা ও সম্মতি পত্র।
৫. পরিচালকগণ, কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় করেছেন এমন প্রমাণপত্র।
৬. কোম্পানি গঠনের সাথে জড়িত হাইকোর্টের উকিল বা অ্যাটর্নি জেনারেলের আইনগত সার্টিফিকেট।

উপরে উল্লিখিত দলিলপত্র যাচাই-বাছাই করে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিস্ট্রার সন্তুষ্ট হলে কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন বহিতে প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং এ মর্মে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এভাবেই যৌথ মূলধনি কোম্পানির নিবন্ধন কার্য শেষ হয়। নিবন্ধনের মাধ্যমেই কোম্পানি আইনসম্মতভাবে জন্মলাভ করে। প্রাইভেট কোম্পানি নিবন্ধন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসা শুরু করতে পারে। পাবলিক লি. কোম্পানিকে ব্যবসা শুরু করার জন্য কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র লাভের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

সমবায় সমিতি নিবন্ধনের নিয়মাবলি:

সমবায় সমিতি নিবন্ধনের বিষয়টি কোম্পানির গঠনের মতো এত কঠিন বিষয় নয়। এ পর্যায়ে সমিতির কর্তব্যাক্ষিপণ সংশ্লিষ্ট এলাকার সমবায় অফিস হতে প্রয়োজনীয় আবেদনপত্রের ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি, ফিসহ নিবন্ধকের কাছে জমা দেয়। আবেদনপত্রের সাথে যে সকল দলিল জমা দিতে হয় তা নিম্নরূপ:

- ক. সমিতির সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও দস্তখত। স্বাক্ষরের সাথে তারিখের উল্লেখ থাকাও আবশ্যিক।
- খ. সমিতির উপবিধির তিন কপি। এতেও প্রবর্তকগণ কর্তৃক স্বাক্ষর থাকা আবশ্যিক।
- গ. আবেদনপত্রটির আইনগত যথার্থতা সম্পর্কে সম্পাদক ও উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত ঘোষণাপত্র।

উপরোক্ত দলিলপত্রাদি ও ফি প্রাপ্ত হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে তা মঞ্জুর করত সমিতির নামে নিবন্ধনপত্র ইস্যু করেন এবং যা নিবন্ধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সনদ হিসেবে গৃহীত হয়। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরপরই সমিতি কাজ শুরু করতে পারে।

দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৫ (Shops and Establishment Act, 1965)

যেসব প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৫ জন বা তার বেশি কর্মচারী নিযুক্ত আছেন অথবা পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে কোনো একদিন নিযুক্ত ছিল তাদের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য।

দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৫ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়:

১. সরকারি বা সরকারের অধীন অফিস।
২. মেলা বা প্রদর্শনীতে সাময়িক প্রতিষ্ঠিত দোকান।
৩. চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পরিচালিত দোকান।
৪. ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দোকান।
৫. রেলওয়ে অফিস।
৬. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন হোটেল বা মেস।

এ আইনে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের অর্থ-

ক. শিক্ষানবিস: প্রশিক্ষণকালে যে শিক্ষার্থীকে ভাতা দেওয়া হয়।

খ. শিশু: যার বয়স এখনো বারো বছর পূর্ণ হয়নি।

গ. বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান: নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এর অন্তর্গত।

১. যে প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপন প্রচার, কমিশন অথবা পণ্য রপ্তানির কাজ পরিচালিত হয় অথবা যা একটি ব্যবসার এজেন্সি।

২. কারখানা বা কোনো শিল্প ব্যবসা সংস্থার করণিক বিভাগ।

৩. বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি, শর্তাদি পালনের জন্য যে ব্যক্তি কর্মচারী নিয়োগ করে থাকে তার অফিস।

৪. জয়েন্ট স্টক কোম্পানির শাখা, বিমা কোম্পানি, ব্যাংকিং কোম্পানি অথবা ব্যাংক স্টক এক্সচেঞ্জ।

৫. ক্লাব, হোটেল বা রেস্টোরাঁ অথবা সিনেমা বা থিয়েটার অথবা সরকারি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান যা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করা হয়েছে এরূপ সকল প্রতিষ্ঠান।

ঘ. দিন: দিন বলতে মধ্যরাত থেকে আরম্ভ করে ২৪ ঘণ্টা সময় বোঝাবে; কিন্তু যে কর্মচারীকে মধ্যরাতের পরেও কাজ করতে হয় তার ক্ষেত্রে মধ্যরাত নির্বিশেষে তার কাজ আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে আরম্ভ করে ২৪ ঘণ্টা সময়কে বোঝাবে।

ঙ. শিল্প প্রতিষ্ঠান

১. যে প্রতিষ্ঠানে দ্রব্যসমূহ উৎপন্ন বা প্রস্তুত করা হয় অথবা বিক্রি বা বিলির উদ্দেশ্যে কোনো দ্রব্য উৎপাদন পরিবর্তন মেরামত মোড়াই করা বা অন্য কোনো মেরামত কাজ করা হয়।

২. ডক ঘাট, জেটি বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোনো প্রতিষ্ঠান যাকে শিল্প প্রতিষ্ঠানরূপে আখ্যায়িত করা হয়।

ছ. দোকান: নগদে বা ধারে দ্রব্যসামগ্রী বা জিনিসপত্র পাইকারি অথবা খুচরা বিক্রির জন্য নির্ধারিত স্থান এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো অফিস, গুদাম ঘর অথবা কর্মস্থল ইত্যাদি।

জ. মজুরি: ১৯৩৬ সালের মজুরি প্রদান আইনে বর্ণিত মজুরি বোঝাবে।

ঝ. সপ্তাহ: শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যকার মধ্যরাত থেকে আরম্ভ করে সাত দিন সময়।

ঞ. শ্রমিক: ভাড়ায় বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দৈনিক, কারিগরি বা করণিক কাজের জন্য দোকান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিসহ কোনো ব্যক্তি।

ট. তরুণ ব্যক্তি-১২ এবং ১৮ বছর বয়সের মধ্যবর্তী শ্রমিকদল।

আইনগত বিধি-নিষেধ: দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৬৫-এর আওতায় যে সকল বিধি-নিষেধ দ্বারা শ্রমিকদের কাজ, ছুটি, মজুরি স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা আলোচনা করা হলো—

রেহাই ও সম্প্রসারণ

১. সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য আরোপিত শর্তাবলি সাপেক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে এই আইনের যাবতীয় বা যে কোনো বিধান স্থগিত রাখতে বা সম্প্রসারিত করতে পারেন। কিন্তু ঐ মেয়াদ এক বছরের বেশি হবে না।
 ২. প্রধান পরিদর্শক সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দ্বারা কোনো উৎসব বা পর্ব উপলক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এই আইনের যে কোনো বা যাবতীয় বিধানাবলি স্থগিত ঘোষণা করতে পারেন।
- কিন্তু উৎসবের ছুটির দিনে যদি কোনো কর্মচারীকে দিয়ে কাজ করার প্রয়োজন হয়, তবে এরূপ ছুটির দিনের প্রতি দিনের জন্য পুরো মজুরিসহ তাকে দুদিন ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি দেয়া হবে।

ছুটি সংক্রান্ত

সাপ্তাহিক ছুটি: কোনো প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীগণকে সপ্তাহে দেড়দিন উপর্যুপরি ছুটি দিতে হবে এবং এ জন্যে কোনো মজুরি কাটা যাবে না।

মজুরিসহ বার্ষিক ছুটি

১. কোনো প্রতিষ্ঠানে একাধারে বারো মাস কাজ করেছে এমন প্রত্যেক কর্মচারীকে পরবর্তী বারো মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে নিরূপিত দিনের জন্য পূর্ণ মজুরিসহ ছুটি দেওয়া হবে।
 - ক. প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বারো মাসে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতি আঠার দিন কাজের জন্য একদিন এবং
 - খ. অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বেলায় পরবর্তী বারো মাসে সেই ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতি চৌদ্দ দিন কাজের জন্য একদিন। উক্ত ছুটির মধ্যে কোনো ছুটির দিন পড়লে তা এ ছুটির মধ্যে গণ্য হবে।
২. উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রে অনুসারে কোনো শ্রমিক তার ছুটি কোন বছরে ভোগ না করলে তা পরবর্তী বছর তাকে যে ছুটি দেওয়া হবে তার সাথে সংযুক্ত হবে।
৩. নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে চাকরির ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কোনো শ্রমিক কোনো প্রতিষ্ঠানে অবিচ্ছিন্ন চাকরি করেছেন বলে গণ্য হবে:
 - ক. কোনো ছুটির দিন
 - খ. মজুরিসহ কোনো ছুটি
 - গ. পীড়া বা দুর্ঘটনাহেতু বিনা মজুরিতে বা মজুরি সমেত কোনো ছুটি।
 - ঘ. অনধিক বারো সপ্তাহের মাতৃত্ব ছুটি।
 - ঙ. লে-অফ
 - চ. বেআইনি ছুটি নয় এমন ধর্মঘট অথবা আইনসিদ্ধ নয় এমন লক আউট।

পর্ব উপলক্ষে ছুটি: প্রত্যেক শ্রমিককে উৎসব উপলক্ষে বছরে পুরো মজুরিতে অন্তত ১০ দিনের ছুটি দেওয়া হবে।

নৈমিত্তিক ছুটি: প্রত্যেক শ্রমিক কোনো বছরে মজুরিসহ দশ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাবে। শর্ত হলো চলতি পঞ্জিকা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নৈমিত্তিক ছুটি জমা থাকবে না।

অসুস্থতার জন্য ছুটি: কোনো শ্রমিক অসুস্থতাহেতু বছরে চৌদ্দ দিনের মজুরিসহ ছুটি ভোগ করতে পারে। কোনো বছর এরূপ ছুটি ভোগ না করা হলে তা জমা থাকবে কিন্তু তা কখনোই আটশ দিনের অধিক হবে না।

বন্ধ

১. প্রতি দোকান অথবা ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে উপর্যুপরি অন্তত দেড় দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
২. রাত আটটার পর কোনো দোকান কোনো দিন খোলা থাকবে না। তবে কোনো খরিদার কোনো জিনিস কেনার জন্য ঐ সময় ঐ দোকানে উপস্থিত হলে বা অপেক্ষা করলে ঐ সময়ের পরবর্তী ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তার কাছে জিনিস বিক্রি করা যেতে পারে।

বন্ধ থেকে অব্যাহতি

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে বন্ধের বিধানবলি প্রযোজ্য হবে না:

১. ডক, ঘাট, স্টেশনে বা বিমানবন্দরসহ পরিবহন সার্ভিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ।
২. প্রধানত: শাক-সবজি, মাছ-মাংস, দুগ্ধজাত সামগ্রী বিক্রির কাজ পরিচালনাকারী দোকানসমূহ।
৩. প্রধানত: ওষুধপত্র, অস্ত্রোপাচারের সরঞ্জাম ব্যাভেজ অথবা চিকিৎসাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রির দোকানসমূহ।
৪. অস্ত্যেষ্টিত্রিয়া দাফন বা শবদাহের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রির দোকানসমূহ।
৫. ক্লাব, হোটেল, রেস্টোরাঁ, সিনেমা বা থিয়েটারসমূহ।
৬. প্রধানত পান, বিড়ি, সিগারেট, সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি বিক্রির দোকানসমূহ।
৭. ক্ষৌরকার ও সেফটিগ্যাসের দোকানসমূহ।
৮. পেট্রোল পাম্প এবং মেরামত কারখানা নয় এরূপ অটোমোবাইল সার্ভিস স্টেশনসমূহ।
৯. জনসাধারণকে শক্তি, আলো বা পানি সরবরাহ করে এরূপ বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান।

কাজের ঘণ্টা সংক্রান্ত

দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা: কোনো শ্রমিককে দিনে নয় ঘণ্টার ও সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টার এবং কোনো তরুণ ব্যক্তিকে দিনে সাত ঘণ্টার ও সপ্তাহে বিয়াল্লিশ ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করতে হবে না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় কাজ করার দরকার হতে পারে। কিন্তু তার পরিমাণ প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ষাট ঘণ্টা এবং তরুণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বায়ান্ন ঘণ্টার বেশি হবে না।

ওভারটাইম: কোনো শ্রমিককে অতিরিক্ত সময়ের জন্য তার মজুরির সাধারণ হারের দ্বিগুণ হারে নিরূপিত ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভাতা স্থির করার জন্য বোনাস বা বোনাসের পরিবর্তে প্রদত্ত কোনো টাকা মজুরির সাধারণ হারের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বিশ্রাম ও আহারের বিরতি: কোনো শ্রমিককে আহার ও বিশ্রামের জন্য দৈনিক এক ঘণ্টা সময় দেওয়া না হলে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে বাধ্য থাকবে না।

ছুটি বা অবকাশকালীন মজুরি: কোনো শ্রমিককে যে ছুটি বা ছুটির দিন মঞ্জুর করা হয় তার জন্য তার ছুটির ঠিক পূর্ববর্তী মাসে তিনি যতদিন কাজ করেছেন ততদিন মহার্ঘ ভাতা থাকলে তৎসহ পূর্ব সময়ের উপার্জনের দৈনিক কাজের সমহারে তাকে মজুরি দেওয়া হবে। কিন্তু অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য কোনো ওভারটাইম ভাতা ও বোনাস থেকে তিনি বাদ থাকবেন।

নিয়োগ, মজুরি পরিশোধ ও ক্ষতিপূরণ

কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য শিশুকে নিযুক্ত করা যাবে না। কোনো মহিলা বা অল্প বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রধান পরিদর্শকের অনুমতি ছাড়া সকাল ৭টা ও রাত ৮টার মধ্যে ছাড়া অন্য কোনো সময় প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা যাবে না।

কোনো মজুরি সময় ১ মাসের অতিরিক্ত হবে না। ১০০-এর কম লোক নিয়োগ রয়েছে এমন প্রতিটি কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে মজুরি কাজ শেষ হওয়ার পর ৭ দিনের মধ্যে মজুরি পরিশোধ করতে হবে।

- অন্য কোনো কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সময় হবে ১০ দিন।
- মালিক চাকরির অবসান ঘটালে, কর্মচারীর অর্জিত সমুদয় মজুরি চাকরির অবসান ঘটানোর তারিখ হতে দ্বিতীয় কাজের দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পরিশোধ করতে হবে।
- সকল মজুরি কাজে চলার দিনে পরিশোধ করতে হবে।
- চালু মুদ্রায় বা কারেন্সি নোট দিয়ে বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- কর্মচারীদের অপরাধ ও খারাপ আচরণের জন্য মালিক জরিমানা করতে পারবে। তবে এই জরিমানার হার ও কর্তনাদি প্রক্রিয়া ১৯৩৬ সালের মজুরি পরিশোধ আইন ও বিধিমালা মোতাবেক হতে হবে।
- জরিমানা করার পূর্বে শ্রমিককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হবে। জরিমানাকারীকে ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে জরিমানা করার ক্ষমতা লাভ করতে হবে এবং ইন্সপেক্টরের পূর্ব অনুমতি ছাড়া জরিমানা করা যাবে না।

স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত

প্রত্যেক প্রক্রিয়া পরিচ্ছন্ন এবং কোনো নর্দমা, পায়খানা অথবা অন্য আবর্জনা থেকে উদ্ধৃত দূষিত বাষ্পমুক্ত রাখতে হবে এবং নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে পরিষ্কার রাখতে হবে।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত মাপ অনুযায়ী ও নির্ধারিত প্রকারে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কাজ চলাকালীন সময় পর্যাপ্তভাবে আলোকিত রাখতে হবে।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পছায় স্বাস্থ্যরক্ষা, সম্বন্ধীয় সুবিধা, ধৌত কাজের সুযোগ-সুবিধা এবং যে স্থানে প্রয়োজন হয় সে স্থানে শ্রমিকদের খাওয়ার সুবিধাধির ব্যবস্থা করতে হবে।

রেকর্ড রেজিস্টার ও নোটিশ সংরক্ষণ এবং তথ্য সরবরাহ

- প্রত্যেক মালিক 'ক' ফরমে ২ কপি করে তার প্রতিষ্ঠানের বাস্তব ও নির্ভুল তথ্য সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টরের কাছে পেশ করবেন। ইন্সপেক্টর ১ কপি সত্যায়িত করে মালিককে ফেরত দিবেন। এ ফরমে পেশকৃত তথ্যাবলির পরিবর্তন ঘটলে একই পদ্ধতি ও ফরম তৎক্ষণাৎ তা ইন্সপেক্টরের কাছে পেশ করতে হবে।
- প্রত্যেক মালিক 'খ' ফরমে ২টি করে পরিদর্শন বই সংরক্ষণ করবেন এবং তদন্তের সময় ক্রটি-বিচ্যুতি উক্ত পরিদর্শন বইতে লিপিবদ্ধ করবেন। তদন্তের সময় সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য জানতে চাইলে মালিক তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করবেন। লিখিত নোটিশের বেলায় ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- মালিক তার শ্রমিকদের হাজিরা 'গ' ফরমে একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন। সাপ্তাহিক ছুটি ওভারটাইমের বিবরণ এতে থাকবে।
- প্রত্যেক মালিক 'খ' ফরমে বেতন রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।
- প্রত্যেক মালিক 'ঙ' ফরমে একটি পৃষ্ঠায় রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

তদন্ত, ইন্সপেক্টরের ক্ষমতা ও দণ্ড

চিফ ইন্সপেক্টর শ্রম ডাইরেক্টর চিফ ইন্সপেক্টর হবেন। বাংলাদেশব্যাপী তিনি একজন ইন্সপেক্টরের ক্ষমতা রাখবেন। ইন্সপেক্টরগণের তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ইন্সপেক্টর-গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেওয়া স্থানীয় এলাকার জন্য সরকার যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে ইন্সপেক্টর নিয়োগ করবেন। এরা সরাসরি কর্মচারী বলে গণ্য হবেন। সাধারণত জেলার জন্য জেলা প্রশাসক এবং মহকুমার জন্য মহকুমা প্রশাসক ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্সপেক্টরের ক্ষমতা

ইন্সপেক্টর তার নির্দিষ্ট সীমানায় যে কোনো যুক্তিসঙ্গত সময়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন। সরেজমিনে তদন্ত বা তদারক চালাতে পারবেন যে কোনো রেকর্ড, রেজিস্টার বা দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করতে পারবেন ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা চাইতে ও রসিদ দিয়ে রেকর্ড দলিলাদি আটক করতে পারবেন।

স্বাভাবিক কাজ চলার সময় তদন্তে গমন করলে ইন্সপেক্টর যতদূর সম্ভব ব্যবসার কাজ বিঘ্নিত না করে তদন্তকার্য সম্পাদন করবেন। তবে তদন্তের সময় কোনো ব্যক্তিকে এমন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না বা কোনো বিবৃতি প্রদান করতে হবে না, যা দ্বারা সে নিজে অন্য অপরাধে জড়িত হতে পারে।

প্রশ্নমালা-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইংরেজি 'Business' শব্দের প্রতিশব্দ কী?
২. ব্যবসায় কী?
৩. ধরন অনুযায়ী ব্যবসায়কে কত ভাগে ভাগ করা যায় উল্লেখ কর।
৪. সেবামূলক ব্যবসায় কাকে বলে।
৫. একমালিকানা ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা কত?
৬. অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্যসংখ্যা কত?
৭. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্যসংখ্যা কত?
৮. বাংলাদেশে কত সালের আইন অনুযায়ী যৌথমূলক কোম্পানি গঠিত হয়।
৯. একমালিকানা ব্যবসায়ের নিবন্ধন কী বাধ্যতামূলক?
১০. অংশীদারি কারবারের ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহের প্রয়োজন আছে কি?
১১. যৌথ মূলধনি কারবারের নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক।
১২. দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে শিশু কাদেরকে বলা হয়?
১৩. সহায়তার উৎসমূহ কী?
১৪. প্রকৃতিগত ধরন অনুযায়ী সহায়তার ধরনকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।
১৫. সমর্থনমূলক সহায়তা কী?
১৬. শিল্পায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
১৭. কর অবকাশ বলতে কী বোঝায়?
১৮. একজন ব্যবসায়ীর সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয় কেন?
১৯. সাহায্য-সহযোগিতার উৎস কত প্রকার ও কী কী?
২০. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার প্রধান কাজ কী?
২১. প্রকল্প কী?
২২. প্রকল্প শব্দটি কোনো দেশীয় শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে?
২৩. প্রকল্প ধারণা কাকে বলে?
২৪. প্রকল্পকে কত ভাগে ভাগ করা যায় উল্লেখ কর।
২৫. মাইক্রো ফ্রিনিং কাকে বলে?
২৬. প্রকল্প ধারণার দিকনির্দেশনা কাকে বলে?
২৭. প্রকল্পের অর্থায়ন কাকে বলে?
২৮. প্রকল্প ধারণার সূচনা হয় কোথা থেকে?
২৯. ম্যাক্রো ফ্রিনিং কী?
৩০. ব্যবসা পরিবেশ দ্বারা কী বোঝায়?
৩১. ব্যবসার আর্থিক দিক কী?
৩২. ব্যবসার বাণিজ্যিক দিক কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দাও।
২. ব্যবসায়ের ধরন কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।
৩. উৎপাদনমূলক ব্যবসা কাকে বলে?
৪. ক্রয়-বিক্রয় জাতীয় ব্যবসা বলতে কী বোঝায়?
৫. অংশীদারি ব্যবসার সংজ্ঞা দাও।
৬. সমবায় সমিতি কাকে বলে?
৭. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সংজ্ঞা দাও।
৮. যৌথ মূলধনি ব্যবসার সংজ্ঞা দাও।
৯. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে?
১০. রাষ্ট্রীয় কারবার কাকে বলে?
১১. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ধারণ বলতে কী বোঝায়?
১২. দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৫ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
১৩. সহায়তার উৎসসমূহ বলতে কী বোঝায়?
১৪. উদ্দীপনামূলক সহায়তা কাকে বলে?
১৫. সমর্থনমূলক সহায়তা কাকে বলে?
১৬. সংরক্ষণমূলক সাহায্য সহায়তা কাকে বলে?
১৭. শিল্প নীতি কাকে বলে?
১৮. শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো উল্লেখ কর।
১৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ কী?
২০. গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ কর।
২১. ব্র্যাক-এর লক্ষ্য কী?
২২. উদ্যোগ উন্নয়ন চক্র কাকে বলে?
২৩. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ কর।
২৪. প্রকল্পের সংজ্ঞা দাও।
২৫. প্রকল্পের ধারণা কীভাবে সৃষ্টি হয়?
২৬. প্রকল্প ধারণার দিক-নির্দেশনা বলতে কী বোঝায়?
২৭. ম্যাক্রো স্কিনিং কাকে বলে?
২৮. প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচনের সময় কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় উল্লেখ কর।
২৯. প্রকল্পের কারিগরি দিক বলতে কী বোঝায়?
৩০. প্রকল্পের বাণিজ্যিক দিক বলতে কী বোঝায়?
৩১. চলতি মূলধন কাকে বলে?

৩২. ব্যাংক ঋণ বলতে কী বোঝায়?
৩৩. ব্যাংক প্রদত্ত প্রধান প্রধান ঋণগুলো কী কী আলোচনা কর।
৩৪. প্রকল্প নির্বাচনের ধাপগুলো কী কী আলোচনা কর।
৩৫. বাজার জরিপ দ্বারা কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবসা শুরু করার প্রাথমিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
২. মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসা কত ধরনের হতে পারে। প্রতিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৩. ব্যবসায়ের অবস্থান নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।
৪. কোথায় ব্যবসা স্থাপন করা হবে তা কীভাবে নির্ধারণ করা হয়।
৫. দোকান আইনের ধারাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৬. ব্যবসার আইনগত দিক বলতে কী বোঝায়? কোন ধরনের ব্যবসায়ের জন্য কোন আইন প্রচলিত তা আলোচনা কর।
৭. যৌথ মূলধনি কোম্পানির নিবন্ধনের নিয়মাবলি আলোচনা কর।
৮. দোকান আইনের ধারাসমূহ বর্ণনা কর।
৯. অংশীদারি ব্যবসার নিবন্ধন ও ট্রেড লাইসেন্সের নিয়মাবলি আলোচনা কর।
১০. একজন ব্যবসায়ীর সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
১১. শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের কার্যাবলি আলোচনা কর।
১২. সহায়তার ধরনসমূহের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
১৩. সহায়তার উৎসসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
১৪. সরকারি সাহায্যের উৎসগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।
১৫. বেসরকারি সাহায্যের উৎসগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।
১৬. শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন চক্রটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।
১৭. বৈদেশিক সাহায্যের উৎসসমূহ আলোচনা কর।
১৮. বিশ্ব ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা কর।
১৯. এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।
২০. প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের দিকনির্দেশনাগুলো আলোচনা কর।
২১. প্রকল্প ধারণার উৎসগুলো আলোচনা কর।
২২. প্রকল্পের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
২৩. ম্যাক্রো ফ্রিনিং পরিবেশের উপাদানগুলো বর্ণনা কর।
২৪. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উপাদানগুলো আলোচনা কর।
২৫. স্বল্পমেয়াদি অর্থ সংস্থানের উৎসসমূহ আলোচনা কর।
২৬. দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা

Bussiness Management

ভূমিকা (Introduction)

আধুনিক বিশ্বে যে বিষয়টি সমাজের সর্বক্ষেত্রে আজ প্রয়োজন তা হলো ব্যবস্থাপনা। মানব সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপনের জন্য যেসব কার্য সম্পাদন করত সে থেকেই ব্যবস্থাপনার প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা একটি অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক শাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃত। আজকাল ছোট-বড় সকল কারবারি, অকারবারি সকল প্রতিষ্ঠানেই ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিসরে যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অবশ্যই দক্ষ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

৬.১ ব্যবস্থাপনার ধারণা, সংজ্ঞা ও কার্যাবলি

ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা (Definition of Management)

ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। Management শব্দটি ইতালীয় শব্দ 'Maneggiare' হতে উদ্ভূত। Maneggiare শব্দের অর্থ 'To train up the horses' অর্থাৎ অশ্বকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিত করে তোলা। তাই শাব্দিক অর্থে পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত (to handle) কাজকে ব্যবস্থাপনা বলে।

অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ মনে করেন Management শব্দটি ফরাসি Manage এবং Menager শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। Manage শব্দের অর্থ হলো (The act of guiding or leading) অর্থাৎ পরিবার পরিচালনা করা।

সাধারণ অর্থে: প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের সুকৌশলে পরিচালনা করাকে ব্যবস্থাপনা বলে।

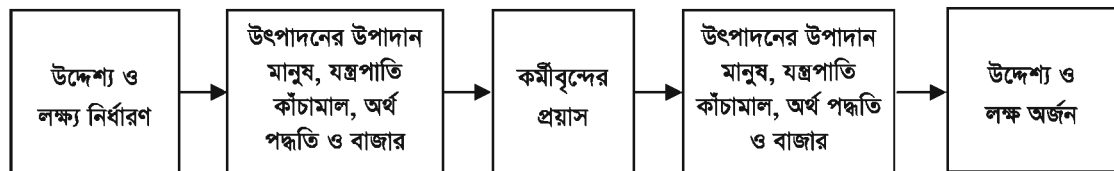
ব্যাপক অর্থে: প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদসমূহের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয় সাধন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলির সমাহারকে ব্যবস্থাপনা বলে।

নিম্নে প্রখ্যাত মনীষী ও ব্যবস্থাপনাবিদদের কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। এল. এ. এলেন (L.A Allen)-এর মতে, 'একজন ব্যবস্থাপক যা করেন তাই ব্যবস্থাপনা।' (Management is what a manager does)

- ২। এল.এ. এপলি (L.A. Appley)-এর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হলো অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল।' (Management is the art of getting things done through the efforts of other people)
- ৩। জর্জ. আর. টেরি (G.R. Terry)-এর মতে, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জন করে।
- ৪। ই.এফ.এল ব্রিচ (E.F.L. Breach)-এর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।'।
- ৫। স্টানলি ভ্যান্স (Stanly Vance)-এর মতে, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং পূর্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত জনশক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলে।'।
- ৬। আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল (Henry Fayol)-এর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমস্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।' (To manage is to forecast and plan, to organize, to command, to co-ordinate and control)
- ৭। আর.সি ডেভিস (R.C. Davis)-এর মতে, 'যে কোনো স্থানের নির্বাহী নেতৃত্বের কার্যই হচ্ছে ব্যবস্থাপনা।'।
- ৮। উইরিচ এবং কুন্টজ (Weihrich and Koontz)-এর মতে, নির্বাচিত উদ্দেশ্যে দক্ষতার সাথে অর্জনের জন্য ব্যক্তি বা দলীয় কার্য সম্পাদনে একটি পরিবেশ পরিচালনা ও নকশা প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলে।
- ৯। আমেরিকার ম্যানেজমেন্ট সমিতি (American Management Association)-এর মতে, 'মানুষের উদ্যম সংগঠিত ও পরিচালিত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করার বিজ্ঞান ও কলাকে ব্যবস্থাপনা বলে।'।

উপরোক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা বিয়টিকে নিম্নে সংক্ষেপে রেখাচিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হলো:



আধুনিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ (Objects of Modern Management)

আধুনিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মূল উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করে প্রতিষ্ঠানের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করা। উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই ব্যবস্থাপনা কার্য আবর্তিত হয়। আধুনিক ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সন্তুষ্ট রেখে মুনাফা অর্জন এর মুখ্য উদ্দেশ্য। গুরুত্বের দিক হতে ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(ক) প্রাথমিক বা মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি (Primary or basic objectives) : উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণ করা ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। নিম্নে উদ্দেশ্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। মুনাফা অর্জন: যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো অধিক মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে মালিক পক্ষের সর্বাধিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

২। অস্তিত্ব রক্ষা: একটি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি অর্জন প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সুদৃঢ় অবস্থান প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা ও কাজগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

৩। উন্নয়ন প্রসার: প্রতিটি কারবার প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতায় সফলতার সাথে টিকে থাকতে হলে উন্নয়ন ও এর প্রসার অপরিহার্য। অন্যথায় পিছিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই উন্নয়ন সাধন সকল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(খ) গৌণ বা সহায়ক উদ্দেশ্যাবলি (Secondary objectives): ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলি নৈপুণ্যের সাথে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কতিপয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে হয় এগুলো সহায়ক উদ্দেশ্য হিসাবে পরিচিত। এ উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। ব্যবস্থাপনার উপকরণাদির উন্নয়ন: ব্যবস্থাপনার সাফল্যের সাথে উপকরণাদির উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ব্যবস্থাপনা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, অর্থ পদ্ধতি ইত্যাদি উপকরণসমূহের উন্নয়ন সাধন করে থাকে।

২। উৎপাদন বৃদ্ধি: উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যবস্থাপনার অন্যতম দিক। শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান গৌণ উদ্দেশ্য।

৩। অর্থনৈতিক অবদান: ক্রেতাগণ বিভিন্ন সময়ে যে ধরনের পণ্য ও সেবা চায় সে অনুসারে প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ করে থাকে।

৪। বাজার সৃষ্টি করা: নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে উন্নতমানের পণ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাজার সৃষ্টি করা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য।

৫। সামাজিক উদ্দেশ্য: কারবারের সাধারণ উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ করা। যেমন— বেকার সমস্যা দূরীকরণ, ক্রেতা ও উৎপাদনকারীর স্বার্থরক্ষা। মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা, সরকারকে আয়কর প্রদান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৬। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব শক্তির উন্নয়ন: শিল্প প্রতিষ্ঠানের নতুন ও পুরাতন শ্রমিক কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য।

৮। শক্তিশালী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: ব্যবস্থাপনা প্রতিটিকে কাজের সহজ ও কাম্য সম্পাদন কল্পে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৯। জাতীয় আয় বৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা ব্যবস্থাপনার আরেকটি উদ্দেশ্য।

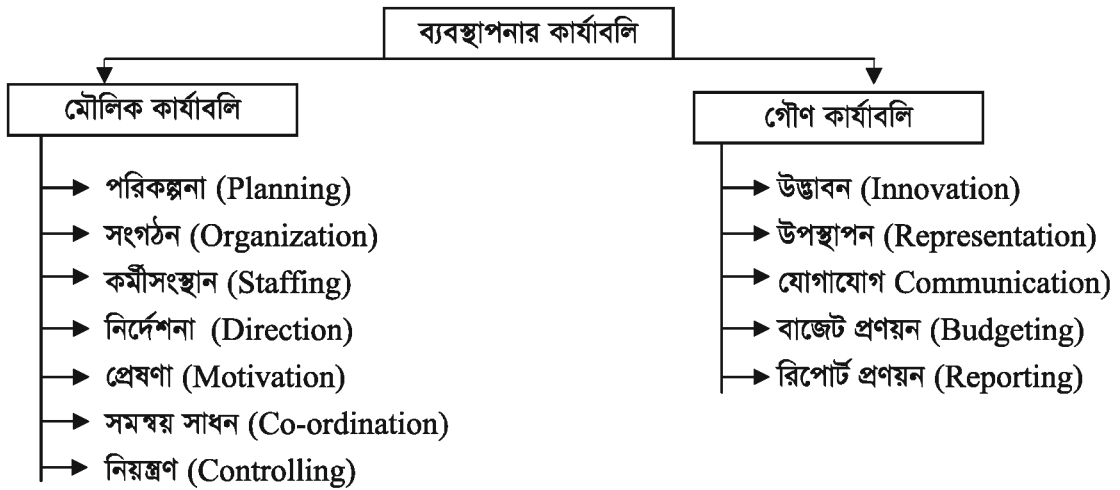
১০। কর্মী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন: যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে মানবীয় সম্পর্ক বা কর্মী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন সাধনও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সবার সাথে উত্তম সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুনাফা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বা প্রক্রিয়াসমূহ

Function or Process of Management

ব্যবস্থাপনা বিশারদদের চিন্তাধারা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বা প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।



নিম্নে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

(ক) ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্যাবলি

১। পরিকল্পনা (Planning) : পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার প্রথম ও মৌলিক কাজ। পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী কাজ করা হবে, কে করবে, কখন করবে, কীভাবে করবে ইত্যাদি নির্ধারণ করাই হলো পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে অধ্যাপক নিউম্যান বলে, ‘ভবিষ্যতে কী করতে হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্তকেই পরিকল্পনা বলে। মোটকথা প্রতিষ্ঠানের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত ভবিষ্যৎ নকশাকে পরিকল্পনা বলে।’

২। সংগঠন (Organization): পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপরিহার্য উপাদান হলো সংগঠন। পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংগৃহীত উপাদান ও জনশক্তির সুশৃঙ্খল বিন্যাসকে সংগঠন বলে। সংগঠন হচ্ছে একটি কাঠামো বিশেষ। যেখানে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করে দেওয়া হয়। এতে কর্মীরা সহজেই প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে।

৩। কর্মীসংস্থান (Staffing): সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণের পর ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হলো বিভিন্ন স্তরে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী জোগাড় এবং তাদের যথাযথভাবে নিয়োগ দান করা। সুতরাং সাংগঠনিক কাঠামোতে মানব শক্তির অভাব পূরণের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে কর্মীসংস্থান বলে।

৪। নির্দেশনা (Direction) : প্রাতিষ্ঠানিক গতিশীলতা ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মীদেরকে যে আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করা হয় তাকে নির্দেশনা বলে। নির্দেশনা প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। তাই একে প্রশাসনের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

৫। প্রে্ষণা (Motivation) : প্রে্ষণা ব্যবস্থাপনার একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক। যে প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপক শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতি আকৃষ্ট, আগ্রহী এবং উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে থাকেন, তাকে প্রে্ষণা বলা হয়। এর মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে কাজ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। মাইকেল জুসিয়াস-এর মতে, ‘প্রে্ষণা হলো ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সেই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ যা কর্মীদেরকে নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে।’

৬। সমন্বয় সাধন (Co-ordination): প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভাগ, উপকরণ ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াই হলো সমন্বয় সাধন। সমন্বয় সাধন দলগত সমঝোতার একটি মাধ্যম। সমন্বয় সাধনের ফলে সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অসামঞ্জস্য দূর হয় এবং সকলে একযোগে ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়।

৭। নিয়ন্ত্রণ (Controlling): নিয়ন্ত্রণ হলো ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কাজ। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে যথাস্থানে সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো নিয়ন্ত্রণ। হেনরি ফেয়ল-এর মতে, ‘নিয়ন্ত্রণ হলো গৃহীত পরিকল্পনা, জারিকৃত নির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।’

(খ) ব্যবস্থাপনার গৌণ কার্যাবলি

১। **উদ্ভাবন (Innovation):** ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি সৃজনশীল কাজ। নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখে।

২। **উপস্থাপন (Representation):** ব্যবস্থাপনাকে বাইরের বিভিন্ন অর্থসংস্থা, সরকার শ্রমিক সংঘ, শিল্প ও বণিক সংস্থা এবং বহির্বিষয়ের সামনে কারবারকে উপস্থাপন করতে হয়। ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তর হতে শুরু করে নিম্নস্তর পর্যন্ত সকলকেই নিজেদের গভীর মধ্যে থেকে কারবারকে উপস্থাপন করতে পারেন।

৩। **যোগাযোগ (Communication):** অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ যোগাযোগকে ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গণ্য করেছেন। যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনা একে অপরের পরিপূরক। যোগাযোগ ছাড়া ব্যবস্থাপনার কার্য সম্পাদন অসম্ভব।

৪। **বাজেট প্রণয়ন (Budgeting):** ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে সম্পাদিত কাজের রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হয়। রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজের মূল্যায়ন ও ফলাফল পরিমাপ করা যায়।

৫। **রিপোর্ট প্রণয়ন (Reporting):** বাজেট হলো পরিকল্পনার সংখ্যা ভিত্তিক প্রকাশ। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা ব্যবস্থাপনারই কাজ।

ব্যবস্থাপনার উপরোল্লিখিত কার্যাবলি পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ও পরিপূরক। এরা নিরবচ্ছিন্নভাবে চক্রাকারে অবর্তিত হয়। এ কারণেই অনেকে ব্যবস্থাপনাকে একটি অবিরাম ও ঘূর্ণায়মান চক্র বলে অভিহিত করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক এমন একটি নিরবচ্ছিন্ন কার্য চক্র বা প্রক্রিয়া যা উপরোক্ত কার্যাবলির সমন্বয়ে সৃষ্ট। যা একে অপরের পরিপূরক এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সম্পন্ন হয়।

৬.২ উৎপাদন, বাজারজাত ও কর্মী ব্যবস্থাপনা

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা (Production Management)

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হচ্ছে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা এ শব্দ দুটো নিয়ে গঠিত একটি যুগ্ম শব্দ। উৎপাদন অর্থ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামালকে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত করা। পক্ষান্তরে সর্বাধিক দক্ষতার সাথে কাজীকৃত লক্ষ্য অর্জনের অপরাপর লোকের মাধ্যমে কার্য-সম্পাদন করে নেওয়ার কলা ও বিজ্ঞানই হলো ব্যবস্থাপনা।

সাধারণ অর্থে উৎপাদন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে কাঁচামালকে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত করার সমুদয় প্রক্রিয়ায় প্রয়োগকৃত পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সংবলিত সামগ্রিক কার্যক্রম হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা।

নিম্নে উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

- ১। জে. আর. হিক্স (J.R. Hicks)-এর মতে, 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হলো বিনিময়ের মাধ্যমে অন্য লোকের সম্ভাব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত যে কোনো কার্যক্রম।'
- ২। ই. এস. বাফা (E.S Buffa)-এর মতে, 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টি করা হয়।'
- ৩। কেরান ক্রস (Cairn Cross)-এর মতে, 'বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যাদি তৈরি বা পরিশ্রমের বিনিময়ে পরিচালিত কার্যাবলিকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বলে।'
- ৪। ইউলিয়াম ভরিস (Willum Varis)-এর মতে, 'উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সেই সব কার্যাবলির নেতৃত্বকে বোঝায় যেগুলো সরাসরি পণ্য সৃষ্টির সাথে জড়িত। যেমন-পণ্যের নকশা, প্যাকিং ও বন্টনের জন্য প্রস্তুতকরণ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পরিব্যাপ্ত।'
- ৫। ই. এফ. এল. ব্রেচ (E.F.L. Brech)-এর মতে, 'কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের যে অংশ কাঁচামালকে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত তার ক্রিয়াকলাপের কার্যকর পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বলা হয়।'

পরিশেষে বলা যায়, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামালকে দক্ষ ও ফলপ্রসূ কৌশলের মাধ্যমে তৈরি পণ্যে রূপান্তর করা যায়। কোনো উৎপাদনমুখী ব্যবসার ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা একটি অপরিহার্য কাজ। আমরা যে সমস্ত পণ্য দেখতে পাই এগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তৈরি করা হচ্ছে। যেমন-যে বলপেন দিয়ে আমরা লিখি সেটা একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। এ বলপেনটি তৈরি করতে কাঁচামাল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের জিনিস ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ একে এই অবস্থায় পরিণত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রব্যটির রূপান্তর ঘটতে হয়েছে। কাজিষ্ঠ দ্রব্য পরিণত করার জন্য রূপান্তরের প্রক্রিয়া সুষ্ঠু হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা যায়।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কয়েকটি কার্যাবলির সমন্বয়ে গঠিত। যেমন-

- ১। উৎপাদন পরিকল্পনা
- ২। মজুতমাল নিয়ন্ত্রণ
- ৩। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ।

১। উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning)

উৎপাদন পরিকল্পনা বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ অগ্রিম নির্ধারণকে বোঝায়।

প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত পণ্যের ডিজাইন, কাঁচামাল যন্ত্রপাতি, জনশক্তি ও কার্যপদ্ধতি ইত্যাদির পূর্বনির্দেশনাই উৎপাদন পরিকল্পনা।

নিম্নে উৎপাদন পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

- ১। কে. কে. আহুজা (K.K Ahuja)-এর মতে, ‘কখন, কোথায়, কীভাবে এবং কার দ্বারা কার্য সম্পাদন করা হবে তা নির্ধারণ করাকে উৎপাদন পরিকল্পনা বলে।’
- ২। ই.এস.বাফা (E.S. Buffa)-এর মতে, ‘যে সামগ্রিক তালিকার মাধ্যমে উৎপাদনের সামগ্রিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় তাকে উৎপাদন পরিকল্পনা বলে।’
- ৩। গ্যারেট এবং সিলভার (Garret and silver)-এর মতে, ‘পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করাকে উৎপাদন পরিকল্পনা বলে।’

একটি উদাহরণ দিয়ে এই উৎপাদন পরিকল্পনা বোঝানো যেতে পারে— বাসায় বিকেলের নাস্তা তৈরি করার সময় আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে আমরা কি তৈরি করতে যাচ্ছি। ধরা যাক তৈরি পণ্যটি বিস্কুট। পণ্য সম্পর্কে ধারণার পর আমাদের চিন্তা করতে হবে বিস্কুট তৈরি করতে কী কী কাঁচামাল প্রয়োজন। ধরে নেই বিস্কুট তৈরি করতে ময়দা, চিনি, ডালডা, বিভিন্ন মসলা, রং ইত্যাদি জোগানোর পরিকল্পনা থাকতে হবে। কীভাবে এবং কোথা থেকে উক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যায় তা চিহ্নিত করতে হবে। কোন পদ্ধতিতে তৈরি করলে আমরা সুস্বাদু বিস্কুট পাব সেই পদ্ধতিটি অবশ্যই ঠিক করতে হবে।

উপরোক্ত সকল বিষয় পরিকল্পনার পর যদি বিস্কুট উৎপাদন শুরু করা যায় তবেই একটি সুন্দর উৎপাদিত পণ্য আশা করতে পারি।

২। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control)

উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণের পর এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এই উৎপাদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করা। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা এবং এই দুইয়ের ব্যবধান থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করা। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কখনই বোঝা যাবে না যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনো ভুল আছে কি না বা উৎপাদন কমে যাচ্ছে কিনা ইত্যাদি। তাই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩। মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (Inventory Control Management)

প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল মজুত করতে হয়। মজুত করার পর প্রধান কারণ হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বিক্রয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। যখন প্রচুর পরিমাণ কাঁচামালের প্রয়োজন হয় তখন এর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়ে। নিম্নে মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ কী তা উল্লেখ করা হলো:

কোনো প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় মালের সমাবেশ যাতে না ঘটে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাম্য মজুত সংরক্ষণ নিশ্চিত করার নামই মজুত কাল নিয়ন্ত্রণ।

সাধারণ অর্থে: মজুত কালের কাম্যস্তর বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করাকে মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ বলে।

ব্যাপক অর্থে: উৎপাদনের বিভিন্ন কাঁচামাল বা দ্রব্যসমূহ যাতে বেশি দিন অলসভাবে পড়ে না থাকে বা উৎপাদিত পণ্য যাতে দীর্ঘদিন বিক্রয়ের অপেক্ষায় পড়ে না থাকে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাই মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ।

(i) এল.এন. আগরওয়াল এবং কে.সি.জৈন (L.N. Agarwal & KC Jain) এর মতে, 'মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা বা সর্বনিম্ন মূলধন বিনিয়োগে প্রয়োজনীয় মানের প্রয়োজনীয় পরিমাণে মজুতের সংস্থান নিশ্চিত করে।' (Inventory control is a system which ensure the provision of the require quality of inventories of required quality at the required time with the minimum amount of capital investment.

(ii) রবার্ট ক্রেইটনার Robert Kreitner)-এর মতে, 'মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে দ্রব্যের সংরক্ষিত মজুতের যথোপযুক্ত স্তর প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার একটি প্রক্রিয়া।' (Inventory control is the process of establishment and maintaining appropriate levels of reserve stock of goods.)

(iii) আর. আর.মেয়ার (R.R. Mayer)-এর মতে, 'মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা বুঝি যে, প্রতিষ্ঠান কোনো স্তরে মিতব্যয়িতার সাথে মজুত সংরক্ষণ করতে পারবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।'।

(iv) আমেরিকান উৎপাদন এবং মজুদ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (Apics)-এর মতে, 'আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দ্রব্যের মজুত সংরক্ষণের কৌশলকে মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ বলে।'।

উপরোক্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কাম্য মজুত সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

৪। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (Quality control)

ব্যবসা থেকে মুনাফা অর্জন করার পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্নতমানের পণ্য বাজারে সরবরাহ করা। তাছাড়া দীর্ঘদিন ব্যবসায় টিকে থাকার জন্যও উন্নতমানের পণ্য বাজারজাত করতে হবে। এখানে উন্নতমানের পণ্য বলতে যে পণ্য ক্রেতার নজরে ভালো তাই উন্নতমানের পণ্য।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনার আর একটি কাজ হচ্ছে পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা। সাধারণত আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেই পণ্যের একটি মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ থাকে। এ বিভাগের কাজ হলো কীভাবে উন্নত মানের পণ্য তৈরি করা যায়। ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রতিদিন কিছুক্ষণ পরপর উৎপাদিত পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পণ্যটির মান নিশ্চিত হওয়ার পর বাজারজাত করা উচিত। যেমন- মনু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রির মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ প্রতিটি প্লেট, কাপ, বাটি, শোপিচ প্রভৃতির মান ঠিক আছে কিনা, রং ঠিক আছে কিনা, ডিজাইন ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানসম্মত পণ্যগুলো বাজারজাত করার জন্য সরবরাহ করা হয়।

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management)

কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিকল্পনার জন্য একজন ব্যবসা উদ্যোক্তার কাছে অর্থের প্রয়োজন সবার আগে। ব্যবসায়ে অর্থের ভূমিকা মানবদেহের রক্তের ন্যায়। কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই সংগ্রহ এবং প্রয়োগজনিত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে সহজ অর্থে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে। সংক্ষেপে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে।

ব্যাপক অর্থে অর্থ সম্পর্কিত কার্যাবলি যথা- আর্থিক পরিকল্পনা, অর্থসংস্থান, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা অর্জন ও বিতরণ প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়াই আর্থিক ব্যবস্থাপনা। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ, অর্থ সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজ।

নিম্নে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। জোসেফ ব্রাডলি (Joseph Bradley)-এর মতে, ‘আর্থিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সে অংশ যা একটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে পুঁজির ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার ও সুনিশ্চিত উপায়ে সংগ্রহের বিভিন্ন উৎসগুলো নির্ধারণ।’

Guth man & Dougall-এর মতে, ব্যবসায় ব্যবহৃত তহবিলের পরিকল্পনা, সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলিকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলে।

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা হলো, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যের আলোকে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা এবং সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু বিনিয়োগ করা।

ব্যবসায়ের অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। যেমন-

১। নগদান বাজেটিং (Cash Budgeting) : আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি কাজ হলো নগদ বাজেটিং। নগদ বাজেটিং আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটি ব্যবসায়ের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নগদ প্রাপ্তি ও নগদ পরিশোধের পূর্বানুমানকে নগদান বাজেটিং বলে।

ব্যাপক অর্থে নগদ বাজেট বলতে একটি বাজেটীয় সময়সীমার কত টাকার লেনদেন হবে তার একটি পূর্ব নির্ধারিত বিবরণীকে বোঝায়।

Glane A welsch-এর মতে, ‘নগদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের বিবরণই নগদ বাজেট।’

ভবিষ্যতে ব্যবসা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কী পরিমাণ নগদ টাকার প্রয়োজন এবং কতটুকু ব্যবসা থেকে জোগান দেওয়া যেতে পারে এবং কতটুকু বাইরে থেকে সংগ্রহ করা প্রয়োজ্য তা নগদ বাজেটের মাধ্যমে জানা যায়।

সমচ্ছেদ বিন্দুর সংজ্ঞা

Definition of Break-even point

সমচ্ছেদ বা আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ বিশ্লেষণ ব্যবসার মুনাফা অর্জন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এটা আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের একটি পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

সমচ্ছেদ বিন্দু বলতে সেই বিন্দুকে বোঝায় যে বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয়। অর্থাৎ এটি এমন একটি বিন্দু যেখানে মোট খরচের পরিমাণ ও মোট বিক্রয়ের পরিমাণ সমান হয়। উক্ত বিন্দুতে লাভও হয় না আবার লোকসানও হয় না, মুনাফার পরিমাণ শূন্য হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমচ্ছেদ বিন্দু হচ্ছে উৎপাদন বা বিক্রয় মাত্রার এমন একটি অবস্থান, যেখানে প্রতিষ্ঠানের লাভ বা লোকসান কোনোটাই হয় না। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, মোট ব্যয় রেখা ও মোট বিক্রয় রেখা যে বিন্দুতে পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করে তাকে সমচ্ছেদ বিন্দু বলে।

সমচ্ছেদ বিশ্লেষণের গুরুত্ব

Importance of Break-even Analysis

কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা পরিকল্পনায় সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ একটি কার্যকর বহুল ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রণ কৌশল। নিম্নে সংক্ষেপে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

- ১। সমচ্ছেদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করলে প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে তা সহজে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে।
- ২। সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ বিক্রয়ের এমন একটি মাত্রা নির্দেশ করে যার নিচে বিক্রয় বা আয় হলে প্রতিষ্ঠান লোকসানের আওতায় পড়বে। ফলে এ ব্যবস্থা হতে প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে ব্যবস্থাপক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।
- ৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয় ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ৪। প্রতিষ্ঠানে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েও সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ কার্যকর ভূমিকা রাখে। সমচ্ছেদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন মূল্যে প্রাপ্তিক মুনাফা, প্রাপ্তিক ব্যয়, বিক্রয় মাত্রা, মোট মুনাফা, মোট ব্যয় ইত্যাদি নির্ণয় করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য পণ্যের যথার্থ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।
- ৫। প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্যসামগ্রী বা পণ্যাংশসমূহ, নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুত করা হবে, নাকি বাইরের কোনো সরবরাহকারীর কাছ থেকে ক্রয় করা হবে কিংবা পুরাতন কোনো যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে কিনা এ জাতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা দান করে থাকে।

সমছেদ তালিকা বা সারণ প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি

Method of Preparing Break-even Chart

সমছেদ বিন্দু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনো স্তরে কতটুকু উৎপাদন করলে প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান কিছুই হবে না তা নির্ণয়ের জন্য তালিকা বা সারণি প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা যায়। এতে বিভিন্ন পর্যায়ে কী পরিমাণ উৎপাদন, বিক্রয় এবং মোট ব্যয় কত হলে কী পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হবে তা সুস্পষ্টভাবে এ তালিকা বা সারণিতে উপস্থাপন করা হয়।

মনে করি কোনো প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন উৎপাদনের পরিমাণ ২০০০ একক পণ্য এবং সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮০০০ একক পণ্য। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী খরচ ২০,০০০ টাকা, প্রতি একক পণ্যের বিক্রয় মূল্য ১০ টাকা এবং প্রতি এককে চলমান পরিবর্তনশীল খরচ ৫ টাকা।

উপরোক্ত তথ্যের মাধ্যমে নিম্নের তালিকায় সমছেদ বিন্দু প্রদর্শন করা হলো:

উৎপাদনের একক	মোট বিক্রয় মূল্য (প্রতি একক ১০ টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল খরচ (প্রতি একক ৫ টাকা)	মোট স্থায়ী খরচ ২০,০০০ টাকা	মোট ব্যয় টাকা	লাভ ক্ষতি টাকায়
২০০০	২০,০০০	১০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	১০,০০০ (ক্ষতি)
৪০০০	৪০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	৪০,০০০	লাভ/লোকসান সমছেদ বিন্দু কিছুই নাই
৬০০০	৬০,০০০	৩০,০০০	২০,০০০	৫০,০০০	১০,০০০ (লাভ)
৮০০০	৮০,০০০	৪০,০০০	২০,০০০	৬০,০০০	২০,০০০ (লাভ)

উপরোক্ত তালিকায় পরিলক্ষিত হয় যে, ৪,০০০ একক পণ্য উৎপাদন করলে মোট ব্যয় হয় ৪০,০০০ টাকা এবং মোট বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় ৪০,০০০ টাকা অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না। অতএব, সমছেদ বিন্দু হলো ৪০০০ একক পণ্য। সমছেদ বিন্দুর চেয়ে বেশি পণ্য উৎপাদন করলেই প্রতিষ্ঠানের লাভ হবে এবং সমছেদ বিন্দুর চেয়ে কম উৎপাদন করলে লোকসান হবে।

সমছেদ চার্ট বা রৈখিক চিত্র অঙ্কন প্রণালি

Drawing Method of Break-even Chart

সমছেদ চার্ট বা রৈখিক চিত্র অঙ্কনের জন্য সর্বপ্রথম দুটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্যের প্রয়োজন হয়।

(ক) বিক্রয়ের পরিমাণ

(খ) স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ব্যয়।

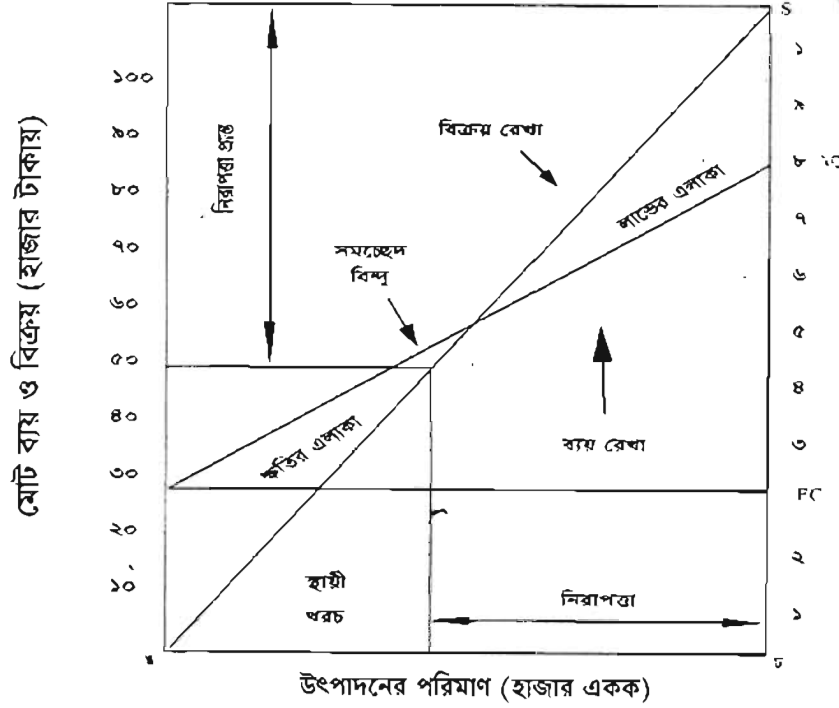
নিম্নে সমছেদ চার্ট বা রৈখিক চিত্র অঙ্কন প্রণালি উল্লেখ করা হলো:

- ১। লেখচিত্রে প্রথমেই একটি অনুভূমিক বা সমতল অক্ষরেখা X টানা হয়। X অক্ষে কার্যমাত্রায় উৎপাদনের একক দেখানো হয়।
- ২। X অক্ষের বাম প্রান্তে ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্দেশক অক্ষ রেখা Y উল্লম্বভাবে টানা হয়।
- ৩। X অক্ষ বা অনুভূমি রেখার নির্দিষ্ট দূরত্বকে নির্দিষ্ট কার্যমাত্রা বোঝানোর জন্য রেখাটিকে সুবিধামতো সমদূরত্ব বিশিষ্ট এক একটি ভাগে ভাগ করা হয়।
- ৪। X অক্ষ বা উল্লম্ব রেখাটিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় বা বিক্রয়মূল্য বোঝানোর জন্য সুবিধামতো সমদূরত্ব বিশিষ্ট এক একটি ভাগে ভাগ করা হয়।
- ৫। X অক্ষের ডান প্রান্তে Y অক্ষের সমরূপ একটি উল্লম্ব রেখা টানা হয়।
- ৬। Y অক্ষের যে বিন্দুতে স্থায়ী ব্যয় রেখা নির্দেশ করে উক্ত বিন্দু হতে X অক্ষের সমান্তরাল করে অক্ষের ডান প্রান্ত পর্যন্ত একটি সরলরেখা টানা হয়। একে স্থায়ী খরচ রেখা (Fixed cost line) বলা হয়।
- ৭। Y অক্ষের যে প্রান্ত হতে স্থায়ী খরচ রেখা টানা হয়েছে উক্ত বিন্দুতে X অক্ষের ডান প্রান্তের উল্লম্ব রেখার মোট ব্যয় নির্দেশক বিন্দু পর্যন্ত একটি সরল রেখা টানা হয়। একে মোট ব্যয় রেখা বলা হয়।
- ৮। চিত্রের বাম প্রান্তে 'O' শূন্য বিন্দু হতে X অক্ষের ডান প্রান্তে উল্লম্ব রেখার নির্ধারিত কার্যমাত্রার বিক্রয়মূল্য নির্দেশক বিন্দু পর্যন্ত একটি সরল রেখা টানা হয়। একে মোট বিক্রয় রেখা বলা হয়।
- ৯। মোট ব্যয় ও মোট বিক্রয় রেখা যে বিন্দুতে পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করবে সেটাই হবে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বা সমছেদ বিন্দু।
- ১০। সমছেদ বিন্দুর বামে এবং মোট ব্যয় রেখা ও বিক্রয় রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ক্ষতি বা লোকসান এলাকা (Loss Area) বলা হয় এবং সমছেদ বিন্দুর ডানে মোট ব্যয় রেখা ও বিক্রয় রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে মুনাফার এলাকা (Profit Area) বলা হয়ে থাকে।
- ১১। সমছেদ বিন্দু হতে নির্ধারিত বিক্রয় মাত্রা পর্যন্ত দূরত্বকে নিরাপত্তা প্রান্ত (Margin of safety) বলা হয়ে থাকে।

লেখচিত্রের মাধ্যম সমছেদ বিন্দু নির্ণয় পদ্ধতি

Identification of Break Even Point by Graph

নিম্নে লেখচিত্রের সাহায্যে সমছেদ বিন্দু দেখানো হল :



উপরের চিত্রের OX অক্ষের প্রতি ঘরকে উৎপাদনের ১,০০০ একক এবং OY অক্ষের প্রতি ঘরকে ১০,০০০ টাকা হিসেবে মোট ব্যয় ও মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এছাড়া FC রেখাকে মোট স্থায়ী ব্যয় VC রেখাকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা এবং OS রেখায় মোট বিক্রয় মূল্য দেখানো হয়েছে।

চিত্রে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যখন উৎপাদন শূন্য থাকে তখন কোনো পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় না। কিন্তু উৎপাদন যখন ৪,০০০ একক করা হয় তখন পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় ২০,০০০ টাকা এবং স্থায়ী খরচ হয় ২০,০০০ টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয় হয় ৪০,০০০ টাকা। যখন মোট ব্যয় ৪০,০০০ টাকা তখন বিক্রয়লব্ধ অর্থও ৪০,০০০ টাকা। এই উৎপাদন বিন্দুই হলো সমছেদ বিন্দু (Break-even point)। কারণ এ বিন্দুতে মোট বিক্রয় রেখা মোট ব্যয় রেখাকে ছেদ করেছে। সমছেদ বিন্দুতে কোনো প্রতিষ্ঠানের লাভ বা লোকসান কিছুই হয় না। অতএব ব্যবসায়ীকে লাভ করতে হলে অবশ্যই সমছেদ বিন্দুর চেয়ে বেশি উৎপাদন করতে হবে। মোট কথা সমছেদ বিন্দুর চেয়ে যত বেশি উৎপাদন করবে ততই প্রতিষ্ঠানের লাভ হতে থাকবে।

বীজগাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে সমছেদ বিন্দু নির্ণয় পদ্ধতি

Justification of Break Even Point by Algebra Formula

প্রতি ইউনিটের দস্তাংশ (contribution) এবং মোট দস্তাংশের সাহায্যে সমছেদ বিন্দু বের করা যায়। সমছেদ বিন্দুতে দস্তাংশ উপরি খরচের সমান হয়। সমছেদ বিন্দু নিম্নলিখিত ফর্মুলার সাহায্যে বের করা যায়।

$$১। \text{ সমছেদ বিন্দু (টাকার অংকে)} = 1 - \frac{\frac{F}{V}}{S}$$

যেখানে F = স্থায়ী খরচ (Fixed cost)

S = প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য (Selling price per unit)

V = পরিবর্তনশীল খরচ (Variable cost per unit)

২। সমছেদ বিন্দু (ইউনিট)

$$\text{BEP (Units)} = \frac{\text{মোট স্থায়ী খরচ}}{\text{ইউনিট দত্তাংশ}} \times \left(\frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Unit Contribution}} \right)$$

$$\text{অথবা সমছেদ বিন্দু ইউচ} = \frac{\text{স্থায়ী খরচ}}{\text{বিক্রয় মূল্য-পরিবর্তনশীল খরচ}}$$

৩। BDP (টাকার অংকে)

$$\begin{aligned} & \frac{\text{মোট স্থায়ী খরচ}}{\text{ইউনিট দত্তাংশ}} \times \text{ইউনিট বিক্রয়মূল্য} \\ &= \left(\frac{\text{Total Fixed Cost} \times \text{Selling Price}}{\text{Unit Contribution}} \right) \end{aligned}$$

উদাহরণ-১ : রহিম এন্ড কোং-এর নিম্নলিখিত তথ্যাদি হতে সমছেদ বিন্দু নির্ণয় কর:

পরিবর্তনশীল ব্যয় (প্রতি একক) = ১২.০০ টাকা

স্থায়ী খরচ = ৬০,০০০.০০ টাকা

বিক্রয় মূল্য (প্রতি একক) ১৮.০০ টাকা

সমাধান:

$$\begin{aligned} \text{সমছেদ বিন্দু (BEP)} &= \frac{F}{S - V} = \frac{৬০০০০}{১৮ - ১২} \\ &= \frac{৬০০০০}{৬} \\ &= ১০,০০০ \text{ একক।} \end{aligned}$$

উদাহরণ-২: আলম এন্ড কোং এর পণ্য উৎপাদনের স্থায়ী খরচ ৫০,০০০০.০০ টাকা, প্রতি একক পণ্যের বিক্রয় মূল্য ৩০.০০ টাকা এবং প্রতি একক পণ্যের পরিবর্তনশীল খরচ ২৬.০০ টাকা। বীজগাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে ব্রেক ইভেন বিন্দু (BDP) নির্ণয় কর।

সমাধান:

$$\begin{aligned} BDP &= \frac{F}{S - V} = \frac{৫০০০০}{৩০ - ২৬} \\ &= \frac{৫০০০০}{৪} \\ &= ১২,৫০০ \text{ একক পণ্য।} \end{aligned}$$

উদাহরণ-৩: শামীম এন্ড কোং এর বাৎসরিক স্থায়ী খরচ ৪০,০০০ টাকা। একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ ২ টাকা। কোনো সময়কাল প্রাক্কলিত বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা এবং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও প্রাক্কলিত উৎপাদনের সমান। প্রতি ইউনিট পণ্যের বিক্রয় মূল্য ১০ টাকা হলে সমছেদ বিন্দু নির্ণয় কর।

সমাধান:

নিম্নোক্ত ফর্মুলা ব্যবহার করে সমছেদ বিন্দু নির্ণয় করা যায়।

$$F = \text{স্থায়ী খরচ} = ৪০,০০০ \text{ টাকা}$$

$$BDP = \frac{F}{S - V} \quad S = \text{প্রতি ইউনিটের বিক্রয় মূল্য} = ১০ \text{ টাকা}$$

$$V = \text{ইউনিট প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ} = ২ \text{ টাকা}$$

$$\begin{aligned} BEP &= \frac{৪০০০০}{১ - \frac{২}{১০}} = \frac{৪০০০০}{১ - \frac{১}{৫}} = \frac{৪০০০০}{\frac{৪}{৫}} = \frac{৪০০০০ \times ৫}{৪} \\ &= \frac{২০০০০০}{৪} \\ &= ৫০,০০০ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

অনুপাত বিশ্লেষণ :

অনুপাত বিশ্লেষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার আর একটি হাতিয়ার। দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে সংখ্যাাত্মক সম্বন্ধকে অনুপাত বলে। অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসায় বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

Prof Khan and Jain-এর মতে, ‘অনুপাত বিশ্লেষণ হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অনুপাতের ব্যবহার, যার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা করে একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা, দুর্বলতা, ঐতিহাসিক কার্যাবলি ও চলতি আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায়।’

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দায়ের অনুপাত ২:১। এই অনুপাত থেকে বোঝা যায় যে, উক্ত ব্যবসায়ের দায়ের ভাগের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ দ্বিগুণ রয়েছে। অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তার প্রকল্প পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারে এবং প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার চলক ও কৌশল রচনা করে সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ করার আরো কিছু অনুপাত রয়েছে যেমন- চলতি অনুপাত, মোট মুনাফা অনুপাত ঋণ মালিকানা অনুপাত ইত্যাদি।

$$\text{চলতি অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$$

এই অনুপাত চলতি দায়ের কতগুণ চলতি সম্পদ দিয়ে মেটানো সম্ভব তা নির্ণয় করে। এই অনুপাত যত বড় হবে ব্যবসার তারল্য তত ভালো অবস্থা।

$$\text{ঋণ-মালিকানা অনুপাত} = \frac{\text{দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ}}{\text{মালিকদের বিনিয়োগ}}$$

এই অনুপাত দিয়ে ব্যবসার মোট মূলধনের কত অংশ দীর্ঘমেয়াদি ঋণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা পরিমাপ করা যায়।

বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা (Marketing Management): ব্যবসায় সাফল্য অর্জনে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম। উৎপাদিত পণ্যেও বাজারজাতকরণের উপরই ব্যবসার সাফল্য অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব অনেকটা নির্ভরশীল। আধুনিক বাজারজাতকরণ একটি অত্যন্ত গতিশীল ক্ষেত্র।

সাধারণ অর্থে বাজারজাতকরণের সামগ্রিক কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ সম্পর্কিত ধারণাই বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা।

ব্যাপক অর্থে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ভোক্তার কাছে সন্তোষজনকভাবে এবং সময়মতো পৌঁছে দেওয়ার কলাকৌশলকেই বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা বলে।

নিম্নে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। ফিলিপ-কটলারের মতে, সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে বাজারের সাথে কল্যাণকর বিনিময় সৃষ্টি করা, গঠন করা ও বজায় রাখার অভিপ্রায়ে কর্মসূচির বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণই হলো বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা।

২। আমেরিকার মার্কেটিং এসোসিয়েশন-এর মতে, ‘বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা হলো একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ণয়, মান উন্নয়ন, প্রযুক্তি বিনিময়ের কাজ সম্পাদন করা হয়।’

বর্তমানে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় বাণিজ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমনকি সেবামূলক সংগঠনগুলোতেও বাজারজাতকরণ কর্মকাণ্ডে বেশ জোর দিচ্ছে। যেমন-মীনা কার্টুন ছবির মাধ্যমে জনগণকে ডায়রিয়া ও আর্সেনিক সম্পর্কে সচেতন করা।

বাজার সমীক্ষা (Marketing Survey)

বাজার সমীক্ষা পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। কোনো একটি পণ্য বাজারজাতকরণের সময় পণ্যের প্রকৃত ভোক্তাদের চিহ্নিত করতে হবে। এর উপর বাজারজাতকরণের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রকৃত ভোক্তা চিহ্নিতকরণের জন্য বাজার সমীক্ষা প্রয়োজন রয়েছে।

বাজার সমীক্ষা বলতে এমন একটি অনুসন্ধান কার্যক্রমকে বোঝায় যা দ্বারা দ্রব্য বা সেবার চাহিদা, ভোক্তাদের আচার-আচরণ, প্রতিযোগীদের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পণ্যের চাহিদা ধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা সম্পর্কে জানা যায়। ব্যবসা উদ্যোক্তা নিজে বা বিশেষজ্ঞের দ্বারা বাজার সমীক্ষা পরিচালনা করতে পারে।

পণ্যের বণ্টন প্রণালি (Distribution System)

পণ্যের বণ্টন প্রণালি বাজারজাতকরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে প্রণালিতে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বা সেবা চূড়ান্ত ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয় তাকে বণ্টন প্রণালি বলে।

ফিলিপ কটলারের মতে, ‘উৎপাদকের নিকট হতে পণ্য বা সেবা হস্তান্তরে নিয়োজিত ফার্ম বা ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা বা সেবার অধিকার হস্তান্তরের প্রণালিকে পণ্যের বণ্টন প্রণালি বলে।’

যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্য ভোক্তাদের নিকট না পৌঁছে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক এবং ভোক্তাদের কারো উদ্দেশ্য সফল হবে না। মোট কথা পণ্যের বণ্টন প্রণালি উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে যোগ স্থাপন করে এবং দ্রব্যের মালিকানা হস্তান্তরকে নির্দেশ করে।

পণ্য উৎপাদনের প্রকৃত ভোক্তাদের হাতে পৌঁছানোর বণ্টন প্রণালি নিম্নরূপ;

- ১। উৎপাদক -ভোক্তা
- ২। উৎপাদক- খুচরা ব্যবসায়ী-ভোক্তা
- ৩। উৎপাদক- পাইকারি ব্যবসায়ী- খুচরা ব্যবসায়ী-ভোক্তা
- ৪। উৎপাদক-এজেন্ট/প্রতিনিধি- পাইকারি ব্যবসায়ী- খুচরা ব্যবসায়ী-ভোক্তা।

বিক্রয় উন্নয়ন/প্রসার (Sales Promotion)

প্রত্যেক ব্যবসায়ী চায় তার পণ্য বা সেবা বিক্রির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাক। কিন্তু বিক্রয় বৃদ্ধির প্রসার আপনাআপনি হয় না। সেজন্য প্রয়োজন বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অধিক পরিমাণ পণ্য

বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ে প্রলুব্ধ করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে বিক্রয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলে।

নিম্নে বিক্রয় উন্নয়ন/প্রসারের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। ফিলিপ কটলারের মতে, ‘বিক্রয় প্রসার হলো পণ্য বা সেবা ক্রয় অথবা বিক্রয়ে উৎসাহিত করার স্বল্পকালীন উদ্দীপনা।’

২। আমেরিকার মার্কেটিং এসোসিয়েশন-এর মতে, ‘বিক্রয় প্রসার হচ্ছে ঐ সমস্ত কার্যাবলি যা ব্যক্তিক বিক্রয়, বিজ্ঞাপন এবং প্রচার ব্যতীত ভোক্তাদের ক্রয় ও ডিলারদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।’

বিক্রয় প্রসারের উপায়গুলোর মধ্যে বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, প্রচারপত্র, মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা।

আমরা প্রতিদিন টেলিভিশনে যেমন- কেয়া কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখি যার মাধ্যমে কোম্পানি কেয়া সাবান কেনার জন্য ক্রেতাদের উদ্বুদ্ধ করে। বিক্রয় উন্নয়ন/প্রসারের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তা তৈরি এবং প্রচার করতে অনেক টাকা খরচ হয়। প্রশ্ন আসতে পারে তবু কেন এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। কারণ প্রত্যেক উৎপাদনকারী মনে করেন যে, বিজ্ঞাপনের কারণে মোট বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে এবং এই বৃদ্ধির কারণে বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ ছাড়াও আরো মুনাফা অর্জিত হবে।

কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personal Management)

কর্মী ব্যবস্থাপনা হলো সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মুখ্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সে অংশ যা শ্রমিক কর্মীসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নিম্নে শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। জি.আর. টেরি (G.R. Terry)-এর মতে, ‘একটি সন্তোষজনক ও সন্তুষ্ট কর্মী বাহিনী সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণই হচ্ছে শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা।’

২। ই.এফ.এল ব্রিচ (E.F.L. Brech)-এর মতে, ‘কর্মী ব্যবস্থাপনা হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার ঐ অংশ যা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মানবিক দিক নিয়ে কাজ করে।’

৩। ডেল ওডার (Dale Yoder)-এর মতে, ‘ব্যবস্থাপনার যে বিভাগ প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে তাকে শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনা বলে।’

৪। লরেন্স অ্যাপলি এর মতে, ‘কর্মী ব্যবস্থাপনা হলো কর্মীদের গুণগত মান উন্নয়ন করা, তাদের সম্ভাব্য কর্মযোগ্যতাকে উদ্দীপ্ত করা এবং সার্বিকভাবে তাদের মাঝে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা।’

পরিশেষে বলা যায়, কর্মী ব্যবস্থাপনা বলতে এমন একটি কৌশলকে বোঝায় যা দ্বারা একটি দক্ষজনশক্তি সংগ্রহ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে উক্ত সংগঠনের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে মিতব্যয়িতা ও অধিক কর্ম তৎপরতা সৃষ্টি হয়।

কর্মী পরিকল্পনা (Planning of Employ): একটি ব্যবসার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কত সংখ্যক কর্মী প্রয়োজন তা নির্বাচন, নিয়োগ, উন্নয়ন পারিশ্রমিক প্রভৃতি পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়াকেই কর্মী পরিকল্পনা বলে। ব্যবসার ধরন, প্রকৃতি ও আয়তনের উপর কর্মী-সংখ্যা নির্ভর করে। যেমন একটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয়। অপরদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া যত্নপাতি চালিত হলে সেখানে কম সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয়। কর্মীর পারিশ্রমিক কীভাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পারিশ্রমিক দেওয়া হবে তা আগেই নির্ধারণ করা হয়, যা কর্মী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কর্মী সংগ্রহ (Source of Employ): ব্যবসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী সংগ্রহ করা কর্মী ব্যবস্থাপনার পরবর্তী কাজ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং কীভাবে সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণপূর্বক কর্মী সংগ্রহ করা হয়। কর্মী সংগ্রহের পূর্বে কোন পদে কতজন লোক নেওয়া হবে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং উক্ত পদের জন্য কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে। চিহ্নিত করার পরই কর্মী সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।

কর্মী সংগ্রহের সংজ্ঞা (Definition of Employ)

সাধারণ অর্থে: যে পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাকে কর্মী সংগ্রহ বলে।

ব্যাপক অর্থে: কর্মী সংগ্রহ হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রতিভাবান ও উদ্যমশীল কর্মী খুঁজে বের করে তাদেরকে চাকরি লাভে উৎসাহিত করা। এটি কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাজ।

নিম্নে কর্মী সংগ্রহের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। ই.বি. ফ্লিপো (E.B Flippo)-এর মতে, ‘কর্মী সংগ্রহ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সম্ভাবনাময় কর্মীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়।’

২। প্রফেসর টিনা অ্যাগ্রেল (Prof. Tina Agrel)-এর মতে, ‘যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় জনসাধারণকে চাকরির সুযোগ সম্পর্কে জানানো হলে, যোগ্যতাসম্পন্ন অধিক সংখ্যক ব্যক্তি চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে, তাকে কর্মী সংগ্রহ বলে।’

৩। অধ্যাপক ম্যাক ফারল্যান্ড (Prof. MC. Farland)-এর মতে, ‘কোম্পানির প্রতি সম্ভাব্য কর্মীদের আগ্রহান্বিত করে তোলার পদ্ধতিকে কর্মী সংগ্রহ বলা হয়।’

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, কর্মী সংগ্রহ হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে চাকরির সুযোগ সম্পর্কে কর্মীদের অবহিত ও উৎসাহিত করে, তাদের নিকট হতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয় নিয়োগের জন্য।

কর্মী সংগ্রহের উৎসমূহ (Source of Employ)

শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ কর্মী সংগ্রহ করা। একটি প্রতিষ্ঠানে সাধারণত উর্ধ্বতন এবং অধঃস্তন এ দুই ধরনের কর্মী থাকে। কোন ধরনের কর্মী কোন উৎস হতে সংগ্রহ করা হবে তা নির্ভর করে কর্মী সংগ্রহের নীতির উপর।

প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংগ্রহের নিম্নলিখিত দুটি প্রধান উৎস রয়েছে। যথা: (ক) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে কর্মী সংগ্রহ। (খ) প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক বা বাইরের উৎস হতে কর্মী সংগ্রহ।

(ক) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে কর্মী সংগ্রহ: প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্য হতে পদোন্নতি, বদলি, পদায়ন ইত্যাদি যে কোনো প্রক্রিয়ায় শূন্যপদ পূরণ করা হলে, তাকে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে কর্মী সংগ্রহ বলা হয়। অভ্যন্তরীণ উৎসকে আবার নিম্নে বর্ণিত উপায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১। বর্তমান কর্মীদের পদোন্নতি: প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ও দায়িত্বপূর্ণ পদ শূন্য হলে বা নতুন পদ সৃষ্টি হলে কর্মরত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের পদোন্নতি দিয়ে শূন্য পদ পূরণ করা হয়।

২। বর্তমান কর্মীদের বন্ধুবান্ধব হতে: প্রতিষ্ঠানে কোনো পদ শূন্য হলে কর্মরত কর্মীদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্য হতে দক্ষ কর্মী সংগ্রহ করা হয়।

৩। শ্রমিক সংঘের সুপারিশকৃত ব্যক্তিবর্গ হতে: যেসব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংঘ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে সেখানে তাদের সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের মধ্য হতে কর্মী সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত নিম্নপদস্থ শ্রমিক-কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

(খ) প্রতিষ্ঠানের বাইরের উৎস হতে কর্মী সংগ্রহ: প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণ অথবা নতুন সৃষ্ট পদে কর্মী নিয়োগের জন্য বাইরের উৎস হতে কর্মী সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াকে বাহ্যিক উৎস হতে কর্মী সংগ্রহ বলা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল পদেই বাইরের উৎস হতে শ্রমিক কর্মী নিয়োগ করতে হয়। এ প্রক্রিয়াটি ঝামেলাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মী সংগ্রহ করা যায়।

কর্মী সংগ্রহের বাইরের উৎসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

১। প্রাক্তন কর্মীদের মধ্য হতে কর্মী সংগ্রহ: যে সকল কর্মী প্রতিষ্ঠানে পূর্বে নিয়োজিত ছিল কিন্তু কোনো কারণবশত চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাদের মধ্য হতে কর্মী সংগ্রহ করা যেতে পারে।

২। প্রতিষ্ঠানের গেটে চাকরি সন্ধানী ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে কর্মী সংগ্রহ: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিয়মিত চাকরির জন্য কর্মীরা কারখানার প্রধান গেটে ভিড় জমায়। নিম্নপদস্থ কর্মীদের এখান থেকে সংগ্রহ করা হয়।

৩। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে কর্মী সংগ্রহ: শিল্প প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মী প্রয়োজন হলে ব্যবস্থাপকগণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ করে থাকেন।

৪। সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে কর্মী সংগ্রহ: শিল্প প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ করতে পারে।

৫। চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্র হতে কর্মী নিয়োগ: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চাকরিপ্রার্থীরা এসব কেন্দ্রে নিজের জীবন বৃত্তান্ত জমা দিয়ে কর্মসংক্রান্ত পছন্দ জানিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করে রাখে। কোনো প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মীর প্রয়োজন হলে নিয়োগকারী বিনিয়োগ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ করতে পারে।

৬। বিজ্ঞাপন প্রদান: কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মীর প্রয়োজন হলে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন প্রদান করে নতুনভাবে কর্মী সংগ্রহ করে। বর্তমান জগতে কর্মী সংগ্রহের এটি উল্লেখযোগ্য উৎস।

৭। চাকরি প্রার্থী: বর্তমানে বেকার যুবকগণ কোনো প্রকার কর্মখালি সংবাদ অবগত না হয়েই অনাহতভাবে আবেদন জমা দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মীর প্রয়োজন হলে ঐ সমস্ত প্রার্থী হতে যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ করতে পারে।

৮। মেধা শিকার: নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মকর্তাদের অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ভাগিয়ে আনাকে মেধা শিকার বলা হয়। এর মাধ্যমেও কর্মী সংগ্রহ করা হয়।

৯। সরকারি কর্মকমিশন হতে কর্মী সংগ্রহ: সরকারি কর্মকমিশন কর্মী সংগ্রহের দ্বিতীয় অন্যতম উৎস। বর্তমানে এ কমিশন বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস-এর ক্যাডারভুক্ত সকল কর্মকর্তা সংগ্রহে ও নির্বাচনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

কর্মী নির্বাচনের সংজ্ঞা (Definition of Selection of Employess)

সাধারণ অর্থে: কর্মী নির্বাচন বলতে শুধুমাত্র নতুন কর্মী নিয়োগ করাকে বোঝায় না; কর্মীদের পদোন্নতি, পদাবনতি, বহিষ্কার বা ছাঁটাই প্রক্রিয়াও কর্মী নির্বাচনের অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নে কর্মী নির্বাচনের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। প্রফেসর আর. এম. হগেস (Prof. R.M. Hodgets)-এর মতে, 'কর্মী নির্বাচন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান আবেদনকারীদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট পদের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগের জন্য বাছাই করে।'

২। টিনা অ্যাগ্রেল (Tina Agrell)-এর মতে, 'কর্মী নির্বাচন বলতে আবেদনকারীর মধ্য হতে যাদের নতুন কাজে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা আছে তাদের নির্বাচন করাকে বোঝায়।'

৩। মি. ভ্যান ফ্লিট (Mr. Van Fleet)-এর মতে, 'কর্মী নির্বাচন হলো সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্য হতে সর্বোত্তম কর্মী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া বিশেষ।'

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নির্দিষ্ট রীতিনীতি অনুসরণ করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য হতে যোগ্য কর্মী নিয়োগের জন্য বাছাই প্রক্রিয়াকে কর্মী নির্বাচন বলে।'

কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিসমূহ

The Procedures of Selection Employees

কর্মী নির্বাচনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পদ্ধতিতে কর্মী নির্বাচন করে থাকে।

তবে বৃহদায়তন ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান কর্মী নির্বাচনের ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। বিভাগীয় রিক্রুইজিশন প্রাপ্তি: কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরুতে কোথায়, কতজন ও কী ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন তা শ্রমিক কর্মী বিভাগকে জানাতে হয়। বিভিন্ন বিভাগ হতে রিক্রুইজিশন পাওয়ার পর কর্মী নির্বাচনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

২। বিজ্ঞপ্তি প্রদান: শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ শূন্য পদ পূরণের জন্য দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়ে থাকে। দরখাস্তে প্রার্থীর পূর্ণনাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স, জাতীয়তা, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ উল্লেখ থাকে।

৩। আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাছাই: বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রার্থীরা আবেদনপত্র জমা দেয়। আবেদনপত্র পাওয়ার পর তাতে ভুল আছে কিনা পরীক্ষা করে উপযুক্ত আবেদনপত্র বাছাই করে প্রার্থীর লিখিত বা সাক্ষাৎকার পরীক্ষার জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হয়।

৪। নিযুক্তি পরীক্ষা গ্রহণ: কর্মীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমূহ নেওয়া যেতে পারে:

(ক) লিখিত পরীক্ষা: লিখিত পরীক্ষায় অনেকগুলো অভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সাধারণ জ্ঞান যাচাই করা হয়। তাছাড়া প্রার্থীর হাতের লেখা এবং লিখন ক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায়।

(খ) মৌখিক পরীক্ষা: নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পর যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার জন্য নির্বাচন বোর্ডে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হয়। এতে প্রার্থীর শারীরিক যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণ, বুদ্ধিমত্তা, প্রবণতা ইত্যাদি অবস্থা জানা যায়।

৫। প্রাথমিক ও সাময়িকভাবে নির্বাচন: উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে কোন প্রার্থী যোগ্য বলে বিবেচিত হলে তাকে প্রাথমিক ও সাময়িকভাবে নির্বাচন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ নির্বাচনের সংবাদ প্রার্থীকে জানানো হয় না।

৬। স্বাস্থ্য পরীক্ষা: প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রার্থীর দেহের ওজন, উচ্চতা, দৃষ্টিশক্তি, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

৭। প্রার্থীর ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান: চূড়ান্ত নিয়োগদানের পূর্বে প্রার্থীর অতীত কার্যাবলি যেমন-চরিত্র, আচার-আচরণ, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুকূলে হলে চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়া হয়, অন্যথায় তালিকা হতে তার নাম বাদ দেওয়া হয়।

৮। নিয়োগপত্র প্রদান: প্রার্থী সকল পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হলে তাকে সাধারণত অস্থায়ীভাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তার ঠিকানায় নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হয়। এতে চাকরিসংক্রান্ত শর্তাবলি ও কাজে যোগদানের সর্বশেষ তারিখের উল্লেখ থাকে।

৯। যোগদানের রিপোর্ট গ্রহণ: নিয়োগপত্রের আলোকে প্রার্থী নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্মকর্তার কাছে যোগদানের রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলে কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই উপরোক্ত পদ্ধতিতে কর্মী নির্বাচন করা হয়।

কর্মী উন্নয়ন: ব্যবসায় উন্নতিকল্পে কর্মীদের উন্নয়নের প্রয়োজন অপরিহার্য। কর্মীদের তাদের নির্ধারিত কাজে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে ব্যবসায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে সফলতা অর্জনের জন্য অবশ্যই দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। আর কর্মীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই বৃদ্ধি করা যায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি রয়েছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। পরিচিতিমূলক পরিবেশ: নবনিযুক্ত কর্মী যোগদানের পর প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নীতি, উদ্দেশ্য, কর্তব্য, দায়িত্ব, ক্ষমতা, কার্য প্রক্রিয়া এবং অন্য সহকর্মীদের সাথে প্রাথমিক পরিচিতি করানোর প্রক্রিয়াকে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ বলে। এতে প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য ও কার্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

২। কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ: এ পদ্ধতিতে শ্রমিক বা কর্মীকে কর্মরত অবস্থায় বা কার্যচলাকালে উর্ধ্বতনের অধীনে থেকে কাজ সম্পর্কে হাতেনাতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পায় তাকে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বলে। এতে কাজ করতে করতে কর্মী কাজ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে।

৩। শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ: এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন নিয়োগকৃত কর্মীকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান করা হয়। শিক্ষানবিশ থাকাকালে কর্মীদেরকে অন্যদের অপেক্ষা কম বেতন দেওয়া হয়।

৪। পদ পরিবর্তন: এ পদ্ধতিতে কর্মীকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদে কাজ করতে দেওয়া হয়। ফলে কর্মী প্রতি পদের কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

৫। পর্যবেক্ষণ প্রশিক্ষণ: এ পদ্ধতিতে নিয়োগকৃত কর্মীকে একজন বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কর্মীর তত্ত্বাবধানে সহকারী হিসেবে কার্যক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়। এতে কর্মী তত্ত্বাবধায়কের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে। এভাবে দেখে দেখে এক সময় শিক্ষার্থী কার্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

৬। ইন্টার্নশিপ: এ পদ্ধতিতে একজন প্রশিক্ষণার্থী একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট নির্বাহীর অধীনে কাজ করে এবং মেয়াদ শেষে বিবরণী পেশ করতে হয়।

৭। সেমিনার ও ওয়ার্কশপ: বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ কর্মীদের জন্য মাঝে মাঝে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে কর্মীদেরকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়। ফলে কর্মীরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়।

৮। নাট্যাভিনয় পদ্ধতি: এ পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্রের কর্মীদেরকে সাজিয়ে কোনো ব্যক্তিকে উপস্থাপিত একটি সমস্যাতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে বলা হয়। এতে উক্ত ব্যক্তি যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করতে পারে অন্যরাও তা দেখে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়।

৯। ঘটনা পদ্ধতি: বাস্তবে কোনো সমস্যা কীভাবে সমাধান করা হয় এ বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

১০। বক্তৃতা পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে একসঙ্গে অনেক প্রশিক্ষণ গ্রহীতার সামনে শ্রেণিকক্ষে বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরাসরি মৌখিকভাবে বক্তা তথ্যাবলি পরিবেশন করে থাকে। এতে প্রশিক্ষণ গ্রহীতারা অনেক কিছু শিখতে পারে।

১১। ঘটনা পর্যালোচনা পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাল্পনিক কোনো সমস্যার সমাধান বের করতে বলেন। প্রশিক্ষণার্থীরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বের করেন।

১২। পেশাগত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: কোনো বিশেষ পেশাদারি কার্যের দক্ষতা অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাকে পেশাগত প্রশিক্ষণ বলে। যেমন হিসাবরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

১৩। ফ্লাইং স্কোয়াড্রন পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে কর্মীদেরকে ছোট ছোট দল বা স্কোয়াড্রনে বিভক্ত করে আলাদা আলাদা গ্রুপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬.৩ যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম

মানব জীবনে যোগাযোগ একটি অপরিহার্য উপাদান। মানুষ নিজের প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে ভাব বা তথ্য বিনিময় করে। ভাব বা তথ্যও এ বিনিময় কার্যকেই যোগাযোগ বলে। দোলনা থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার প্রতিটি মুহূর্তে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। যোগাযোগ শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর কার্যক্রম বিস্তৃত। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যতীত কোনো মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অচল।

যোগাযোগের সংজ্ঞা (Definition Communication)

উৎপত্তিগত অর্থে: ইংরেজি ‘Communication’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যোগাযোগ। ‘Communication’ শব্দটি ল্যাটিন ‘Communis’ শব্দ হতে এসেছে। এর অর্থ ‘Common’ বা সাধারণ। তৎকালে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাধারণ বা পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য ‘Communication’ শব্দটি ব্যবহার করা হতো। উৎপত্তির দিক হতে বিবেচনা করলে যোগাযোগ হলো তথ্যের আদান-প্রদান (Exchange of information)।

অনেকে মনে করেন প্রাচীন ফরাফস ‘Communer’ শব্দ থেকে ‘Communication’ শব্দটি এসেছে। ‘Communer’ শব্দের অর্থ অংশগ্রহণ করা (to share)। এ দিক থেকে যোগাযোগ বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ (to participation in) করাকে বোঝায়।

সাধারণ অর্থে: যোগাযোগ বলতে তথ্য বা সংবাদ বিনিময়কে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো বিষয়ক সম্পর্কিত তথ্যাবলি, খবরা-খবর, অনুভূতি, অভিমত ইত্যাদি আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে যোগাযোগ বলে।

নিম্নে যোগাযোগের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

১। মারফি এবং প্যাক (Murphy & Peek)-এর মতে, ‘জনগণের মধ্যে ভাব বা তথ্য বিনিময়ের দ্বিমুখী প্রক্রিয়াই হলো যোগাযোগ।’

২। নিউম্যান ও সামার (Newman & Summer)-এর মতে, ‘দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, ভাব ও আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির বিনিময় প্রক্রিয়াই হলো যোগাযোগ।’

৩। ইলিয়ট জ্যাকার (Illiot Jaquer)-এর মতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রেরিত বা সংক্রমিক অনুভূতি, মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের সমষ্টিকে যোগাযোগ বলে।

৪। গেরি ডেসলার (Gary Deslar)-এর মতে, ‘তথ্যের বিনিময় এবং অর্থ বা ভাবের সংক্রমণকে যোগাযোগ বলে।’

৫। অধ্যাপক ম্যাক ফারল্যান্ড (Prof. Mac Farland)-এর মতে, ‘যোগাযোগ হলো জনসাধারণের মধ্যে অর্থসমূহের অনুভূতি সঞ্চার করা এবং ভাব বা চিন্তাধারার প্রেরণের প্রক্রিয়া বিশেষ।’

৬। আমেরিকার ব্যবস্থাপনা সমিতি (American Management Association)-এর মতে, ‘যেসব আচরণ কোনো ভাব বা অর্থের বিনিময় ঘটায় তাকে যোগাযোগ বলে।’

৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য স্ট্যাডি অব কন্সট্রাক্শন এর মতে, ‘যোগাযোগ হলো তথ্য, ধারণা, মতামত ও আবেগের পারস্পরিক বিনিময়।’

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, ভাব, অনুভূতি ও মতামত বিনিময়ের প্রক্রিয়াকেই যোগাযোগ বলে।

ব্যবসায় যোগাযোগের সংজ্ঞা (Definition Business Communicaiton)

সাধারণ অর্থে: ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান করাকে ব্যবসা যোগাযোগ বলে।

ব্যাপক অর্থে: কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বা বাইরের যে কোনো পক্ষের সাথে তথ্য বা ভাবের আদান প্রদান হোক না কেন এর বিষয়বস্তু ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত হলেই তাকে ব্যবসা যোগাযোগ বলে।

নিম্নে ব্যবসায় যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া হলো:

১। অধ্যাপক ব্রেনান (Prof. Brennan)-এর মতে, “বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদানকে ব্যবসায় যোগাযোগ বলে।

২। বি. লরেন্স (B. Lawrence)-এর মতে, ‘বাণিজ্যিক যোগাযোগ হচ্ছে বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত ধারণার প্রকাশ, পরিবেশন, গ্রহণ ও বিনিময় প্রক্রিয়া।’

৩। প্রফেসর জে.আর. হাস্ট-এর মতে, ‘সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিকল্পনা ও সংগঠনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যে যোগাযোগ সংগঠিত হয় তাকে ব্যবসায় যোগাযোগ বলে।’

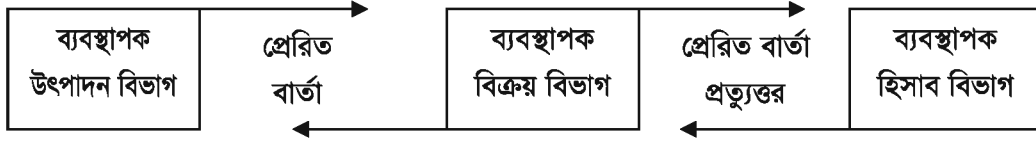
৪। প্রফেসর জে.আর.টেরি (Prof. J.R. Hust)-এর মতে, ‘ব্যবসায় যোগাযোগ হলো ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লব্ধিকেন্ট।’

৫। অধ্যাপক ডব্লিউ.এইচ. মেনিং (Prof. W.H Meanning)-এর মতে, ‘ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে এতদসম্পর্কিত ধারণা, সংবাদ ও মতামত বিনিময়কে ব্যবসায় যোগাযোগ বলে।’

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভাব বা তথ্যের প্রেরণ, গ্রহণ প্রত্যুত্তরজনিত কার্যাবলিকে ব্যবসায় যোগাযোগ বলে।

যোগাযোগের প্রকারভেদ (Communicaiton types): আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যাবলি ও খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ প্রচলন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের আয়তন, আকৃতি, কাজের ধরন শ্রমিক ও কর্মীদের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যোগাযোগকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে যোগাযোগের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখানো হলো:

১। সমান্তরাল যোগাযোগ (Horizontal Communicaiton): প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত একই পদমর্যাদাসম্পন্ন বা সমপদে অধিষ্ঠিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলে। উদাহরণস্বরূপ, উৎপাদন ব্যবস্থাপক, বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপক হিসাব বিভাগের মধ্যে স্থাপিত যোগাযোগ। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে সমান্তরাল যোগাযোগ প্রক্রিয়া দেখানো হলো:

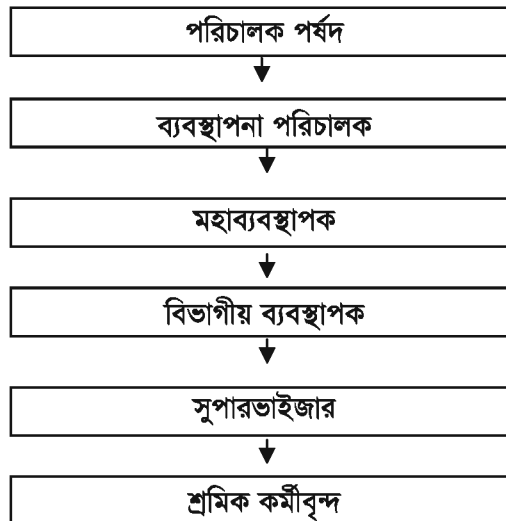


২। নিম্নগামী যোগাযোগ

প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর উচ্চস্তর হতে কোনো তথ্য বা সংবাদ নিম্নস্তরে প্রেরিত হয় তখন তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলে তাকে নিম্নগামী যোগাযোগ বলা হয়। নিম্নগামী যোগাযোগ বার্তা প্রেরক বার্তা প্রাপকের উপর অবস্থান করে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি, নীতি, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নস্থ কর্মচারীদের অবহিত করে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে পরিচালক পর্ষদ (Board of Director) হতে কোনো নির্দেশনা বা সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (Managing Director) কাছে প্রেরিত হয়, সেখান হতে পর্যায়ক্রমে মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং সর্বশেষে সকল কর্মচারীর কাছে প্রেরিত হয়। নিম্নগামী যোগাযোগের প্রকৃতি নির্ণয় করলে দেখা যায় যে, এটা প্রায়ই নির্দেশসূচক হয়। তাই একে নির্দেশনামূলক যোগাযোগ নামেও অভিহিত করা হয়।

নিম্নে রেখার সাহায্যে নিম্নগামী যোগাযোগ প্রক্রিয়া দেখানো হলো:



৩। উর্ধ্বগামী যোগাযোগ

উর্ধ্বগামী যোগাযোগ হলো নিম্নগামী যোগাযোগের বিপরীতমুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্তরের কর্মীগণ যখন তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে কোনো তথ্য বা সংবাদ প্রেরণ করে, তখন তাকে উর্ধ্বগামী

যোগাযোগ বলে। মোটকথা, এ প্রকার যোগাযোগ সংবাদের উৎসস্থল হলো নিম্নস্থ কর্মচারীবৃন্দ, শ্রমিক কর্মচারীগণ যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় বা সাংগঠনিক কাঠামোর উচ্চস্তরের কর্মকর্তাগণকে তাদের অভাব অভিযোগ, বাস্তব সমস্যা, প্রস্তাব, সুপারিশ, অনুভূতি, মতামত ইত্যাদি প্রেরণ করে তখন এই ধরনের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সাংগঠনিক কাঠামোর প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে সংবাদ ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। এরূপ যোগাযোগ কর্মীদের সৃজনশীল মনের বিকাশ ঘটায়, অন্যদিকে এর অভাবে তাদের কর্মোদ্যম হ্রাস পায়।

উর্ধ্বগামী যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অধঃস্তনকর্মচারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। যেমন-একজন শ্রমিক কর্মীর কাছ থেকে কোনো তথ্য বা সংবাদ প্রথমে তত্ত্বাবধায়ক ও ফোরম্যানের কাছে প্রেরিত হলে তা উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে পরিগণিত হবে।

১। ড. এম.এ. মান্নান-এর মতে, ‘অধঃস্তন কর্মচারীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলে তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে।’

২। ড. এস.এস. কর্মকার-এর মতে, ‘নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণ যখন তাদের উপরস্থ কর্মকর্তাদের কাছে কোনো তথ্য বা সংবাদ প্রেরণ করে তখন তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে।’

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোর নিম্নস্তরের কর্মচারীরা তাদের উচ্চস্তরের কর্মকর্তার সাথে তথ্য বা সংবাদ বিনিময় করলে তাকে উর্ধ্বগামী যোগাযোগ বলে।



৪। উল্লম্ব বা খাড়াখাড়া যোগাযোগ (Vertical Communication)

একই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যখন তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান হয় তখন তাকে উল্লম্ব বা খাড়াখাড়া যোগাযোগ বলে। এ প্রকার যোগাযোগ উচ্চস্তর হতে নির্দেশনা, উপদেশ, পরামর্শ, আদেশ এবং নিম্ন হতে দাবি-দাওয়া, মতামত, অনুরোধ ইত্যাদি যথাস্থানে পাঠানোর জন্য এরূপ যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে থাকে। এরূপ যোগাযোগে জড়িত দুই পক্ষের একজনের পদমর্যাদা অন্যজনের চেয়ে উচ্চস্তরের হয়।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে উল্লম্ব বা খাড়াখাড়া যোগাযোগ দেখানো হলো:



৫। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ (Internal Communication)

একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলে। এরূপ যোগাযোগ নিম্নগামী, উর্ধ্বগামী, সমান্তরাল, উল্লম্ব হতে পারে।

৬। বাহ্যিক যোগাযোগ (External Communication) : প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাকে বাহ্যিক যোগাযোগ বলে। একটি প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাইরের বিভিন্ন পক্ষ যেমন দেনাদার, পাওনাদার ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, পরিবহন সংস্থা প্রভৃতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

৭। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Formal Communication): প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে। এরূপ যোগাযোগে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন, কর্মসূচি ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সংঘটিত হয়। নিম্নগামী, উর্ধ্বগামী ও সমান্তরাল যোগাযোগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সংঘটিত হতে পারে। এক্ষেত্রে যোগাযোগের প্রকৃতি বা আয়তন যাই হোক না কেন এটা সম্পূর্ণরূপে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হয়ে থাকে।

৮। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ (Informal Communication):: যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তথ্যাদি আদান-প্রদানে কোনো অফিসিয়াল রীতি-নীতি অনুসরণ করা হয় না বা কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় না তাকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলা হয়। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া কোনো নিয়মতান্ত্রিকভাবে হয় না বিধায় একে অনুষ্ঠান বর্জিত যোগাযোগ বলা হয়ে থাকে। সাধারণত খাওয়ার টেবিলে, খেলার মাঠে, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এ ধরনের যোগাযোগ সংগঠিত হয়ে থাকে। অনানুষ্ঠানিক

যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্মচারীবৃন্দ তাদের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যবস্থাপকের সাথে খোলামেলাভাবে মতবিনিময় করতে পারে। এ প্রক্রিয়ার কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই।

৯। সাংগঠনিক যোগাযোগ: কারবার প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও পরিচালনাসংক্রান্ত ব্যাপারে যে যোগাযোগ সংঘটিত হয় তাকে সাংগঠনিক যোগাযোগ বলে। এ ধরনের যোগাযোগ আইনগত দলিলপত্র, কাঠামো নির্ধারণ, উদ্দেশ্য ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১০। নৈমিত্তিক বা রুটিন যোগাযোগ: প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য যে সমস্ত তথ্য বা সংবাদ আদান-প্রদান করা হয় তাকে রুটিন যোগাযোগ বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্যকলাপ যেমন-ফাইল ওয়ার্ক, নির্দেশ প্রদান, টেলিফোনে আলোচনা, চিঠিপত্র আদান-প্রদান ইত্যাদি রুটিন যোগাযোগের আওতায় পড়ে।

১১। বিশেষায়িত বিভাগীয় যোগাযোগ: একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর বিশেষায়িত বিভাগসমূহের মধ্যে যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয় তাকে বিশেষায়িত যোগাযোগ বলে। যেমন-হিসাব বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় ও বিক্রয় বিভাগ, গবেষণা বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ প্রভৃতি বিভাগসমূহের মধ্যে রিপোর্ট, স্মারকলিপি ও চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিভাগীয় যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

মৌখিক যোগাযোগ ও লিখিত যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমসমূহ (Media of Oral Written Communication)

মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম বা কৌশলসমূহ: মানবজীবনের যোগাযোগ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মৌখিক যোগাযোগই সর্বপ্রথম প্রচলিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। নিম্নে মৌখিক যোগাযোগের বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম বা কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো:

১। কথোপকথন: কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া যোগাযোগকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয় তাকে কথোপকথন বলে। কথোপকথন মৌখিক যোগাযোগে ব্যবহৃত সর্বাধিক প্রচলিত মাধ্যম। এ পদ্ধতিতে বার্তা প্রেরক ও বার্তা প্রাপক উভয়েই খোলাখুলিভাবে মতবিনিময় করতে পারে।

২। সাক্ষাৎকার: বার্তা প্রেরক ও প্রাপক নির্দিষ্ট সময়ে একত্রে মিলিত হয়ে পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর আলাপ-আলোচনা করলে তাকে সাক্ষাৎকার বলে। এ পদ্ধতিতে সাক্ষাৎপ্রার্থী নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপস্থিতিতে হয়ে নির্ধারিত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে তথ্যাদি আদান-প্রদান করে থাকে।

৩। টেলিফোন: মৌখিক যোগাযোগের একটি আধুনিকতম পদ্ধতি হলো টেলিফোন। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হয়েও টেলিফোনের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে অবস্থিত ব্যক্তির সাথে অল্প সময়ে তথ্য বা সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারেন।

৪। মঞ্চ বক্তৃতা: যে পদ্ধতিতে একযোগে বহুসংখ্যক জনতার উদ্দেশ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যোগাযোগকারী বক্তব্য পেশ করে তাকে মঞ্চ বক্তৃতা বলে। তবে এরূপ যোগাযোগে পারস্পরিক মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ থাকে না।

৫। দলগত আলোচনা: মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দলগত আলোচনা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে দলগত আলোচনা। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে দলগত আলোচনার সুফল পাওয়া যায়। যেমন— প্রশিক্ষণ, মানব সম্পর্কে ধারণা যাচাই।

৬। সম্মেলন বা কনফারেন্স: এটি মৌখিক যোগাযোগের একটি অন্যতম কৌশল। সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো একটি দল আলাপ-আলোচনায় মিলিত হলে তাকে সম্মেলন বা কনফারেন্স বলে।

৭। টেলিভিশন ও বেতার: রেডিও-টেলিভিশনে কথিকা পাঠ করে যোগাযোগকারী তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারে। এটি একটি একতরফা যোগাযোগ পদ্ধতি।

৮। চা-চক্র: মৌখিক যোগাযোগের একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি হলো চা-চক্র। এ যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ মাঝে মধ্যে চা-চক্রে মিলিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন।

৯। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপায়ে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ।

১০। কমিটি পর্যালোচনা: কমিটি পর্যালোচনা যোগাযোগের ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ মাধ্যম। এ মাধ্যমে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি সামনাসামনি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

১১। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ: এ ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক অধীনস্থ কর্মীদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা, পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কের খোঁজ-খবর পেতে পারে। এ ধরনের যোগাযোগ চায়ের টেবিলে, খেলার মাঠে স্থাপন করা সম্ভব।

১২। পারিবারিক সমস্যা: পারিবারিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করলে ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীগণ ঘরোয়া পরিবেশে মিলিত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন।

১৩। পুরস্কার বিতরণী সভা: এরূপ যোগাযোগ মাধ্যমে যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মীদের জন্য পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান করে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

১৪। সামাজিক অনুষ্ঠান: বিয়ে, বনভোজন, বিতর্ক, বার্ষিক প্রীতিভোজ ইত্যাদি অনুষ্ঠান হলে নির্বাহী কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মীগণ মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। এতে উভয়ের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক মৌখিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে থাকে।

লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ (Media of written communication)

লিখিত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: যথা:

- (ক) ব্যবস্থাপনার জন্য লিখিত যোগাযোগ।
- (খ) কর্মচারীদের জন্য লিখিত যোগাযোগ।

(ক) ব্যবস্থাপনার জন্য লিখিত যোগাযোগ মাধ্যম বা কৌশলসমূহ: প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, নির্বাহী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যোগাযোগের জন্য যে লিখিত যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করেন তাকে ব্যবস্থাপনার জন্য লিখিত যোগাযোগ পদ্ধতি বলে। নিম্নে এরূপ যোগাযোগের মাধ্যমগুলো আলোচনা করা হলো:

- ১। সংগঠন সম্পর্কিত যোগাযোগ: সংগঠন সম্পর্কিত যোগাযোগ যেমন- সাধারণ ঘোষণা, নীতি, বিজ্ঞপ্তি, প্রশাসনিক নির্দেশনা ইত্যাদি যোগাযোগ লিখিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য।
- ২। জরুরি ব্যবস্থাপনা বুলেটিন: ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষ জরুরি বিবৃতি পরিবেশন এবং তা নির্ভুল ও অবিকৃত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কাছে কাছে পৌঁছাতে হলে লিখিত যোগাযোগ আবশ্যিক।
- ৩। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন: প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তি তার উপরস্থ কর্মকর্তার কাছে ধার্য ধারায় যে লিখিত রিপোর্ট পেশ করে থাকেন তাকেই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন বলে।
- ৪। ব্যবস্থাপনা বিষয়ক চিঠি: সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ অথচ কম জরুরি বিষয়াদি চিঠির মাধ্যমে ব্যবস্থাপককে জানানোর পদ্ধতিকে ব্যবস্থাপনা সংবলিত চিঠি বলা হয়। এ ধরনের চিঠি সাধারণত সাপ্তাহিক খবরাখবর প্রকাশ করা হয়।
- ৫। তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশিকা পুস্তক: প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মীদের সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা পুস্তক সরবরাহ করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আইন-কানুন, রীতি-নীতি, ট্রেড ইউনিয়নের কর্তব্য ও অধিকার ইত্যাদি লিখিত থাকে।
- ৬। তত্ত্বাবধায়কের জন্য বিশেষ প্রকাশনা: অনেক সময় বড় বড় কোম্পানি তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধান কাজের সুবিধার জন্য বিশেষ প্রকাশনার ব্যবস্থা করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়, হ্রাস, পণ্যের মানোন্নয়ন, দুর্ঘটনা-হ্রাস, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে।

(খ) কর্মচারীদের জন্য লিখিত যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ: প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্তরে কর্মরত কর্মচারীদের কাছে লিখিত আকারে তথ্য প্রেরণ করার জন্য কতিপয় মাধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে কর্মচারীদের জন্য লিখিত যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আলোচনা করা হলো:

- ১। কর্মচারী বুলেটিন: অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোনো জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ খবর কর্মচারীদের জানানোর জন্য লিখিতভাবে এ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়।

- ২। কর্মচারীদের সংবাদ: প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মচারীদেরকে জানানোর জন্য প্রতি সপ্তাহে লিখিত সংবাদ প্রকাশ করা হয়।
- ৩। মাসিক পত্রিকা প্রকাশ: অনেক সময় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান এর কর্মচারীদেরকে সকল ব্যাপারে অবহিত করার জন্য নিজস্ব মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে।
- ৪। নতুন কর্মচারীদের কাছে পত্র: নবনিযুক্ত কর্মীদেরকে অভিনন্দন ও তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য স্বাগত জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ৫। কর্মচারীদের বাড়িতে পত্র প্রেরণ: কর্মচারীদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানানোর জন্য ব্যবস্থাপক সাধারণত পাক্ষিক বা মাসিক তাদের বাড়ির ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করে থাকে। তবে এতে কোনো প্রত্যুত্তর চাওয়া হয় না।
- ৬। বার্ষিক প্রতিবেদন: কর্মচারীদেরকে প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতা, বাৎসরিক আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়সমূহ জানানোর জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।
- ৭। অভিযোগ বই: প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের অভিযোগ লিখিতভাবে জানানোর জন্য প্রত্যেক বিভাগে যে বই সংরক্ষণ করা হয় তাকে অভিযোগ বই বলে। এতে কর্মচারীরা তাদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাবে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে পারে।
- ৮। নোটিশ বই: অধস্তন কর্মচারীদেরকে জরুরি ভিত্তিতে কোনো তথ্য অবগত করানোর জন্য নোটিশ বই ব্যবহার করা হয়।
- ৯। রচনা প্রতিযোগিতা: কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম অতিরিক্ত কৌশল হিসেবে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- ১০। বেতন খাম: অনেক সময় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, কর্তন, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য ভাতা সম্পর্কিত তথ্য লিখিতভাবে বেতন খামের মাধ্যমে জানানো হয়।
- ১১। পঠন তাক: প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাকের মধ্যে বইপত্র সাজিয়ে রাখা হয়। এ সমস্ত বইপত্র হতে কর্মচারীরা অবসর সময়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।
- ১২। শ্রবণ দর্শন মাধ্যম: কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের লিখিত যোগাযোগ সহযোগী বা পরিপূরক হিসেবে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।
- ১৩। স্মারকপত্র: বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ছুটি মঞ্জুর এবং চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় কর্মচারীদের জানানোর জন্য কোম্পানি যে পত্র সরবরাহ করে থাকে তাকে স্মারক পত্র বলে।
- ১৪। কার্যতালিকা: কর্মচারীদের কাজের বিশদ বিবরণ, তা সম্পাদনের সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে নির্বাহীবৃন্দের লিখিত তালিকাকে কার্যতালিকা বলে।

যোগাযোগের আওতা ও পরিধি (Scope of Communication)

যোগাযোগের আওতা বা পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। মানুষের জীবনের সমস্ত কার্যক্রমই যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত। মানবজীবনের এমন কোনো পর্যায় নেই যেখানে যোগাযোগ ছাড়া মানুষ চলতে পারে। যোগাযোগের পরিধি কতটুকু ব্যাপক হবে তা সাধারণত প্রতিষ্ঠানের আয়তন, কাজের প্রকৃতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যোগাযোগের আওতা বা পরিধি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. ব্যক্তিগত জীবনে যোগাযোগ: ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটি স্তরই যোগাযোগ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়ে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ সাধন করে মানুষ জীবনের প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে থাকে। মানুষ ঘুম থেকে ওঠার পর হতে পুনরায় ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত তার পারিপার্শ্বিক জগতের লোকজনের সাথে ভাব, ভাষা ইশারা, নীরবতা ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করে থাকে।
২. পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ: মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে তাকে বিভিন্ন লোকজনের সাথে মিলেমিশে থাকতে হয়। এ জন্য প্রত্যেক মানুষই তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সমাজে বসবাসরত জনগণের সাথে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক কথাবার্তা, আচার-আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে থাকে।
৩. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যোগাযোগ: রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই যোগাযোগ দ্বারা বিস্তৃত। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন যেমন-মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, বিভাগ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বিমুখী যোগাযোগের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালিত হয়। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে।
৪. ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ: যোগাযোগ ব্যবস্থা ধর্মীয় জীবনেও বিস্তৃত। বিভিন্ন সময়ে ধর্ম প্রবর্তকগণ স্ব স্ব ধর্মের বাণী স্রষ্টার নিকট হতে প্রাপ্ত হয়ে সাধারণত মানুষের নিকট প্রচার করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে স্বয়ং স্রষ্টাও খুব সুন্দরভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।
৫. ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যোগাযোগ: ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি কার্যক্রমের সাথে যোগাযোগ সম্পর্কিত। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপককে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এ সকল কার্যের প্রতিটি পদক্ষেপই কোনো না কোনো যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত।
৬. ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগাযোগ: আধুনিক বিশেষায়িত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এর সমুদয় কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিস্তৃত ও বহুল ব্যবহৃত। পণ্য উৎপাদন, বণ্টন এবং এদের সহায়ক কার্যাবলি সম্পাদনে যোগাযোগের ভূমিকা অপরিসীম।

৭. রাজনীতিতে যোগাযোগ: রাজনীতি এবং যোগাযোগ একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, দলীয় আদর্শ, দলীয় স্লোগান ইত্যাদি জনসাধারণের কাছে উপস্থাপনের জন্য যোগাযোগই হচ্ছে অভিন্ন পথ।

৮. সেবা কার্য ক্ষেত্রে যোগাযোগ: সেবামূলক কার্যের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। যেমন— ব্যাংক, বিমা, পরিবহন ও গুদামজাতকরণে যোগাযোগ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এছাড়া অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

৯. শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যোগাযোগ: বর্তমান শিল্পজগতে শ্রমিকদের উন্নতর চাকরিগত সুবিধা প্রদানের জন্য শ্রমিককর্মী বিভাগ, গণসংযোগ বিভাগ ইত্যাদি খোলা হচ্ছে এর অন্যতম কারণ শ্রমিক, মালিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা।

১০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যোগাযোগ: বর্তমানে যোগাযোগ কেবল দেশের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ নয়। ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যমেই ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রতিটি দেশে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট একে অপরের কাছে সাহায্য প্রার্থী।

১১. কারবার গবেষণা কার্যে যোগাযোগ: কারবার প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নতুন পদ্ধতি, কলাকৌশল ও ধারণা উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম চালাতে হয়। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা এ ধরনের গবেষণামূলক কার্যক্রমের জন্য অপরিহার্য।

১২. যোগাযোগ প্রক্রিয়া (Communication process)

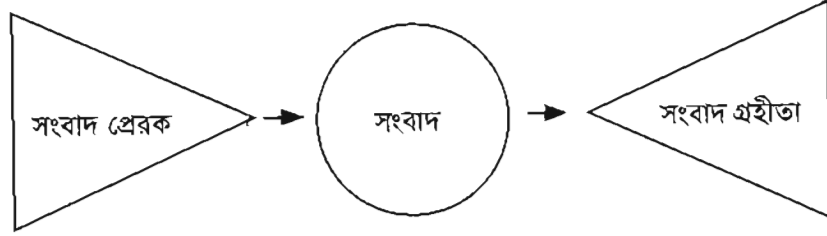
সাধারণভাবে প্রক্রিয়া বলতে কোনো কিছু করার পদ্ধতিকে বোঝায়, যার সাথে অনেকগুলো পদক্ষেপ জড়িত থাকে। যোগাযোগ প্রক্রিয়া বলতে একটি সংবাদ প্রেরণ থেকে আরম্ভ করে গ্রহণ পর্যন্ত প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। আমরা যখন কারো সাথে যোগাযোগ করি তখন তার নিকট একটি সংবাদ বা তথ্য পাঠাই। উৎসস্থল থেকে গ্রহণস্থল পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছানোর যে গতিধারা তাকে যোগাযোগ প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়। যোগাযোগের সাথে অনেকগুলো উপাদান জড়িত থাকে। এ উপাদানগুলো যখন একই সূত্রে গ্রথিত হয় তখনই যোগাযোগ প্রক্রিয়ারূপ ধারণ করে।

ডেভিসের মতে, ‘যোগাযোগ প্রক্রিয়া এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে বার্তা প্রেরক বার্তাসহ বার্তা গ্রহীতার নিকট উপস্থিত হয়।’

সাধারণভাবে বলা যায় যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপাদান নিহিত থাকে: (ক) যোগাযোগকারী (খ) সংবাদ (গ) সংবাদ গ্রহীতা।

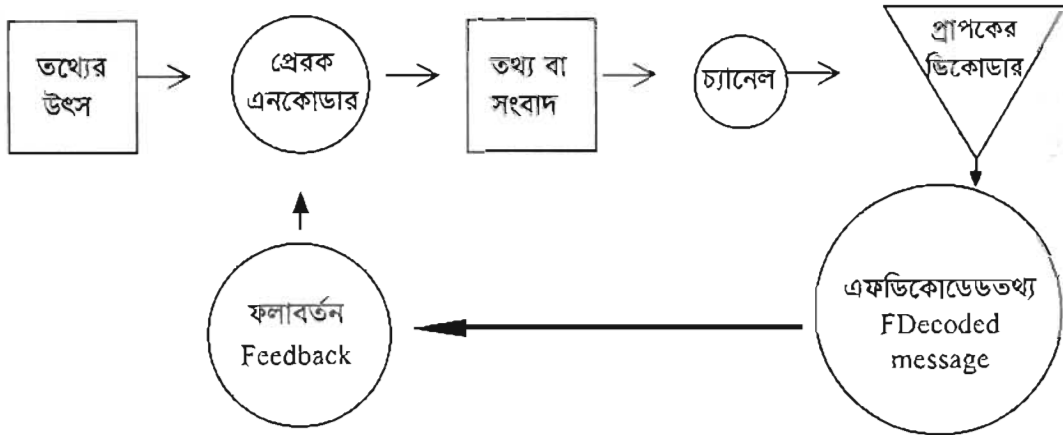
উপরোক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় আরও অনেক উপাদান রয়েছে। এ উপাদানগুলোও যোগাযোগকারী ও যোগাযোগ গ্রহীতার মধ্যে সংবাদ চলাকালে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এ উপাদানগুলো হলো (অনুভূতি, আবেগ, মতামত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভাষা ইত্যাদি)। এ সকল উপাদানের সমষ্টিই হলো যোগাযোগ প্রক্রিয়া।

গ্রিক পণ্ডিত এরিস্টটল যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি মডেল প্রদান করেছেন। মডেলটি নিম্নে প্রদত্ত হলো:



উপরোক্ত মডেলটিতে তিনি যোগাযোগ প্রক্রিয়ার তিনটি উপাদানের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো- যোগাযোগকারী, সংবাদ এবং যোগাযোগ গ্রহীতা।

কালের পরিবর্তনের সাথে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যোগাযোগ মডেলকে আরও বাস্তবসম্মত করার জন্য এর সাথে চ্যানেল এবং ফলাবর্তন যোগ করা হয়েছে। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার আধুনিক মডেলটি নিম্নে তুলে ধরা হলো-



একটি আইডিয়া বা ধারণা থেকেই সব রকমের যোগাযোগের সূচনা হয়। ধারণা সৃষ্টির পর সিদ্ধান্ত নিতে হয় ধারণাটি কারও নিকট প্রেরণ করা হবে কিনা। যার মধ্যে ধারণার সৃষ্টি হয় তিনিই ঠিক করেন (ক) কার কাছে তার ধারণা প্রকাশ করবে, (খ) তথ্য বা সংবাদটি কী হবে, (গ) কীভাবে সেটা প্রকাশ করা হবে ইত্যাদি। প্রাপক সংবাদটি পাওয়ার পর সেটি বুঝবার চেষ্টা করেন এবং তার উপলব্ধি অনুসারে প্রতি-উত্তর প্রদান করেন।

মানুষের যে কোনো একটি ধারণা থেকেই সব ধরনের যোগাযোগের সূচনা হয়। ধারণা সৃষ্টির পর তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় ধারণাটি কারও নিকট প্রেরণ করা হবে কিনা। যার মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয় তিনিই ঠিক করেন।

১। কোন ব্যক্তির কাছে তার ধারণা প্রকাশ করবেন।

২। তথ্য বা সংবাদটি কী হবে,

৩। কীভাবে সংবাদটি প্রকাশ করা হবে ইত্যাদি।

প্রাপক সংবাদটি পাওয়ার পর তা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন এবং তার উপলব্ধি অনুসারে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ (Essential elements of communication process)

সাধারণভাবে বলতে গেলে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার তিনটি উপাদান পরিলক্ষিত হয়। যেমন-যোগাযোগকারী বা বার্তা প্রেরক, সংবাদ বা তথ্য এবং যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তা প্রাপক। বর্তমান যুগে এ তিনটি উপাদান ছাড়াও আরো কতগুলো উপাদান জড়িত থাকে যার কোনো একটির অনুপস্থিতিতে যোগাযোগ কার্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত উপাদানগুলো থাকা বাঞ্ছনীয়। যথা-

১. তথ্যের উৎস (Source of Information) : তথ্যের উৎস ব্যতীত যোগাযোগ সংঘটিত হতে পারে না। যোগাযোগ করতে হলে কোনো না কোনো উৎস থেকে তথ্যের সৃষ্টি হতে হবে। এটি কোনো ব্যক্তি বা ঘটনা হতে পারে। তথ্যের উৎস হলো যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম উপাদান।

২. যোগাযোগকারী বা বার্তা প্রেরক (Sender): যে ব্যক্তি সংবাদ বা তথ্য অন্য ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করে তাকে যোগাযোগকারী বলে। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তিনিই উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তথ্যের উৎস থেকে ধারণা সংগ্রহ করে যোগাযোগ স্থাপন করে।

৩. এনকোডিং বা প্রেরণযোগ্য করে সাজানো (Encoding): এনকোডিং শব্দের অর্থ হলো প্রেরকের মানসিক ধারণা বা আইডিয়াকে প্রেরণযোগ্য করে সাজানো। অর্থাৎ এ স্তরে বার্তা প্রেরক তার ধারণাকে যথাযথ শব্দ, চার্ট এবং অন্যান্য চিহ্ন ব্যবহার করে বার্তাকে প্রেরণযোগ্য করে সাজায়।

৪. তথ্য বা সংবাদ (Message): প্রেরক প্রাপকদের নিকট যে ধারণা লিখিত বা মৌখিকভাবে প্রকাশ করে তাকে তথ্য বা সংবাদ বলা হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সংবাদ বা তথ্যই মূল বিষয়, কেননা একে কেন্দ্র করেই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সব কিছু আবর্তিত হয়।

৫. চ্যানেল (Channel) : সংবাদ প্রেরকের সাথে প্রাপকের যে মাধ্যমের সাহায্যে যোগাযোগ সাধিত হয় সে মাধ্যমটিকে বলা হয় চ্যানেল। যোগাযোগকারী টেলিফোন, চিঠি, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি যে কোনো সুবিধাজনক চ্যানেল ব্যবহার করতে পারে। যোগাযোগের জন্য সঠিক চ্যানেল নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা চ্যানেল নির্বাচনে ভুল হলে যোগাযোগ ব্যর্থ হতে পারে।

৬. যোগাযোগ গ্রহীতা বা বার্তা প্রাপক (Receiver) : যোগাযোগকারী যে ব্যক্তি বা পক্ষের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে থাকে তাকে যোগাযোগ গ্রহীতা বলে। যোগাযোগ গ্রহীতার অনুপস্থিতিতে যোগাযোগ কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। মোট কথা, যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট সংবাদ পৌঁছলে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সমাপ্তি ঘটে।

৭. ডিকোডিং বা গ্রহণযোগ্য করে সাজানো (Decoding): এটি হচ্ছে প্রাপ্ত তথ্যকে গ্রহণযোগ্য করে সাজানো। যোগাযোগকারীর নিকট হতে নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে সংবাদ বা বার্তা প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর পর প্রাপক উক্ত তথ্যকে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য করে সাজিয়ে নেন, একেই ডিকোডিং বলে।

৮. ফলাবর্তন (Feedback): এটি যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ। এর মাধ্যমে বার্তা প্রাপকের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। যোগাযোগকারী সংবাদ প্রেরণের পর যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট হতে প্রত্যুত্তর আশা করে। এ প্রত্যুত্তর ফলাবর্তন নামে পরিচিত। ফলাবর্তন হলো কার্যকর যোগাযোগের পূর্বশর্ত।

৬.৪ ব্যবসায় সাফল্য লাভে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ প্রযুক্তিগত গতিধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি ও উন্নয়নের মূলে রয়েছে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা।

যোগাযোগ মানবজীবনের একটি সর্ব বিস্তৃত কার্যক্রম। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই যোগাযোগনির্ভর। সুতরাং যোগাযোগের আওতা এতই ব্যাপক যে, তা নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে আলোচনা করা যায় না। মানুষের কর্মপরিধি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যোগাযোগের আওতাও ততদূর বিস্তৃত।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সাথে মানুষের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সামাজিক দল গঠনে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিম্নে ব্যবসায় সাফল্য লাভে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হলো:

১. লক্ষ্য অর্জন: ফলপ্রসূ যোগাযোগ সংগঠনের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলকে মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে সমর্থ করে। যোগাযোগের উপস্থিতির কারণেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মী সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়।

২. পরিকল্পনা প্রণয়ন: ব্যবসায়িক কার্যাবলি দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নানারূপ তথ্য প্রয়োজন হয়। যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং এর দ্বারা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৩. পলিসি নির্ধারণ: কারবার সংগঠনের সার্বিক সফলতা নির্ভর করে পলিসি নির্ধারণের উপর। যোগাযোগ বিভিন্ন পক্ষের মতামত সংগ্রহের মাধ্যমে পলিসি প্রণয়নে সহায়তা করে।

৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: পরিকল্পনা প্রণয়নের পর এর সার্বিক বাস্তবায়ন আবশ্যিক। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে হয়। যোগাযোগই প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে থাকে।

৫. পরিকল্পনা ও নীতির ব্যাখ্যা: প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত পরিকল্পনা কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য অনেক সময়ই নিচের স্তরের কর্মচারীদের উচ্চস্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়।

৬. সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি: কারবার প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা তথা গতিশীলতা বৃদ্ধিতে যোগাযোগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগের তেমন বাস্তব প্রয়োগ নেই সেখানে লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

৭. কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি: যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করে বলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৮. সমস্যা সম্পর্কে অবগত করা: যোগাযোগের মাধ্যমে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীগণ কারবার প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মীদের সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। এতে তারা সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। ফলে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৯. তথ্যের আদান-প্রদান: যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকে। ফলে সবাই তাদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা: কারবারের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। আর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য যা জোগান দেয় দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

১১. অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা: যোগাযোগ কারবার প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এরূপ পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক।

১২. সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি: যোগাযোগের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে আন্তরিকতা ও পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পায়। ফলে একে অপরকে কার্য সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসে।

১৩. মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা: উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এতে শিল্প বিরোধের মতো অবাঞ্ছিত ঘটনাবলি হ্রাস পায়।

১৪. পণ্য প্রচার: নতুন উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে সম্ভাব্য ভোক্তাদের অবগত করানোর জন্য প্রচারকার্য সম্পাদনে ব্যবসায়ীকে যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে হয়।

১৫. কর্মীদের আগ্রহ সৃষ্টি: যোগাযোগের মাধ্যমে কারবারের বিভিন্ন দিক কর্মীদের অবহিত করে। ফলে কর্মীরা তাদের কার্য সম্পাদনে আগ্রহী হয়।

১৬. নেতৃত্বের বিকাশ: যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে তার নেতৃত্বের প্রসার ঘটাতে পারে। যোগাযোগের উপর গুরুত্বারোপ করা না হলে নেতৃত্ব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

১৭. বাজার গবেষণায় সহায়তা: বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক কারবারি জগতে টিকে থাকতে হলে কারবার প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগী এবং ক্রেতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকলে ব্যবস্থাপক বাজার গবেষণার সাহায্যে এ সমস্ত বিচারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এ সকল তথ্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

১৮. বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক: ব্যবসায়-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিকতা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়।

প্রশ্নমালা-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শব্দটি কোন দেশীয় শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে?
২. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কাকে বলা হয়?
৩. আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক বা মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
৪. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
৫. প্রেষণা কী?
৬. কর্মী উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
৭. নির্দেশনাকে প্রতিষ্ঠানের রূপগুণ বলা হয় কেন?
৮. সমচ্ছেদ বিন্দু কাকে বলে?
৯. অনুপাত বিশ্লেষণ কাকে বলে?
১০. বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
১১. বাজার সমীক্ষা কাকে বলে?
১২. 'Communication)' শব্দটি কোন দেশীয় শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে?
১৩. কীভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়?
১৪. যোগাযোগ কী?
১৫. মানুষ কেন এবং কীভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে?
১৬. যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী?
১৭. যোগাযোগের আওতা বা পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত?
১৮. কীভাবে যোগাযোগের পরিপূর্ণতা লাভ করে?
১৯. যোগাযোগ প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পূর্ণ হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
২. উৎপাদন পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।
৩. উৎপাদন নিয়ন্ত্রক কাকে বলে?
৪. মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
৬. বিক্রয় প্রসার কাকে বলে?
৭. কর্মী ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও।

৮. কর্মী সংগ্রহের উৎস কয়টি ও কী কী উল্লেখ কর।
৯. কর্মী নির্বাচনের সংজ্ঞা দাও।
১০. যোগাযোগের সংজ্ঞা দাও।
১১. বাণিজ্যিক যোগাযোগ কাকে বলে?
১২. ফলাবর্তন বলতে কী বোঝায়?
১৩. যোগাযোগ প্রক্রিয়া কাকে বলে?
১৪. ব্যবসায়িক যোগাযোগ কীভাবে সংঘটিত হয়?
১৫. যোগাযোগকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুতন্ত্র বলা হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি আলোচনা কর।
২. ব্যবস্থাপনার গৌণ কার্যাবলি আলোচনা কর।
৩. আধুনিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।
৪. সমচ্ছেদ বিশ্লেষণের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৫. সমচ্ছেদ বিন্দু তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ কর।
৬. লেখচিত্রের মাধ্যমে সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় কর।
৭. কর্মী সংগ্রহের উৎসগুলো আলোচনা কর।
৮. কর্মী নির্বাচনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।
৯. কর্মী উন্নয়ন বা প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।
১০. যোগাযোগের আওতা বা পরিধি আলোচনা কর।
১১. যোগাযোগ প্রক্রিয়া কী? চিত্রের সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
১২. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ আলোচনা কর।
১৩. ব্যবসায় যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

লেনদেন ও হিসাবরক্ষণ

(Book-Keeping System)

৭.১ লেনদেন পদ্ধতি ও প্রকারভেদ

হিসাবরক্ষণ (Book-Keeping System) হচ্ছে একটি তথ্য সরবরাহকারী পদ্ধতি, যার দ্বারা ব্যবসার ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। হিসাবরক্ষণের সাহায্যে আমরা প্রথমত ব্যবসার লেনদেন সংরক্ষণ করতে পারি। দ্বিতীয়ত, আর্থিক লেনদেনের প্রকৃতি অনুসারে ভাগ করে সাময়িক ফলাফল জানতে পারি এবং এর সমষ্টি নির্ণয় করা যায়। তৃতীয়ত, হিসাবরক্ষণের তথ্য থেকে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি হিসাব ও উদ্ভূতপত্র প্রস্তুত করতে পারি।

একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ করতে পারেন। তিনি প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, মাসিক বিভিন্ন সময়কালের আর্থিক লেনদেন তথ্যের হিসাব রাখতে পারেন। যে পদ্ধতিতেই হিসাব রাখা হোক না কেন বছর শেষে লাভ-ক্ষতি হিসাব (Profit and Loss Account) ও বছরান্তে উদ্ভূতপত্র (Balance Sheet) তৈরি করা হয়।

বুককিপিং একটি সামাজিক শাস্ত্র। প্রতিদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে। এ লেনদেন সংরক্ষণ করা না হলে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি হিসাব ও আর্থিক অবস্থা জানা যায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে হয় বিধায় বিভিন্ন কাজে অর্থ খরচ করতে হয়। বর্তমান জগতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নানা ধরনের আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। এ লেনদেনসমূহকে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করার কাজই হলো বুককিপিং। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৪৯৪ সালে একজন ইতালীয় ধর্মযাজক ও গণিত শাস্ত্রবিদ তার রচিত সুমা ডি এরিথমেটিকা জিওমেট্রিয়া প্রপোরশনিয়েট প্রটোরশনলিটা (Summa de Arithmetica Geometrica Proportionet Proportionnilita) গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে হিসাবরক্ষণের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা প্রবর্তন করেন। বুককিপিং-এর ক্ষেত্রে তার প্রবর্তিত ধারণা হলো দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি। লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli) উদ্ভাবিত দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন হিসাবরক্ষণ কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমানকালে হিসাবশাস্ত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও লুকা প্যাসিওলি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির জনক বলা হয়।

বর্তমান বিশ্বের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বুককিপিং-এ সংযোগ ঘটছে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল।

হিসাবরক্ষণ বা বুককিপিং-এর সংজ্ঞা

Definition of Book-Keeping

ইংরেজি ‘Book-Keeping’ এর বাংলা পরিভাষা হিসাবরক্ষণ। ইংরেজি ভাষায় Book শব্দের অর্থ বই এবং Keeping শব্দের অর্থ সংরক্ষণ। তা হলে Book-Keeping শব্দের অর্থ হলো বই সংরক্ষণ। কিন্তু বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হিসাবের বই এবং এর অর্থ সুষ্ঠু, সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে হিসাবরক্ষণের পদ্ধতিকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে বুককিপিং বলতে ব্যবসা সংঘটিত আর্থিক লেনদেনসমূহ সুষ্ঠু, সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হিসাবের বইতে সংরক্ষণ করার কলাকৌশলকে বোঝায়।

নিম্নে প্রখ্যাত হিসাব শাস্ত্রবিদদের প্রদত্ত বুককিপিং-এর জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১. জে.আর. বাটলিয়ার-এর মতে, ‘কারবার সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ এক প্রস্থ হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করার কলাকৌশলকেই বুককিপিং বলা হয়।’

[‘Book-Keeping is the art of recording Business dealing in a set of Books.’]

২. আর.এন. কার্টার-এর মতে, ‘অর্থ বা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য জিনিসের হস্তান্তরিত কারবারি লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার বিজ্ঞান এবং কলাকেই বুককিপিং বলা হয়।’

[‘Book-Keeping is the science and art of correctly recording in books of account all those business transactions that results in the transfer of money or money’s worth.’ –R.N.Carter.]

৩. নর্থ কট-এর মতে, ‘হিসাবের বইতে ব্যবসায়িক অথবা আর্থিক লেনদেনগুলোকে স্বীকৃত পদ্ধতিতে আর্থিক পরিমাপে লিপিবদ্ধ করার কৌশলকে বুককিপিং বলে।’

[‘Book-Keeping is the art of recording in books of accounts, the monetary aspect of commercial or financial transaction.’ North cott.]

৪. এফ. ডব্লিউ পিকসলিন-এর মতে, ‘বুককিপিং এমন একটি বিজ্ঞাপন যা সব ধরনের আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে।’

৫. এল. সি. ক্রপার-এর মতে, ‘বুককিপিং এমন একটি বিজ্ঞান যার সাহায্যে টাকা বা টাকায় পরিমাপযোগ্য লেনদেনসমূহ এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা যায় যাতে পরবর্তী যে কোনো তারিখে প্রত্যেক লেনদেনের প্রকৃতি ও ফলাফল পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় এবং এতে করে পরে যে কোনো তারিখে এভাবে রক্ষিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হিসাবসমূহ মালিকের আর্থিক অবস্থার প্রদর্শন করতে পারে।

পরিশেষে উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, কলাকৌশল ও নিয়ম-নীতির মাধ্যমে কারবারি লেনদেনসমূহকে কোনো হিসাবের বইতে সুষ্ঠু, সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। যার ফলে যে কোনো নির্দিষ্ট সময় পরে লেনদেনের প্রকৃতি ও ফলাফল নির্ণয় করে ব্যবসার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় তাকে বুককিপিং বলা হয়।

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Accountancy)

সাধারণ অর্থে হিসাববিজ্ঞান বলতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলভাবে লেনদেন সংরক্ষণ, ফলাফল নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করাকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে: যে শাস্ত্র কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলি হিসাবের বইতে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করার কলাকৌশল শিক্ষা দেয়, যা থেকে নির্দিষ্ট সময় শেষে এর সঠিক ফলাফল নিরূপণ করা যায় তাকে হিসাববিজ্ঞান বলে।

নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো :

১. এফ.ডব্লিউ. পিকসলি (F.W. Pixly)-এর মতে, 'হিসাববিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা সব ধরনের আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে।'
২. এ.ডব্লিউ জনসন (A.W. Johnson)-এর মতে, 'অর্থের অংকে পরিমাপযোগ্য কারবারি লেনদেনসমূহ সংগ্রহ, সংকলন, সুসংবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, সেগুলোর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়।'
৩. রবার্ট আর.এন. এন্থনি (R.N. Anthony)- এর মতে, 'হিসাববিজ্ঞান কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পর্কে অর্থের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংক্ষিপ্তকরণ, বিশ্লেষণ ও বিবরণ প্রদান করার একটি পদ্ধতি।'
৪. আমেরিকান একাউন্টিং এসোসিয়েশন (American Accounting Association)-এর মতে, 'যে অর্থনৈতিক তথ্য নির্ণয়, পরিমাপ এবং সরবরাহ করার পদ্ধতিতে তথ্য ব্যবহারকারীগণ অর্থনির্ভর বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে তাকে হিসাববিজ্ঞান বলে।'

পরিশেষে উপরিস্থ সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, হিসাববিজ্ঞান হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যার সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কারবারের লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে কারবারের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় এবং সঠিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

বুক কিপিং এর উদ্দেশ্যসমূহ (Objects of Book-keeping)

প্রত্যেক কারবার প্রতিষ্ঠান তার আর্থিক লেনদেনগুলোর ফলাফল জানতে আগ্রহী। বুককিপিং-এর মাধ্যমে এরূপ ফলাফল জানা সম্ভব। বুক-কিপিং এর মাধ্যমে কারবারি যে কোনো সময় তার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা, লাভ-ক্ষতি, দেনা-পাওনাদার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হতে পারে। যে কোনো কারবার

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের ফলাফল নিরূপণ করাই বুক কিপিং-এর প্রধান উদ্দেশ্য। নিম্নে প্রধান উদ্দেশ্যগুলো বর্ণিত হলো:

১. কারবারসংক্রান্ত লেনদেনের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ: কোনো প্রতিষ্ঠানের কারবারসংক্রান্ত লেনদেনগুলোর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হিসাবের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য। এর ফলে ব্যবসায়ী ভবিষ্যতের যে কোনো সময় স্মৃতিশক্তির সাহায্য ছাড়াই লেনদেনের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব।
২. কারবারের লাভ-লোকসান নির্ণয়: প্রত্যেক কারবার প্রতিষ্ঠানই কোনো নির্দিষ্ট সময়ান্তে তার আর্থিক ফলাফল অর্থাৎ লাভ-লোকসান জানতে আগ্রহী। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি হিসাব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসায়ী যে কোনো সময় ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাব তৈরির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান নির্ণয় করতে পারে।
৩. কারবার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ: একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দেনা-পাওনা, সম্পদ ও দায় মূলধন তথা সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হিসাববিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য। একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে উদ্ভূতপত্র প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানা যায়।
৪. নগদ টাকার অবস্থা নিরূপণ: কারবারের হিসাব বইগুলোর মধ্যে নগদান বই অন্যতম প্রধান বই। এ বইয়ে নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদানের হিসাব রাখা হয়। তাছাড়া হাতে নগদ টাকা ও ব্যাংকে জমা নগদের পরিমাণও জানা যায়।
৫. যাবতীয় সম্পদ ও দায়-দেনার উপর নিয়ন্ত্রণ: সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দেনার সঠিক অবস্থা জানা যায়। ফলে কারবারের সম্পত্তির পরিমাণ কমে গেলে অথবা দায়-দেনার পরিমাণ বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
৬. কারবার প্রতিষ্ঠানের দেনা ও পাওনার পরিমাণ নির্ধারণ: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানে সমুদয় আর্থিক লেনদেনগুলোকে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট দিনে কারবার প্রতিষ্ঠানের মোট দেনা ও পাওনার পরিমাণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।
৭. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানে সমুদয় আর্থিক লেনদেনগুলোকে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট দিনে কারবার প্রতিষ্ঠানের মোট দেনা ও পাওনার পরিমাণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।
৮. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা: কারবার প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলো সঠিকভাবে হিসাবের বইয়ে সংরক্ষণের ফলে প্রত্যেক হিসাব খাতের ব্যয়ের পরিমাণ পৃথকভাবে জানা যায়। ফলে ব্যবসায়ী প্রয়োজনবোধে তার ব্যবসার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
৯. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেন হিসাবের বইয়ে সংরক্ষণ করলে এবং পরবর্তীতে রেওয়ামিল তৈরি করার মাধ্যমে হিসাবসমূহের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হিসাব সংরক্ষণের উদ্দেশ্য।

১০. চুরি ও জালিয়াতি রোধ: বর্তমানকালে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে চুরি ও জালিয়াতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে সহজেই এসব ধরা পড়ে এবং সহজেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১১. কর নির্ধারণে সহায়তা: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের সমুদয় হিসাব স্বীকৃত হিসাব পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হলে আয় কর বা বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের নিকট তা অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। ফলে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আয়কর এবং বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের নিকট তা অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। ফলে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আয়কর এবং বিক্রয় কর সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান সহজতর হয়।

১২. কারবার পরিচালনায় সাফল্য অর্জন: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের সমুদয় লেনদেনগুলো হিসাবের বইয়ে সংরক্ষণের ফলে ব্যবসায়ী কারবারের বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারে। ফলে কারবারি কারবারের বিভিন্ন তথ্য প্রয়োগের মাধ্যমে কারবারের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কারবার পরিচালনার সাফল্য অর্জন করতে পারে।

১৩. অর্থনৈতিক তথ্য পরিবেশন করা: আর্থিক বিবরণী, বিকৃতি ও প্রতিবেদন তৈরি করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অর্থনৈতিক তথ্য যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো হিসাবরক্ষণের উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, হিসাবরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে ও সঠিক নিয়মে হিসাব সংরক্ষণ করে প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে লাভবান হতে সহায়তা করে।

হিসাবরক্ষণের সুবিধাসমূহ (Advantages of Book keeping)

হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী বিভিন্নভাবে সুবিধা পেয়ে থাকে। নিম্নে প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. লেনদেনের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ: কারবার প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন অসংখ্য লেনদেন সংঘটিত হয়। এ সকল লেনদেন অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী তার ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন। ফলে ভবিষ্যতে যে কোনো সময় স্মৃতিশক্তির সাহায্য ছাড়াই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

২. কারবারের লাভ-লোকসান নির্ণয়: কারবার প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলো সঠিকভাবে রাখলে কোনো নির্দিষ্ট সময় পরে তার কারবারের লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করে কারবারের লাভ-লোকসান নির্ণয় করতে পারে।

৩. সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ণয়: যে কোনো সময় কারবারের উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করে কারবারের সঠিক আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ মূলধন, মোট পাওনা, মোট সম্পত্তি, হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

৪. নগদ অর্থের পরিমাণ জানা: সঠিকভাবে হিসাব রাখলে যে কোনো সময় ব্যবসায়ী তার নগদান বই তৈরির মাধ্যমে নগদ অর্থের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

৫. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ: কারবার প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলো সঠিকভাবে হিসাবে সংরক্ষণ করলে ব্যবসায়ের প্রত্যেক হিসাব খাতের ব্যয়ের পরিমাণ পৃথক পৃথকভাবে জানা যায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের আয় অনুপাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৬. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি মোতাবেক রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

৭. চুরি ও জালিয়াতি রোধ: সুষ্ঠুভাবে হিসাব রাখা হলে রেওয়ামিল তৈরির মাধ্যমে বিভিন্ন রকম চুরি ও জালিয়াতি ধরা পড়ে এবং তা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

৮. বকেয়া দেনা পাওনা নিষ্পত্তি: হিসাবের মাধ্যমে বকেয়া দেনা-পাওনার বিবরণী প্রস্তুত করে যথাসময়ে দেনা পরিশোধ ও পাওনা আদায় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৯. কর নির্ধারণে সহায়তা: হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় কারবার প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হিসাবসমূহ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে আয়কর ও বিক্রয়কর ইত্যাদি নির্ধারণ করা সহজতর হয়।

১০. তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ: সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে বিচার করলে বর্তমান হিসাবকালের লাভ-লোকসান এবং সম্পত্তি ও দায়ের সাথে পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ বিষয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়, যা ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবসায়ীকে সহায়তা করে।

১১. আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান: সঠিক পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করলে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের রেকর্ড যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা সহজতর হয়।

১২. বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা: কারবার প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন পক্ষের অর্থাৎ দেনাদার, পাওনাদার, মালিক, কর্মচারীর মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। কারবারের লেনদেনগুলোর সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করলে এরূপ পরিস্থিতির সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পায়।

১৩. কারবার পরিচালনায় সহায়তা: সঠিক হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে কারবারের আয়-ব্যয় ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়। তাছাড়া লাভজনক ও অলাভজনক আয়-ব্যয় চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১৪. অন্যান্য সুবিধা: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হলে দেনা-পাওনার পরিমাণ জানা, বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ, দৈনন্দিন পরিস্থিতি জানা, বিলোপ সাধনে সহায়তা ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়।

হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

(Distinguish Between Book-keeping and Accountancy)

হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এটি একই কাজের দুইটি ধাপ মাত্র। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক সময় হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানকে অজ্ঞানতাবশত একই অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নে দেখানো হলো:

হিসাবরক্ষণ (Book-keeping)	হিসাববিজ্ঞান (Accountancy)
১. সংজ্ঞা: কারবার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করার কলাকৌশল হলো হিসাবরক্ষণ।	২. হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনগুলো থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ, প্রতিবেদন বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাকরণই হলো হিসাববিজ্ঞান।
২. প্রথম ও প্রধান কাজ: হিসাবরক্ষণের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে সংঘটিত লেনদেনগুলোকে সঠিকভাবে সংগ্রহ করা এবং হিসাবের বইয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা।	২. হিসাববিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে হিসাবরক্ষক কর্তৃক সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধকৃত হিসাবসমূহের গাণিতিক শুদ্ধতা রেওয়ামিলের মাধ্যমে যাচাই করা।
৩. অন্যতম কাজ: প্রাথমিক হিসাবের বই হতে লেনদেনগুলোতে সংশ্লিষ্ট খতিয়ান হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করে লিপিবদ্ধ করা।	৩. নির্দিষ্ট হিসাব বছর শেষে প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত লেনদেনগুলোর সামগ্রিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা।
৪. কাজের প্রকৃতি: হিসাবরক্ষণের কাজের প্রকৃতি মূলত একজন করণিকের কাজ।	৪. হিসাববিজ্ঞানীর কাজ হলো কারবারের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করা।
৫. তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক: হিসাবরক্ষণ কাজে তাত্ত্বিক গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়।	৫. হিসাববিজ্ঞান কাজে ব্যবহারিক দিকের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
৬. উদ্ভূতপত্র নির্ণয়: খতিয়ান বইতে লিপিবদ্ধকৃত বিভিন্ন হিসাব খাতগুলোর উদ্ভূত নির্ণয় করা হিসাবরক্ষণের কাজ।	৬. হিসাবকালের জন্য লাভ-লোকসান হিসাব এবং উদ্ভূতপত্র প্রস্তুত করা হিসাববিজ্ঞানের কাজ।

হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের আওতা বা পরিধি

(Scope of Book-keeping and Accountancy)

হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের আওতা বা পরিধি বলতে এর কার্যক্ষেত্রকেই বোঝায়। সাধারণভাবে মনে করা হয় হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের আওতা কেবল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আসলে বাস্তবে তা সম্ভব নয়। হিসাবরক্ষণের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিলসহ পেশাজীবীদের আর্থিক কার্যকলাপ হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। মোটকথা যেখানেই আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়, সেখানেই হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের আওতা ও পরিধির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. ব্যক্তিগত জীবনে হিসাবরক্ষণ: মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে সেগুলো সুষ্ঠুভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করলে তার জমা-খরচ এবং ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা নির্ণয় করা যায়।
২. কারবার প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ: প্রতিটি কারবার প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। কারবারের লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায়।
৩. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ: অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, ক্লাব সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য হিসাবরক্ষণ কার্য অপরিহার্য। কারণ এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে থাকে।
৪. সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য হিসাবরক্ষণ: সরকারের বিভিন্ন অফিস, আদালত এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থার আয়-ব্যয় নির্ধারণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য হিসাবরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। হিসাববিজ্ঞানের জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি ও অবনতি জানা যায়।
৫. পেশাজীবীদের জন্য হিসাবরক্ষণ: পেশাজীবী ব্যক্তি অর্থাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, অভিনেতা, অভিনেত্রী ইত্যাদি পেশাদার ব্যক্তিবর্গ উপার্জন করে থাকে। তারাও তাদের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে। কারণ তাদের আয়ের উপর সরকারকে কর দিতে হয় বিধায় তাদের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখা বাধ্যতামূলক।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা সুস্পষ্ট যে হিসাববিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত। অর্থাৎ বর্তমানে এর ব্যাপকতা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত।

হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

(Necessity of Book-keeping and Accountancy)

আধুনিক বিশ্বে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে হিসাবসমূহ লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানই বহুবিধ সুবিধা ভোগ করে থাকে। এ কারণেই হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্নমুখী ব্যবহার ও উপযোগিতার প্রেক্ষিতে নিম্নে হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো:

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে

১. লেনদেন লিপিবদ্ধ করা: হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলো সঠিকভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়। সঠিকভাবে হিসাবগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২. লাভ লোকসান নিরূপণ: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে তা জানার জন্য সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাব প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ-লোকসান জানা সম্ভব হয়।

৩. আর্থিক অবস্থা নিরূপণ: একটি কারবার প্রতিষ্ঠানের তহবিলের উৎস ও প্রয়োগবিধি প্রকাশ করে উদ্বৃত্তপত্রের মাধ্যমে আমরা কারবারের সঠিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করতে পারি।

৪. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ: হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়সংক্রান্ত হিসাবগুলো যেমন-বেতন, মজুরি ইত্যাদি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আয়ের অবস্থা বুঝে ব্যয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. চুরি ও জালিয়াতি রোধ: সঠিক ও নিয়মিতভাবে হিসাব রাখা হলে চুরি ও জালিয়াতি সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

৬. ভুল-ভ্রান্তি নিরূপণ ও সংশোধন: হিসাবের বইয়ে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকলে হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে তা সহজেই নিরূপণ করা যায় এবং প্রয়োজনমতো সংশোধনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

৭. মূল্য সংযোজন কর: বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই নতুন করে ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন কর চালু হয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠানকে উক্ত কর প্রদান করতে হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কী পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হবে তা নিরূপণের জন্য হিসাবরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

৮. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ: হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী নীতিনির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়।

৯. কারবার পরিচালনায় সহায়তা: হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান বিভিন্নভাবে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে

১. প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিকট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমে সর্বাধিক উপকৃত হন প্রতিষ্ঠানের মালিক। চূড়ান্ত হিসাব হতে মালিক কারবারের ফলাফল এবং প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানতে পারে। এর মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে কারবারে সম্প্রসারণ বা সংকোচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

২. প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিকট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উন্নতি ও অবনতির সাথে কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সার্বিক অবস্থা জানতে আগ্রহী থাকে এবং তা সংরক্ষিত হিসাব হতে জানতে পারে।

৩. সরকারের নিকট গুরুত্ব: সরকারের নিকট হিসাবরক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী হতে দেশের সরকার আয়কর, বিক্রয় কর, বাণিজ্যনীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সংগ্রহ করতে পারে।

৪. অ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের দ্বারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সমবায় সমিতি, কৃষি খামার ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানও এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এ হিসাব হতে প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় এবং উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কে জানতে পারেন।

৫. পুঁজি বিনিয়োগকারীদের নিকট: একটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থার উপর বিবেচনা করে একজন বিনিয়োগকারী তার পুঁজি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাসিক বা বার্ষিক বিবরণী বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৬. গবেষকদের নিকট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণারত ব্যক্তিদের নিকটও হিসাবরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁরা গবেষণার সময় হিসাব বিবরণীসমূহ বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন। এ প্রতিবেদন হতে দেশের সরকার ও আর্থিক পরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে থাকেন।

৭. মূল্যবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: সামাজিক জীবনে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাবরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিসাবরক্ষণ সচেতন মানুষকে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে, নৈতিক চরিত্র গঠনে, সঞ্চয়ীদের মিতব্যয়ী হতে সহায়তা করে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, সঠিকভাবে সংরক্ষিত হিসাব হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত দ্বারা সমাজে বসবাসরত সকলেই কমবেশি উপকৃত হয়।

হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (Method of Book keeping)

হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি দুইরকম। যথা—

১. একতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি।
২. দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি।

হিসাবরক্ষণের এ পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System)। বর্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হিসাবরক্ষণ আধুনিক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি বর্ণনার পূর্বে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জানা দরকার।

১. সম্পদ (Assets)
২. মূলধন (Capital)
৩. ঋণ (Credit)

দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিতে এ তিন ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে হিসাব রক্ষিত হয়।

১. সম্পদ (Assets): এখানে সম্পদ বলতে ব্যবসার প্রয়োজনে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হয়। যেমন—জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্টেশনারি দ্রব্য, এমনকি নগদ টাকাও সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

২. মূলধন (Capital): মূলধন হচ্ছে ব্যবসায় সম্পদ ক্রয় করার জন্য এবং সেই সাথে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ ও ব্যবসায় মূলধন।

৩. ঋণ (Credit): ঋণ হচ্ছে উক্ত সম্পদগুলোর ক্রয় করার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোনো শর্তের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে তখন সেই পরিমাণ অর্থকে ঋণ বলে। যেমন—ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, কোনো পণ্য দ্রব্য বাকিতে ক্রয় করা অথবা কোনো পাওনা এখনও পরিশোধ করা হয়নি এমন অর্থও ঋণ পাওনা হিসাবে দেখানো হয়।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণের সময় নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা (Definition of Double Entry System):

যে পদ্ধতির প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে সমান টাকার অংকে একটিকে ডেবিট এবং অপরটিকে ক্রেডিট করে হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির কতিপয় জনপ্রিয় সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. উইলিয়াম পিকলস-এর মতে, 'দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে টাকা বা টাকায় পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত সত্তায় প্রকাশ করা হয়। ফলে একটি হিসাব খাতকে প্রাপ্ত সুবিধার জন্য ডেবিট এবং সুবিধা প্রদানকারী হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। এটাই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি।'।

২. অধ্যাপক ব্রুক ও পামার আর্চারের মতে, 'প্রতিটি লেনদেনের দ্বৈত সত্তা লিপিবদ্ধ করে কারবারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।'।

৩. স্পাইসার ও পেগলার-এর মতে, 'যে পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনকে সমপরিমাণ অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ এক ব্যক্তির নিকট হতে যে সুবিধা পায় এবং অপর ব্যক্তিকে সমান মূল্যের সুবিধা প্রদান করে তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।'।

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট এই দ্বৈত সত্তা দু'টি পৃথক হিসাব খাতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতিসমূহ (The Principle of Double Entry System)

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত, স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হিসাবব্যবস্থা। ইতালীয় ধর্মযাজক লুকা প্যাসিওলি ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রচলন করেন। এ পদ্ধতি একটি সুশৃঙ্খল এবং সুসংবদ্ধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান বিশ্বে এ ব্যবস্থাটি হিসাবরক্ষণের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত এবং সুসংবদ্ধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হলো:

১. লেনদেনের দ্বৈত সত্তা লিপিবদ্ধকরণ: প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ বা হিসাব খাত বিদ্যমান থাকে। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির অন্যতম মূলনীতি হলো হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিক বা লেনদেনের দ্বৈত সত্তাকে লিপিবদ্ধ করে।

২. ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়: প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকে। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির একটি বিশেষ মূলনীতি হলো প্রতিটি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট যথাযথভাবে নির্ণয় করা।

৩. দাতা ও গ্রহীতা নির্ণয়: প্রতিটি লেনদেনে একটি পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে এবং অপর পক্ষ সুবিধা প্রদান করে। দু'তরফা পদ্ধতিতে সুবিধা গ্রহণকারী হিসাবকে বলে ডেবিট এবং সুবিধা প্রদানকারী হিসাবকে বলে ক্রেডিট।

৪. সমান অংকের আদান-প্রদান: প্রতিটি লেনদেনের দাতা ও গ্রহীতার টাকার অংক সমান হবে।

৫. ফলাফল নিরূপণ: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে মোট ডেবিটের সমষ্টি মোট ক্রেডিটের সমষ্টির সমান হয়। এতে ফলাফল নিরূপণ সহজ হয়।

৬. দুটো দিক: প্রতিটি হিসাবকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। হিসাবের বাম দিককে ডেবিট দিক এবং ডান দিককে ক্রেডিট দিক বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোনো লেনদেনই উপরোক্ত মূলনীতির ব্যতিক্রম হবে না। ব্যতিক্রম হলে হিসাব বইয়ে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে না। এতে হিসাব-নিকাশের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ (Advantages of Double Entry System)

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব রাখার একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বর্তমান বিশ্বে এ পদ্ধতি সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। এ পদ্ধতিতে সকল প্রতিষ্ঠান হিসাব সংরক্ষণ করে। নিম্নে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেনের দ্বৈত সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব রাখা সম্ভব।

২. গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হলে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

৩. লাভ-লোকসান নির্ণয়: এ পদ্ধতিতে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়; ফলে কোনো নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে সহজেই লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুত করে কারবারের সঠিক লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা যায়।

৪. দেনা-পাওনার পরিমাণ জানা: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে মোট দেনা ও মোট পাওনার পরিমাণ জানা যায় এবং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা সহজ হয়।
৫. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব যথাযথভাবে রাখা হয়। ফলে উদ্ভূতপত্র প্রস্তুতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়।
৬. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ: তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত খরচ কমিয়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৭. তুলনামূলক বিশ্লেষণ: এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হলে চলতি হিসাবকালের সাথে সহজেই এক বা একাধিক হিসাবকালের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা যায়।
৮. চুরি ও জালিয়াতি রোধ: এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে হিসাবের ভুলত্রুটি ও জালিয়াতি সহজে উদ্ঘাটন করা যায় এবং চুরি ও জালিয়াতির হাত থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষাও করা যায়।
৯. তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ: এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার মাধ্যমে ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সহজেই সংগ্রহ করা যায় এবং প্রয়োজনে তথ্যসমূহ সরবরাহ করে ব্যবসায়ীকে সহায়তা করা যায়।
১০. সহজ প্রয়োগ: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হওয়ায় ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োগ করা যায়।

৭.২ মোবাইল ব্যাংকিং ও এর কার্যাবলি

মোবাইল ব্যাংকিং বর্তমানে ব্যাংকিং সেটরে এক যুগান্তরকারী পদ্ধতি। নগদ টাকার লেনদেন মুহূর্তেই গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার অনলাইন সিস্টেমকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট। আজকাল প্রায় ব্যাংকেই মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম চালু হয়েছে। এতে গ্রাহকের একটি এটিএম কার্ড সঙ্গে রাখতে হয়; যা এটিএম বুথে মেশিনে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা ব্যাংক একাউন্টে গচ্ছিত থাকা সাপেক্ষে উত্তোলন করা সম্ভব হয়।

৭.৩ ব্যবসায় হিসাবরক্ষণ বহিসমূহ লেখার নিয়মাবলি

নগদান বই (Cash Book): যে হিসাবের বইয়ে সর্বপ্রকার নগদ টাকার আদানপ্রদান বা প্রাপ্তি পরিশোধ সংক্রান্ত তারিখের ক্রমানুসারে প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ান্তে ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয় তাকে নগদান বই বলা হয়। নগদান বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় দু'টি দিক থাকে। একটি ডেবিট দিক এবং একটি ক্রেডিট দিক। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত প্রাপ্ত নগদ টাকা ডেবিট দিকে এবং যাবতীয় নগদ টাকা প্রদান বা পরিশোধ ক্রেডিট দিকে লেখা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর নগদান বইয়ের জের বা ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নগদ প্রাপ্তি অপেক্ষা নগদ প্রদানের পরিমাণ কখনোই বেশি হতে পারে না। তাই নগদান বইয়ের সর্বাবস্থায় ডেবিট ব্যালেন্স হয়। উক্ত ডেবিট ব্যালেন্সের পরিমাণ নগদ তহবিলের সমান হয়।

নিম্নে নগদান বইয়ের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১. জন রুটলি (John Routly)-এর মতে, 'যে বইয়ে কারবারের নগদ টাকার আদান-প্রদান লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় তাকে নগদান বই বলা হয়।'

২. অধ্যাপক চেম্বার (Prof. Chamber)-এর মতে, 'নগদান টাকার প্রাপ্তি ও বাট্টা সংক্রান্ত হিসাব যে বইতে রাখা হয় তাকে নগদান বই বলে।'

৩. এল.সি ক্রুপার-এর মতে, 'একজন ব্যক্তি অর্থের আদান প্রদান করে যে বইতে লিপিবদ্ধ করে রাখে তাকেই নগদান বই বলে।'

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, 'কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকার লেনদেনসমূহ অর্থাৎ নগদ প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ তারিখের ক্রমানুসারে হিসাবের যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বই বলে।'

নগদান বইয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Cash Book)

কারবার প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত লেনদেনের প্রকৃতি, পরিমাণ ও প্রয়োজন অনুসারে নগদান বইকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. একঘরা নগদান বই (Single Column Cash Book)
২. দু'ঘরা নগদান বই (Double Column Cash Book)
৩. তিনঘরা নগদান বই (Three Column Cash Book)
৪. খুচরা নগদান বই (Petty Column Cash Book)

নিম্নে নগদান বইয়ের উপরোক্ত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো:

১. একঘরা নগদান বই (Single Column Cash Book)

যেসব প্রতিষ্ঠানে নগদেই অধিকাংশ লেনদেন সম্পাদিত হয়ে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানে একঘরা নগদান বই সংরক্ষণ করে। যে নগদান বইয়ের উভয় দিকে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য একটি করে ঘর থাকে তাকে একঘরা নগদান বই বলে। সাধারণ ছোট ছোট বই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এ বই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একঘরা নগদান বইয়ের ছক নিম্নরূপ:

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	রসিদ	খ.প্:	পরিমাণ টাকা	তারিখ	বিবরণ	রসিদ	খ.প্:	পরিমাণ টাকা

১. দু'ঘরা নগদান বই (Double Column Cash Book)

নগদ ও ব্যাংকসংক্রান্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য যে নগদান বইয়ের উভয় পার্শ্বে নগদ ও ব্যাংকের জন্য পৃথক টাকার ঘর রাখা হয় তাকে দু'ঘরা নগদান বই বলা হয়। সকল প্রকার নগদ ও ব্যাংক প্রাপ্তিসমূহ এ বইয়ের ডেবিট দিকে এবং সকল প্রকার নগদ ও চেকের মাধ্যমে প্রদান ক্রেডিট-এর দিকে লেখা হয়।

দু'ঘরা নগদান বইয়ের ছক নিম্নরূপ:

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	নগদ	ব্যাংক	তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	নগদ	ব্যাংক

৩. তিনঘরা নগদান বই (Three Column Cash Book)

যে নগদান বইয়ে ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় পার্শ্বে নগদ, ব্যাংক ও বাটাসংক্রান্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনটি করে টাকার ঘর থাকে তাকে তিনঘরা নগদান বই বলা হয়। দেনাদারের নিকট হতে টাকা আদায় করার জন্য যে বাট্টা প্রদান করা হয় তা ডেবিট দিকের বাট্টার ঘরে লিখতে হয় এবং পাওনাদারকে টাকা পরিশোধ করার সময় যে বাট্টা পাওয়া যায় তা ক্রেডিটের দিকে বাট্টার ঘরে লিখতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাট্টার জন্য ব্যালেন্স নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই। কারণ ডেবিট ও ক্রেডিট ঘরের যোগফল স্বতন্ত্র খতিয়ান ব্যালেন্স হিসেবে বিবেচিত হয়।

তিনঘরা নগদান বইয়ের ছক নিম্নরূপ:

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	বাট্টা	নগদ	ব্যাংক	তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	বাট্টা	নগদ	ব্যাংক

৪. খুচরা নগদান বই (Petty Column Cash Book): যে নগদান বইতে কারবার প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ছোট অংকের খরচগুলো তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খুচরা নগদান বই বলা হয়।

দু'ঘরা এবং তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করার নিয়মাবলি

(Rules for Preparing Double, Tripple Column Cash Book)

১. প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এবং ব্যাংক উদ্বৃত্ত: দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইতে ডেবিট দিকে ব্যালেন্স সি/ডি বাবদ নগদ তহবিল নগদ ঘরে এবং ব্যাংক উদ্বৃত্ত ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক জমাতিরিক্ত থাকলে ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

২. নগদ অর্থ প্রাপ্তি ও নগদ অর্থ পরিশোধ: নগদ অর্থ পাওয়া গেলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বহির ডেবিট দিকে নগদ ঘরে লিখতে হবে। নগদ অর্থ পরিশোধ করা হলে তা দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বহির ক্রেডিট দিকে নগদ ঘরে লিখতে হবে।

৩. চেক প্রাপ্তি: চেক প্রাপ্ত হয়ে ব্যাংকে জমা না দেওয়া পর্যন্ত নগদ টাকার শামিল। চেক প্রাপ্তি দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে নগদ ঘরে লিখতে হবে।

৪. চেক প্রদান: চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

৫. ব্যাংকের টাকা জমা রাখা: যখন নগদ টাকা নগদ তহবিল হতে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় তখন দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের উভয় পার্শ্বে একটি করে জায় করতে হয়। ব্যাংক নগদ টাকা জমা দেওয়ার ফলে উক্ত পরিমাণ টাকা নগদ তহবিল হতে চলে যায়; পক্ষান্তরে ব্যাংক উক্ত টাকা গ্রহণ করে। সেহেতু নগদ তহবিল দাতা এবং সে জন্য এটি নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বে টাকার পরিমাণ কক্ষে লিখতে হবে। আবার ব্যাংক উক্ত টাকা গ্রহণ করে তাই ব্যাংক গ্রহীতা এবং সেহেতু উক্ত টাকার পরিমাণ দ্বারা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হয়। অর্থাৎ নগদান বইয়ের ডেবিট পার্শ্বস্থিত ব্যাংক পরিমাণ কক্ষে তা লিখতে হবে। বিপরীতমুখী দাখিলাকে কন্ট্রা এন্ট্রি বলা হয়।

৬. ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন: ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের উভয় পার্শ্বে একটি করে জায় লিখতে হয়। ব্যাংক হতে টাকা তোলার ফলে ব্যাংক দাতা হয় বিধায় উক্ত টাকা নগদ তহবিলে আগমন করে, সেহেতু নগদ তহবিল গ্রহীতা রূপে গণ্য হয়। সুতরাং ব্যাংক হতে টাকা তোলা হলে প্রথমবার দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বস্থিত ব্যাংক পরিমাণ কক্ষে লিখতে হয় এবং দ্বিতীয়বার এটি উভয় নগদান বইয়ের ডেবিট পার্শ্বস্থিত টাকার পরিমাণ কক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ বিপরীতমুখী দাখিলাকে কন্ট্রা এন্ট্রি বলা হয়।

৭. চেক পেয়ে তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দিলে: চেক পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দিলে তা দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

৮. প্রাপ্য বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরণ: প্রাপ্য বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে তা দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

৯. আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরিত বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়া: যদি কোনো প্রাপ্য বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতকের নিকট হতে আদায় না হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয় তখন এ প্রত্যাখ্যাত বিল দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিটে ব্যাংক ঘরে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১০. মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন: মালিক কর্তৃক ব্যাংক হতে নিজ প্রয়োজনে সরাসরি টাকা উত্তোলনের জন্য নগদ তহবিল কোনোরূপে প্রভাবিত হয় না। এ টাকা সরাসরি মালিকের নিকট চলে যায় বলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

১১. ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদেয় বিল পরিশোধ: ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদেয় বিল পরিশোধ করা হলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বে ব্যাংক পরিমাণ কক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১২. সরাসরি ব্যাংকে প্রদান: যদি কোনো দেনাদার আমাদের কারবারের পক্ষে ব্যাংকে সরাসরি টাকা জমা দেয় অথবা যদি ব্যাংক আমাদের পক্ষে অপর কারো নিকট হতে টাকা আদায় করে তবে তা দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

১৩. **ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ:** ব্যাংক জমা টাকার উপর সুদ প্রদান করে। এ সুদের জন্য ব্যাংকে জমা টাকা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ব্যাংক মঞ্জুরীকৃত সুদ দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

১৪. **ব্যাংক চার্জ:** ব্যাংক মাঝে মাঝে আমানতকারীর বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদন করে থাকে এবং এ সমস্ত কাজের জন্য কিছু কমিশন ধার্য করে। ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত এরূপ কমিশনকে ব্যাংক চার্জ বলে। ব্যাংক চার্জ দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে। কারণ উক্ত টাকা গ্রাহকের হিসাব থেকে কেটে রাখা হয়।

১৫. **মঞ্জুরীকৃত নগদ বাট্টা ও প্রাপ্ত নগদ বাট্টা:** মঞ্জুরকারী প্রতিষ্ঠান-এর তিনঘরা নগদান বইতে এ মঞ্জুরীকৃত নগদ বাট্টা উক্ত নগদান বহির ডেবিট পার্শ্বে বাট্টা পরিমাণ ঘরে লিপিবদ্ধ করবে। পাওনাদারগণের নিকট নগদ বাট্টা পাওয়া যেতে পারে। এরূপ প্রাপ্ত বাট্টা একটি আয় এবং এটি তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বে বাট্টা পরিমাণ কক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১৬. **কন্ট্রা এন্ট্রি এর সংজ্ঞা (Definition of Contra Entry):** নগদ ও ব্যাংক সম্পর্কীয় লেনদেনগুলোর কতিপয় দফা আছে যেগুলোর প্রতিটি কন্ট্রা এন্ট্রি বলা হয়। যেমন-কারবারের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে এবং কারবারের জন্য ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা হলে, দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের উভয় দিকে লিখতে হয়। ডেবিটের দিকে নগদ ঘরে লিপিবদ্ধ করা হলে ক্রেডিটের দিকে ব্যাংক ঘরে লিপিবদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে, ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লেখা হলে তা ক্রেডিট দিকে নগদ ঘরে লেখা হবে। এ জাতীয় দাখিলাকে কন্ট্রা এন্ট্রি বা বিপরীত দাখিলা বলা হয়।

উদাহরণ: ১। নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করে মেসার্স রানা এন্ড কোং-এর একটি নগদান বই তৈরি কর।

১৯৯৮

- জানুয়ারি-১ নগদ জমার উদ্ভূত ১৫,০০০.০০ টাকা এবং ব্যাংকে নগদ জমা ২০,০০০.০০ টাকা।
 জানুয়ারি-২ অফিসের জন্য ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো ৫০০.০০ টাকা
 জানুয়ারি-৩ মজুরি নগদ ২,০০০.০০ টাকা চেক দ্বারা ৩,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হলো।
 জানুয়ারি-৮ মজুরি নগদ ২,০০০.০০ টাকা চেক দ্বারা ৩,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হলো।
 জানুয়ারি-১২ জনাব নাদিমের কাছ থেকে তার একটি স্বীকৃত বিল পাওয়া গেল ২,০০০.০০ টাকা এবং বিলটি ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
 জানুয়ারি-১৫ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ২,০০০.০০ টাকা
 জানুয়ারি-১৮ পণ্য ক্রয় করে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলো ৩,০০০.০০ টাকা
 জানুয়ারি-২০ ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত খরচের জন্য উত্তোলন করা হলো ৩০০.০০ টাকা
 জানুয়ারি-২৫ বাড়ি ভাড়া প্রদান করা হলো ৩০০.০০ টাকা
 জানুয়ারি-৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১০০.০০ টাকা এবং ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো ৫০০.০০ টাকা

**মেসার্স রানা এন্ড কোং
নগদান বহি (দু'ঘরা)**

ডেবিট					ক্রেডিট				
তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	নগদ	ব্যাংক	তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	নগদ	ব্যাংক
১৯৯৮					১৯৯৮				
জানু-১	টু প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত		১৫,০০০.০০	২০,০০০.০০	জানু- ৩	বাই নগদান	ক		৫০০.০০
.. ৩	.. ব্যাংক	ক)	৫০০.০০		.. ৮	মজুরী হিসাব		২,০০০.০০	৩,০০০.০০
.. ১২	.. প্রাপ্য বিল			২,০০০.০০	.. ১৫	.. ব্যাংক	ক	২,০০০.০০	
.. ১৫	.. নগদান হিসাব	ক		২,০০০.০০	.. ১৮	.. পণ্য ক্রয় হিঃ			৩,০০০.০০
.. ৩০	.. ব্যাংক মঞ্জুরী কৃত সুদ			১০০.০০	.. ২০	.. উত্তোলন হিসাব			৩০০.০০
					.. ২৫	.. বাড়ি ভাড়া হিসাব			৩০০.০০
					.. ৩০	.. ব্যাংক চার্জ			৫০.০০.০০
					.. ৩১	.. উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হবে		১১,২০০.০০	১৭,২৫০.০০
			১৫,৫০০.০০	২৪,১০০.০০				১৫,৫০০.০০	২৪,১০০.০০
ফেব্রু-১	উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হয়েছে		১১,২০০.০০	১৭,২৫০.০০					

উদাহরণ: ২। মেসার্স ডায়মন্ড এন্ড কোং-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করে একটি তিনঘরা নগদান বহি তৈরি কর।

১৯৮৮

মার্চ-১	নগদ তহবিল ৩২,০০০.০০ টাকা এবং ব্যাংকে জমা	২১,০০০.০০ টাকা
মার্চ-৫	মি: আলী রিয়াজ এর থেকে নগদে পণ্য ক্রয় করা হলো	১,২০০.০০ টাকা
মার্চ-৭	কাজলের কাছ থেকে একটি চেক পাওয়া গেল	১,৮০০.০০ টাকা
মার্চ-১২	ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো	২,৫০০.০০ টাকা
মার্চ-১৮	নগদে পণ্য বিক্রয় করে পণ্যের মূল্য চেকের মাধ্যমে পাওয়া গেল	৪,০০০.০০ টাকা
মার্চ-২২	নয়ন ব্রাদার্স থেকে তাদের ৩২,০০০.০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে পাওয়া গেল।	৩,০০০.০০ টাকা
মার্চ-২৫	শুভ ব্রাদার্সকে তাদের ১,৮০০.০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তির সাপেক্ষে দেওয়া হলো।	১,৭০০.০০ টাকা
মার্চ-২৭	ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো-	১,২০০.০০ টাকা
মার্চ-২৮	ভাড়া নগদ ৪,০০.০০ টাকা এবং চেকের মাধ্যমে বেতন প্রদত্ত হলো	৯,০০.০০ টাকা।
মার্চ-৩০	ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত সুদ ৮০.০০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ	১৮০.০০ টাকা।

**মেসার্স ডায়মন্ড এন্ড কোং
নগদান বই (ডিনঘরা)**

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	বাটা	নগদ	ব্যাংক	তারিখ	বিবরণ	খ.পূ.	বাটা	নগদ	ব্যাংক
১৯৯৮ মার্চ-১	টু প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হয়েছে			৩২,০০০.০০	২১,০০০.০০	১৯৯৮ মার্চ-৫	বাই পণ্য ক্রয়			১,২০০.০০	
.. ৭	.. হিসাব			১,৮০০.০০		.. ১২	ব্যাংক	ক			২,৫০০.০০
.. ১২	.. নগদান	ক			২,৫০০.০০	.. ২৫	.. তত্ত্ব ব্রাদার্স		১০০	১,৭০০.০০	
.. ১৮	.. পণ্য বিক্রয় হিসাব			৪,০০০.০০		.. ২৭	.. নগদান হিসাব	ক			১,২০০
.. ২২	.. নয়ন ব্রাদার্স		২০০	৩,০০০.০০		.. ২৮	.. ভাড়া হিসাব			৪০০.০০	
.. ২৭	.. ব্যাংক	ক		১,২০০.০০		.. ২৮	.. বেতন				৪০০.০০
.. ৩০	ব্যাংক মঞ্জুরীকৃত সুদ				৮০.০০	.. ৩০	.. ব্যাংক চার্জ				১৮০.০০
						.. ৩১	.. উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হবে			৩৬,২০০.০০	২১৩০০.০০
		২০০		৪২,০০০.০০	২৩,৫৮০.০০				১০০	৪২,০০০.০০	২৩,৫৮০.০০
এপ্রিল-১	উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হয়েছে			৩৬,২০০.০০	২১,৩০০.০০						

নগদান বই সর্বাবস্থায় ডেবিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে বর্ণনা কর।

নগদান বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি দিক থাকে। একটি ডেবিট দিক এবং অন্যটি ক্রেডিট দিক। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত প্রাপ্ত নগদ টাকা ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট দিকে যাবতীয় নগদ প্রদান বা পরিশোধ লিপিবদ্ধ করা হয়। নগদান বইতে সমস্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর এর ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়। নগদান বইয়ের এ ব্যালেন্স সর্বাবস্থায় ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। কারণ নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ হতে নগদ পরিশোধের পরিমাণ কোনো অবস্থাতেই বেশি হতে পারে না।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System)

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হিসাব ব্যবস্থা। ইতালীয় ধর্মযাজক লুকা প্যাচিওলি ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রচলন করেন। বর্তমান বিশ্বে এ পদ্ধতিটি হিসাবরক্ষণের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত এবং সুসংবদ্ধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে পদ্ধতির প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে সমান টাকার অংকে একটিকে ডেবিট এবং অপরটিকে ক্রেডিট করে হিসাব বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

প্রত্যেক ব্যবসায়ের লেনদেনে দুটি পক্ষ থাকে। একটি ডেবিট পক্ষ এবং অপরটি ক্রেডিট পক্ষ। যে পক্ষ গ্রহণ করে তাকে ডেবিট এবং যে পক্ষ প্রদান করে তাকে ক্রেডিট বলে।

দু'তরফা দাখিলা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি একটি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া যা অবিরত চক্রাকারে চলতে থাকে। হিসাবরক্ষণের এই প্রক্রিয়াকে হিসাব চক্র বলে। নিম্নলিখিত পাঁচটি স্তরে হিসাব চক্রকে বিভক্ত করা যায়। যথা-

হিসাব চক্রের নমুনা



১. জাবেদাকরণ (Journalising): জাবেদা হিসাবরক্ষণের প্রাথমিক বই। ব্যবসায়ের প্রতিটি লেনদেন সমূহ সর্বপ্রথমে ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে জাবেদা বইয়ে লিপিবদ্ধ করা। ইহা হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ। জাবেদা বইকে সাধারণ জাবেদা বলে। ইহা ছাড়া কিছু কিছু ভিন্নধর্মী জাবেদা বই রয়েছে। যেমন-ক্রয় বই ও বিক্রয় বই, ক্রয় ফেরত, বিক্রয় ফেরত বই, নগদান বই, প্রাপ্য বিল, প্রদেয় বিল, বেতন বহি ইত্যাদি।

২. খতিয়ানভুক্তকরণ (Posting for Ledger): হিসাব চক্রের দ্বিতীয় ধাপ হলো খতিয়ানভুক্তকরণ। জাবেদা বইতে লিপিবদ্ধ লেনদেন একই শ্রেণির হিসাব বইতে রেকর্ড করাকে খতিয়ানভুক্তকরণ বলে।

খতিয়ান বইতে লেনদেনগুলো পাকাপাকিভাবে পৃথক পৃথক হিসাবরক্ষণ করা হয়। খতিয়ান বই অনেকগুলো। যেমন-নগদান হিসাব, কলকজা ও যন্ত্রপাতি হিসাব, মাল ক্রয় হিসাব, মাল বিক্রয় হিসাব ইত্যাদি। খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক হিসাব দেখে ব্যবসায় সামগ্রিক আর্থিক চিত্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়। খতিয়ান দেখে ব্যবসায় দেনা-পাওনার পরিমাণ ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ, লাভ-লোকসান নির্ণয়, আর্থিক অবস্থা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

৩. রেওয়ামিল তৈরিকরণ (Preparing Trial Balance): হিসাব চক্রের তৃতীয় ধাপ রেওয়ামিল প্রস্তুত করা খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হিসাবসমূহের ডেবিট জের ও ক্রেডিট জেরগুলোকে একটি বিবরণীর মাধ্যমে সফিক্তাকারে প্রকাশ করাকে রেওয়ামিল বলে। প্রতিটি খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট ব্যালেন্স রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট পার্শ্বে স্থানান্তর করে উভয় পার্শ্বের যোগফল নির্ণয় করাই রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ। খতিয়ান হিসাবগুলোর গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য রেওয়ামিল তৈরি করা হয়।

হিসাবে কোনো গরমিল না থাকলে রেওয়ামিলের দুই দিক সমান হয়। যদি কোনো কারণে উভয় দিক সমান না হয় তবে বুঝতে হবে হিসাবের কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে।

৪. আর্থিক বিবরণী তৈরিকরণ (Preparation Financial Statement): হিসাব চক্রের চতুর্থ ধাপ হলো আর্থিক বিবরণী তৈরিকরণ। এ পর্যায়ে রেওয়ামিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বছরের শেষে ব্যবসার ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্ভূতপত্র প্রস্তুত করে আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করা হয়।

৫. আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (Analysis of Financial Statement): ব্যবসায়ীকে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যেন ভবিষ্যতে ব্যবসা হতে মুনাফা অর্জন করা যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসার প্রতি বছরের শেষে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসার সাফল্য-ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা যায় এবং পরবর্তীতে সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

চূড়ান্ত হিসাবের সংজ্ঞা (Definition of Final Account): ব্যবসার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। প্রত্যেক ব্যবসায়ী জানতে চায়, কোনো নির্দিষ্ট সময় পরে ব্যবসায় কত লাভ হলো কত ক্ষতি হলো। একমাত্র চূড়ান্ত হিসাব কারবারের সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে কারবার প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লাভ-লোকসান এবং সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য যে সমস্ত হিসাব ও বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকেই সমষ্টিগতভাবে চূড়ান্ত হিসাব বলে।

চূড়ান্ত হিসাবের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. টি.এস. গোয়েলের মতে, ‘চূড়ান্ত হিসাব হলো একটি বিবরণী যার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়সহ সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের শেষ মুহূর্তের আর্থিক বিবরণী তৈরি করে প্রদর্শন করা হয়।’

২. জনৈক হিসাবশাস্ত্রবিদের মতে, ‘উৎপাদন হিসাব, ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব ও উদ্ভূতপত্রের সমষ্টিই হচ্ছে চূড়ান্ত হিসাব।’

চূড়ান্ত হিসাবের ধাপ বা উপাদানসমূহ (Components of Final Account)

চূড়ান্ত হিসাবের ধাপ বা উপাদানের চারটি স্তর রয়েছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. উৎপাদন হিসাব (Manufacturing Account): যে হিসাব প্রস্তুতের মাধ্যমে কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করে তাকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বলা হয়। কেবল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানেই উৎপাদন হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

২. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (Trading Account): কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কারবার প্রতিষ্ঠানের ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয়ের ফলে যে মোট লাভ বা মোট ক্ষতি হয় তা নির্ণয় করার জন্য উক্ত সময় শেষে যে হিসাব প্রস্তুত করা হয় তাকে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব বলে। ক্রয়-বিক্রয় হিসাব প্রস্তুতের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের মোট লাভ ও ক্ষতির পরিমাপ নির্ণয় করা।

৩. লাভ-ক্ষতি হিসাব (Profit and Loss Account): কোনো নির্দিষ্ট সময় শেষে কারবারের নিট লাভ বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে যে হিসাব তৈরি করা হয় তাকে লাভ-ক্ষতি হিসাব বলে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে কারবারের কী পরিমাণ নিট লাভ বা ক্ষতি হয়েছে তা জানার জন্য লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরি করা হয়ে থাকে।

৪. উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet): একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক অবস্থা জানার জন্য সকল সম্পত্তি ও দায়ের যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে উদ্বৃত্তপত্র বলা হয়। উদ্বৃত্তপত্র কোনো হিসাব নয়, এটা একটি আর্থিক বিবরণী। উদ্বৃত্তপত্রের উভয় দিকের যোগফল সমান হয়। অর্থাৎ মোট সম্পত্তির পরিমাণের সমান মূলধন ও দায়। এটিকে হিসাব সমীকরণ বলা হয়। সমীকরণটি হলো সম্পত্তি = মূলধন ও দায়।

নিম্নে উদ্বৃত্তপত্রের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. অধ্যাপক মুনটিজ-এর মতে, 'উদ্বৃত্তপত্র হলো গতিহীন বা স্থির ভান্ডারগুলোর বিবরণী যাকে হঠাৎ তোলা আর্থিক অবস্থার চিত্র বলা যেতে পারে।'
২. AICPA-এর মতে, 'উদ্বৃত্তপত্র হলো হিসাববিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী হিসাবের বইপত্র সঠিকভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ করার পর উদ্বৃত্ত টেনে আনা ডেবিট ও ক্রেডিট ব্যালেন্সগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসার বা ছক কাটা বিবরণী।'

নিম্নে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের একটি নমুনা ছক দেখানো হলো:

প্রতিষ্ঠানের নাম
ক্রয়-বিক্রয় হিসাব

ডেবিট			ক্রেডিট
বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য (১.১.২০০০)	***		
মাল ক্রয়		মাল বিক্রয়	
***		***	
(-) ক্রয় ফেরত		(-) বিক্রয় ফেরত	
***		***	
***		(-) বিক্রয় বাউটা	***
(-) ক্রয় বাউটা		***	

(-) মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন	***	সমাপনী মজুদ পণ্য (৩১-১২-২০০০)	***

মজুরি ***			
(+) বকেয়া মজুরি ***	***		
আন্তঃপরিবহন/ক্রয় পরিবহন	***		
আমদানি শুল্ক/ক্রয় শুল্ক	***		
জাহাজ ভাড়া	***		
তাপ শক্তি ও জ্বালানি খরচ চার্জ	***		
মোট লাভ	***		
(লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত হবে)			
	***		***

লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুতপ্রণালি (Process preparing profit and loss Account)

লাভ-ক্ষতি হিসাব একটি মুনাফাজাতীয় হিসাব। ক্রয়-বিক্রয় হিসাব প্রস্তুতের পর লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুত করা হয়। মোট লাভের সাথে মুনাফাজাতীয় পরোক্ষ আয়গুলো লাভ-ক্ষতি হিসাবে ক্রেডিট করা হয় এবং মোট ক্ষতির সাথে মুনাফাজাতীয় পরোক্ষ ব্যয়গুলো লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করা হয়। ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের পার্থক্য নির্ণয়ের মাধ্যমে কারবার প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ ও নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

নিম্নে কারবার প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি হিসাবের নমুনা ছক দেখানো হলো:

কারবার প্রতিষ্ঠানের নাম

লাভ-ক্ষতির হিসাব

.....সালেরতারিখের সমাপ্ত এক বছরের

ডেবিট		ক্রেডিট	
বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
বেতন ***		মোট লাভ (ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে)	***
+ বকেয়া বেতন ***	***	বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তি ***	
ভাড়া ও কর	***	(-) অগ্রিম বাড়ি ভাড়া ***	***
বিমা সেলামি	***	প্রাপ্ত কমিশন	***
অফিস/দপ্তর খরচ	***	প্রাপ্ত বাট্টা	***
যাতায়াত খরচ/বই পরিবহন	***	প্রাপ্ত সুদ	***

বিজ্ঞাপন		বিনিয়োগের উপর সুদ	***

(-) অগ্রিম	***	শিক্ষানবিশ সেলামি	***

খাজনা	***	ব্যাংকে জমা টাকার উপর সুদ	***
মেরামত ও নবায়ন	***	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	***
কমিশন	***	উত্তোলনের উপর সুদ	***
বাট্টা/প্রদত্ত বাট্টা	***	অনাদায়ী পাওনা আদায়	***
রপ্তানি শুল্ক	***		***
নিরীক্ষা ফিস	***		***
বিমা	***		
মূলধনের উপর সুদ	***		
কর্জ/ঋণের উপর সুদ	***		
ব্যাংক জমাতিরিক্ত সুদ	***		
অনাদায়ী দেনা/কৃষ্ণণ	***		
(+) নতুন অনাদায়ী দেনা	***		
সঞ্চিতি	***		
সম্পত্তির অবচয়সমূহ	***		
ব্যাংক চার্জ	***		
নিট লাভ (মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত হবে)	***		***

উদ্বৃত্ত পত্র প্রস্তুতপ্রণালি (Rules of Preparing Balance Sheet)

বাংলাদেশে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই ব্রিটিশ পদ্ধতিতে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়। এ পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতি হিসাবে যে ব্যালেন্স হয় তা নিট লাভ বা নিট ক্ষতি। নিট লাভ উদ্বৃত্তপত্রে মূলধনের সঙ্গে যোগ করা হয় এবং নিট ক্ষতি মূলধন হতে বিয়োগ করে দেখানো হয়। লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুত করার পর রেওয়ামিলে খতিয়ানের যে ব্যালেন্সগুলো থাকে সেগুলো কোনোটি সম্পত্তি এবং কোনোটি দায়। সম্পত্তিগুলো উদ্বৃত্তপত্রের ডান দিকে অর্থাৎ সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদের দিকে লেখা হয় এবং দায় সংক্রান্ত ব্যালেন্সগুলো বাম দিকে মূলধন ও দায়ের দিকে লিখে উত্তর দিকে যোগ করা হয়। উদ্বৃত্তপত্রের দুই দিকের যোগফল সমান হয়।

নিম্নে উদ্বৃত্তপত্রের নমুনা ছক দেখানো হলো:

প্রতিষ্ঠানের নাম
উদ্বৃত্তপত্র

ডেবিট

ক্রেডিট

মূলধন ও দায়সমূহ	টাকা	সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদ	টাকা
মূলধন ***		নগদ তহবিল	***
(+) মূলধনের সুদ ***		ব্যাংকে জমা	***
(-) উত্তোলন ***		বিবিধ দেনাদার ***	
(-) মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ***	***	(-) নতুন অনাদায়ী দেনা	***
		সঞ্চিতি ***	
		প্রাপ্য বিল	

(+) নিট লাভ ***		বিনিয়োগ ***	
		আসবাবপত্র ***	

(-) আয়কর ***	***	(-) অবচয় ***	***
	***	কলকজা ও যন্ত্রপাতি ***	
বিবিধ পাওনাদার	***	(-) অবচয় ***	
প্রদেয় বিল	***		***
ঋণ/কর্জ		ভূমি ও দালানকোঠা ***	

(+) কর্জের সুদ ***		(-) অবচয় ***	
	***		***
বন্ধকী ঋণ	***	ইজারা সম্পত্তি	***
সাধারণ সঞ্চিতি	***	সমাপনী মজুদ পণ্য	***
অগ্রিম প্রাপ্ত আয়	***	সুনাম	***
বকেয়া খরচসমূহ	***	দ্রৈড মার্ক	***
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	***	অগ্রিম ব্যয়	***
	***		***

ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্রের বিবেচ্য হিসাব খাতসমূহ (Accounts Considered in Trading Account, Profit and Loss Account and Balance Sheet)

১. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য: সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের শুরুতে যে কাঁচামাল মজুদ থাকে তাকে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য বলে। প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট দিকে লেখা হয়।

২. মাল ক্রয়: সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিণত বা সম্পন্ন মাল ক্রয় করে। মাল ক্রয় সর্বদাই ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট দিকে বসে।

৩. মাল ফেরত বা পণ্য ক্রয় ফেরত: ক্রয় করা পণ্য যদি ফরমায়েশ অনুযায়ী না হয় অথবা অন্য যে কোনো কারণে বিক্রেতার নিকট পণ্য ফেরত দেওয়া হয় তাকে ক্রয় ফেরত বলে। পণ্য ক্রয় ফেরত ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে মাল ক্রয় হতে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

৪. মজুরি: মজুরি বলতে কারখানায় প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত শ্রমিকদের পারিশ্রমিকে বোঝায়। এটি ক্রয় বিক্রয় হিসাবে ডেবিটের দিকে বসে।

৫. আমদানি শুল্ক: বিদেশ হতে পণ্য ক্রয় করে ক্রেতার দেশে আনার সময় যে শুল্ক প্রদান করা হয় তাকে আমদানি শুল্ক বলে। আমদানি শুল্ক ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট দিকে লিখতে হবে।

৬. জাহাজ ভাড়া: পণ্য আমদানি বা ক্রয় করতে জাহাজ ভাড়া বাবদ যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকে জাহাজ ভাড়া বলে। এটি ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়।

৭. আশুঃপরিবহন: বিদেশ হতে পণ্য ক্রয় করে বা দেশের অভ্যন্তরে পণ্য ক্রয় করে ক্রেতার কারবার প্রতিষ্ঠানে আনার জন্য যে ভাড়া দেওয়া হয় তাকে আশুঃপরিবহন বলা হয়। এটি ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ডেবিট হয়।

৮. বেতন: অফিসে নিযুক্ত কর্মচারীকে মাসিক ভিত্তিতে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় সেটাই বেতন। এটি প্রতিষ্ঠানের পরোক্ষ মুনাফা জাতীয় ব্যয়। এটি লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট দিকে বসে।

৯. কর ও অভিকর: সরকারকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে কর ও অভিকর বলে। একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করতে হয়।

১০. তাপ ও জ্বালানি (Fuel): এটি বলতে গ্যাস, পানি ও কাঠ কয়লাকে বোঝায়। এ জাতীয় ব্যয় উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বিধায় এটিকে ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিটের দিকে দেখান হয়।

১১. মাল বিক্রয় (Sales): নগদে ও বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের সমষ্টিকে বিক্রয় বলা হয়। মাল বিক্রয় সব সময় ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট দিকে বসে।

১২. মাল বিক্রয় ফেরত (Sales Return): বিক্রিত মালের যে অংশ ক্রেতার নিকট ফেরত আসে তাকে বিক্রয় ফেরত বলা হয়। মাল বিক্রয় ফেরত ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট দিকের ইনার কলামের মাল বিক্রয় হতে বিয়োগ দিয়ে রাখতে হয়।

১৩. ডক চার্জ (Dock Charge): এটি দুভাবে ব্যবসায়ীকে দিতে হয়। প্রথমত বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয়ের সময় এবং দ্বিতীয়ত বিদেশে মাল রপ্তানির সময়। আমদানি সংক্রান্ত ডক চার্জ ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ডেবিট হবে। কিন্তু রপ্তানির সময় ডক চার্জ বিক্রয় সম্পর্কিত খরচ বলে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট হবে।

১৪. কমিশন (Commission): প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি নির্বাহ করার জন্য যে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত বা প্রদত্ত হয় তাকে কমিশন বলে। প্রাপ্ত কমিশন কারবারের আয় এবং প্রদত্ত কমিশন কারবারের ব্যয়। প্রাপ্ত কমিশন লাভ-ক্ষতি হিসাবে ক্রেডিট করা হয় এবং প্রদত্ত কমিশন ডেবিট করা হয়।

১৫. প্রাপ্ত বাট্টা: অনেক সময় পাওনাদারদের তাদের পাওনা টাকা আদায়ের সময় যে অর্থ ছাড় দেওয়া হয় তাকে প্রাপ্ত বাট্টা বলে। এটি কারবারের লাভ, তাই একে লাভ-লোকসান হিসাবে ক্রেডিট করা হয়।

১৬. প্রদত্ত বাট্টা: দেনাদারের নিকট হতে পাওনা টাকা আদায় করার সময় যে ছাড় দেওয়া হয় তাকে প্রদত্ত বাট্টা বলে। এটি কারবার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি, তাই এটিকে লাভ-ক্ষতি হিসেবে ডেবিট করা হয়।

১৭. ভাড়া (Rent): অফিস ঘর ব্যবহার করার জন্য এর মালিককে নির্দিষ্ট সময় পর যে অর্থ দেয়া হয় তাকে ভাড়া বলে। এটি কারবারের পরোক্ষ খরচ, সেহেতু এটিকে লাভ লোকসান হিসেবে ডেবিট করা হয়।

১৮. বিজ্ঞাপন খরচ: কোনো উৎপাদিত পণ্যের প্রতি জনগণের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্য বা বিজ্ঞাপনের আশ্রয় হয়। এটি কারবারের একটি পরোক্ষ ব্যয়। সুতরাং এটিকে লাভ-লোকসান হিসেবে ডেবিট করা হয়।

১৯. সুদ (Interest): সুদ প্রাপ্ত ও প্রদত্ত প্রকার হতে পারে। প্রাপ্ত সুদ কারবারের আয়, পক্ষান্তরে প্রদত্ত সুদ কারবারের ব্যয়। সুতরাং প্রদত্ত সুদ লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট দিকে এবং প্রাপ্ত সুদ ক্রেডিট দিকে বসাতে হয়।

২০. ডাক, তার, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ খরচ: এর প্রতিটি দফা কারবারের পরোক্ষ খরচ, সুতরাং এগুলো লাভ-লোকসান হিসাবে ডেবিট দিকে বসবে।

২১. মেরামত খরচ: কারবারের ব্যবহৃত কলকজা ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, দালানকোঠা ইত্যাদি মেরামত করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকে মেরামত খরচ বলা হয়। এটি কারবারের পরোক্ষ ব্যয়, তাই লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট দিকে বসে।

২২. শিক্ষানবিশ সেলামি: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উক্ত কারবার প্রতিষ্ঠান সেলামি বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করে তাকে শিক্ষানবিশ সেলামি বলা হয়। এটি কারবার প্রতিষ্ঠানের আয়, সুতরাং এটি লাভ-ক্ষতি হিসাবে ক্রেডিট করা হয়।

২৩. অনাদায়ী দেনা (Bad Debts): দেনাদারবৃন্দের নিকট থেকে পাওনা টাকার যে অংশ আদায় করা সম্ভব হয় না তাকেই অনাদায়ী দেনা বলা হয়। এটি কারবারের পরোক্ষ খরচ। তাই একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করা হয়।

২৪. ছাপা ও মনিহারি (Printing and Stationary): অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য কাগজ, কালি, কলম, পেনসিল ইত্যাদি ক্রয় করা হয়, এগুলোকে ছাপা ও মনিহারি দ্রব্য বলে। এটি পরোক্ষ খরচ বিধায় একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করা হয়।

২৫. যাতায়াত খরচ (Traveling Expenses): কারবারের কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত বাবদ যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকে যাতায়াত খরচ বলে। এটি কারবারের পরোক্ষ খরচ, তাই এটিকে লাভক্ষতি হিসাবে ডেবিট করতে হয়।

২৬. রপ্তানি শুল্ক (Export Tax): মাল বিদেশে বা মাল বিক্রয়ের সময় যে শুল্ক দেওয়া হয় তাকে রপ্তানি শুল্ক বলে। এ শুল্ক বিক্রয় সম্পর্কিত বলে লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট দিকে বসে।

২৭. অফিস খরচ ও কারবারি খরচ: অফিস ও কারবারি খরচ প্রকৃতপক্ষে একই ধরনের। অফিসের কার্যাদি পরিচালনার জন্য দৈনন্দিন যে ছোটখাটো খরচ করা হয় সেগুলো অফিস খরচ এবং কারবারের সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যে খরচ হয় সেগুলো কারবারি খরচ। উভয় প্রকার খরচই লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করতে হয়। কিন্তু একই রেওয়ামিলে যদি উভয় প্রকার খরচ দেওয়া থাকে তবে কারবারি খরচকে প্রত্যক্ষ খরচ মনে করে ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ডেবিট করতে হয়।

২৮. বিনিয়োগের সুদ (Interest on Investment): অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট টাকা বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর যে সুদ পাওয়া যায় সেটাই বিনিয়োগের সুদ। এটি কারবারের লাভ। বিনিয়োগের সুদ লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিট দিকে বসে।

২৯. ঋণের সুদ (Interest on Loan): কারবার প্রতিষ্ঠান তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গৃহীত ঋণের উপর যে সুদ প্রদান করে তাকে ঋণের সুদ বলে। ঋণের সুদ কারবারের ক্ষতি, তাই এটি লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে বসে।

৩০. উত্তোলনের সুদ (Interest on Loan):: মালিক নিজ প্রয়োজনে কারবার হতে নগদ টাকা ও মাল উত্তোলন করে থাকে তাকে উত্তোলন বলে। এর উপর সুদ ধার্য করলে কারবারের লাভ বিধায় উত্তোলনের সুদ লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট দিকে দেখানো হয়।

৩১. অবচয় (Depreciation): সম্পত্তি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এর ক্রমিক মূল্যহ্রাস পায়, একে অবচয় বলে। অবচয় কারবারের ক্ষতি তাই এটি লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট দিকে বসে।

৩২. আয়কর (Income Tax): কারবার প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর সরকারকে আয়কর প্রদান করতে হয়। আয়কর কারবারের জন্য ক্ষতি। কিন্তু একমালিকানা কারবারের ক্ষেত্রে আয়কর মালিকের ব্যক্তিগত খরচ বলে বিবেচিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আয়কর রেওয়ামিলে দেওয়া থাকে। তবে উক্ত আয়কর উদ্বৃত্তপত্রের মালিকের মূলধন হতে বাদ দিয়ে দেখাতে হয়।

৩৩. বহিঃপরিবহন/বিক্রয় পরিবহন (Carriage out Ward): খরিদারের নিকট পণ্য সরবরাহ করতে যে খরচ হয় তাকে বহিঃপরিবহন বলে। এটি কারবারের একটি পরোক্ষ খরচ। সুতরাং একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করা হয়।

৩৪. মূলধনের সুদ (Interest of Capital): মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধনের উপর যদি সুদ দেওয়া হয় তবে তাকে মূলধনের উপর সুদ বলে। এটি কারবারের ক্ষতি, তাই একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করতে হয়।

৩৫. অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি (Reserve for Bad Debts): মোট পাওনা টাকার যে অংশের আদায় সম্বন্ধে ব্যবসায়ী সন্দেহান থাকে তাকে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি বলে। যদি রেওয়ামিলে এ অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি দেওয়া থাকে তবে বুঝতে হবে উক্ত সঞ্চিতি অতীত বছরের জন্য করা হয়েছে। তাই বর্তমান বছরের লাভ-ক্ষতি হিসাবে একে ক্রেডিট করতে হবে।

৩৬. মূলধন (Capital): কারবারের মালিক যে অর্থ কারবারে বিনিয়োগ করে তাকে মূলধন বলে। মূলধন কারবারের দায়। তাই মূলধনকে উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখানো হয়।

৩৭. উত্তোলন (Drawing): অনেক সময় মালিক কারবার হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ অর্থ ও পণ্য উত্তোলন করে তাকে উত্তোলন বলা হয়। উত্তোলন উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে মূলধন থেকে বিয়োগ করে দেখাতে হয়।

৩৮. কর্জ বা ঋণ (Loan) : ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে টাকা ধার করে তাকে কর্জ বা ঋণ বলে। ঋণ উদ্বৃত্তপত্রের দায়ের দিকে বসে।

৩৯. বিবিধ দেনাদার (Sundry Creditors): বাকিতে যাদের নিকট থেকে কারবার মাল ক্রয় করে তাদেরকে বিবিধ পাওনাদার বলা হয়। বিবিধ পাওনাদারের পাওনা টাকা কারবারের নিকট দায়। তাই এটি উদ্বৃত্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখানো হয়।

৪০. প্রদেয় বিল (Bills Payable): মালিক ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উপস্থাপিত বিলে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যে দেনা থাকে তাকে প্রদেয় বিল বলা হয়। প্রদেয় বিল উদ্বৃত্তপত্রের দায়ের দিকে বসে।

৪১. ব্যাংক ওভার ড্রাফট Bank Over Draft): ব্যাংকের সাথে সমঝোতা করে অনেক সময় কারবার প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে তাদের গচ্ছিত টাকা অপেক্ষা বেশি টাকা ওঠানো হয়। একে ব্যাংক ওভার ড্রাফট বা জমাতিরিক্ত বলা হয়। এটি কারবারের দায় বলে উদ্বৃত্তপত্রের দায়ের দিকে দেখানো হয়।

৪২. সাধারণ সঞ্চিতি (General Reserve): কারবারের ভবিষ্যতে কোনো ক্ষতি বা আর্থিক দুর্যোগ দেখা দিলে তা মোকাবিলা করার জন্য মুনাফার কিছু অংশ আলাদা তহবিলে জমা রাখা হয়, একে সাধারণ সঞ্চিতি বলা হয়। এটি কারবারের দায় বিধায় একে দায়ের দিকে দেখানো হয়।

৪৩. সম্পত্তিসমূহ (Perperties): ভূমি, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, কলকজা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে সম্পত্তি বলে। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলো উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়।

৪৪. বিবিধ দেনাদার (Sundry Debtors): যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট বাকিতে মাল বিক্রয় করা হয় তাদেরকে বিবিধ দেনাদার বলে। এদেরকে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়।

৪৫. নগদ তহবিল (Cash in Hand): যে তারিখে উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করা হয় সে তারিখে কারবারের ক্যাশ বাঞ্চে যে টাকা থাকে তাকে নগদ তহবিল বলে। এটি কারবারের সম্পদ। তাই এটিকে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়।

৪৬. ব্যাংকে জমা (Cash at Bank): ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখা হয় তাকে ব্যাংকে জমা বলে। এটি কারবারের সম্পত্তি বিধায় উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়।

৪৭. প্রাপ্য বিল (Bills Receivable): প্রস্তুতকৃত বিলে স্বীকৃতি প্রাপ্তির মাধ্যমে যে অর্থ কারও নিকট পাওনা থাকে তাকে প্রাপ্য বিল বলে। এটি কারবারের সম্পত্তি বিধায় উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়।

৪৮. সমাপনী মজুদ পণ্য: বছরের শেষ দিন কারবার প্রতিষ্ঠানের নিকট যে পণ্য অবিক্রীত অবস্থায় থেকে যায় তাকে সমাপনী মজুদ পণ্য বলা হয়। সমাপনী মজুদ পণ্য প্রথমে বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট দিকে এবং পরবর্তীতে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়।

৪৯. বকেয়া খরচ (Out Standing Expenses): যে খরচের টাকা এখনো পরিশোধ করা হয় নাই তাকে বকেয়া খরচ বলে। এটি কারবারের দায় বিধায় বকেয়া খরচকে উদ্বৃত্তপত্রের দায়ের দিকে দেখানো হয়।

৫০. অগ্রিম প্রদত্ত খরচ (Prepaid Expenses): কারবার প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী হিসাবকালের খরচ যদি চলতি হিসাবকালের মধ্যে পরিশোধ করা হয় তাকে অগ্রিম প্রদত্ত খরচ বলে। এটি একটি সম্পত্তি বিধায় একে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়।

৫১. অস্পর্শনীয় সম্পত্তি (Intangible Assets): যে সকল সম্পত্তি দেখা যায় না এমনকি ধরাছোঁয়া যায় না তাদেরকে অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বলা হয়। যেমন-সুনাম, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি। এগুলোকে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়।

উদাহরণ: ১। মেসার্স সাকিব এন্ড কোং ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য নিম্নে প্রদত্ত রেওয়ামিল অবলম্বন করে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-লোকসান হিসাব তৈরি কর এবং উক্ত তারিখে কারবারের উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত কর।

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য (১-১-৯৭)	৩,০০০.০০	
পণ্য ক্রয় এবং পণ্য বিক্রয়	৩০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
কলকজা	৮,০০০.০০	

আসবাবপত্র	৩,০০০.০০	
বাট্টা	২০.০০	২০০.০০
পণ্য ফেরত	৩০০.০০	৫০০.০০
ভাড়া	২৫০.০০	
বিমা	২৩০.০০	
অনাদায়ী দেনা	৪০০.০০	
উত্তোলন	১,০০০.০০	
ব্যাক জমার উদ্ধৃত	৬,০০০.০০	
মজুরি	৪০০.০০	
সুনাম	৫,০০০.০০	
গ্যাস ও বাতি	১,৫০০.০০	
বেতন	৫০০.০০	
বিবিধ দেনাদার ও বিবিধ পাওনাদার	২,০০০.০০	২,০০০.০০
অনদায়ী দেনা সঞ্চিতি	৪০০.০০	
মূলধন	১২,৯০০.০০	
বিধি খরচাবলি	৪০০.০০	
নগদ তহবিল	৪,০০০.০০	
	<u>৬৬,০০০.০০</u>	<u>৬৬,০০০.০০</u>

সমন্বয়সমূহ

ক. সমাপনী মজুদ পণ্য ৫,২০০.০০ টাকায় মূল্যায়ন হয়েছে ৩১-১২-১৯৯৭ ইং।

খ. ভাড়া ৫০.০০ টাকা ও বেতন ২০০.০০ বকেয়া রয়েছে।

গ. অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি আরও ১০০.০০ টাকা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঘ. কলকজার উপর ৫% এবং আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

মেসার্স সাকিব এন্ড কোং

১৯৯৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

সমাধান:

ক্রয় বিক্রয়

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
টু প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য (১-১-৯৭)	৩,০০০.০০	বাই পণ্য বিক্রয়	৪৯,৭০০.০০
		৫০,০০০.০০	
		(-) পণ্য ফেরত	

		<u>৩০০.০০</u>	
টু পণ্য ক্রয়			
৩০,০০০.০০			
(-) পণ্য ফেরত	২৯,৫০০.০০	বাই সমাপনী মজুদ পণ্য	৫,২০০.০০
<u>৫,০০.০০</u>			
টু মজুরি	৪০০.০০		
টু গ্যাস ও বাতি	১,৫০০.০০		
টু মোট লাভ	২০,৫০০.০০		
(লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত হবে)			
১০৫	<u>৫৪,৯০০.০০</u>		<u>৫৪,৯০০.০০</u>

মেসার্স সাকিব এন্ড কোং
১৯৯৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বৎসরের জন্য
লাভ-লোকসান হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
টু বেতন		মোট লাভ	২০,৫০০.০০
৫০০.০০			
(+) বকেয়া বেতন	৭০০.০০	(ক্রয়-বিক্রয় হিসাব হতে স্থানান্তরিত হয়েছে)	
<u>২০০.০০</u>			
বাট্টা	২০.০০		
" ভাড়া			
২৫০.০০			
" (+) বকেয়া ভাড়া	৩০০.০০		
<u>৫০.০০</u>			
" বিমা	২৩০.০০	" বাট্টা	২০০.০০
" অনাদায়ী দেনা			
৪০০.০০			
(+) নতুন অনাদায়ী দেনা			
সম্পত্তি			
<u>১০০.০০</u>			

৫০০.০০			
" (-) পুরাতন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	১০০.০০		
<u>৪০০.০০</u>			
" বিবিধ খরচাবলি	৪০০.০০		
" অবচয়সমূহ:			
কলকজা			
৪০০.০০			
আসবাবপত্র	৭০০.০০		
<u>৩০০.০০</u>			
" নিট লাভ	১৮,২৫০.০০		
(মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত হবে।)	<u>২০,৭০০.০০</u>		<u>২০,৭০০.০০</u>

মেসার্স সাকিব এন্ড কোং

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

উদ্বৃত্তপত্র

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পদ ও সম্পত্তি সমূহ	টাকা
মূলধন		কলকজা	
১২,৯০০.০০		<u>৮,০০০.০০</u>	
(-) উত্তোলন		(-) অবচয়	৭,৬০০.০০
<u>১,০০০.০০</u>		<u>৪০০.০০</u>	
১১,৯০০.০০			
(+) নিট লাভ	৩০,১৫০.০০	আসবাবপত্র	
<u>১৮,২৫০.০০</u>		৩,০০০.০০	
বিবিধ পাওনাদার	২,০০০.০০	(-) অবচয়	২,৭০০.০০
		৩০০.০০	
বকেয়া দায়সমূহ:		ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত	৬,০০০.০০
বেতন		সুনাং	৫,০০০.০০
২০০.০০			
ভাড়া		বিবিধ দেনাদার	

৫০.০০		২,০০০.০০	
	২৫০.০০	(-) নতুন অনাদায়ী দেনা স্বিকৃতি	
		<u>১০০.০০</u>	
			১,৯০০.০০
		নগদ তহবিল	৪,০০০.০০
		সমাপনী মজুদ পণ্য	৫,২০০.০০
	৩২,৪০০.০০		<u>৩২,৪০০.০০</u>

উদাহরণ: ২। মি. সাঈদের নিম্নলিখিত রেওয়ামিল থেকে ১৯৯৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব তৈরি কর এবং উক্ত তারিখে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত কর।

রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৬৫,০০০.০০
হাতে নগদ	১০,০০০.০০	
ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ		৭০০০.০০
সুনাম	২০,০০০.০০	
ইজারা সম্পত্তি (১০ বৎসরের জন্য)	২০,০০০.০০	
আসবাবপত্র	৭,০০০.০০	
উত্তোলন		৩,০০০.০০
মজুদ পণ্য (১-১-৯৭)	১০,০০০.০০	
বিবিধ দেনাদার	২০,০০০.০০	
বিবিধ পাওনাদার		২০,০০০.০০
মজুরি	৩,০০০.০০	
বেতন	৫,০০০.০০	
বিমা সেলামি	৪,০০০.০০	পণ্য ক্রয়
৪০,০০০.০০		
পণ্য বিক্রয়		৬০,০০০.০০
জাহাজ ভাড়া	১,০০০.০০	
ক্রয় বাট্টা		১,০০০.০০

বিনিয়োগ	১০,০০০.০০	
ভ্রমণ খরচ	৫০০.০০	
শিক্ষানবিশ সেলামি		১,৫০০.০০
অফিস খরচ	১,০০০.০০	
অনাদায়ী দেনা	৫০০.০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৫০০.০০
	১,৫৫,০০০.০০	১,৫৫,০০০.০০

অন্যান্য তথ্যাবলি

- ক. ৩১-১২-৯৭ তারিখে মজুদ পণ্যের বাজার মূল্য ২৫,০০০ টাকা, ক্রয় মূল্য ২৭,০০০ টাকা।
- খ. মজুরি ও বেতন যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ৬০০ টাকা বকেয়া আছে।
- গ. বিমা সেলামি ১,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।
- ঘ. দেনাদারের ৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ৫% হারে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ধরতে হবে।
- ঙ. বিনিয়োগের উপর ৫% পূর্ণ বৎসরের সুদ অনাদায়ী রয়েছে।

মি: সাঈদ

১৯৯৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতির হিসাব

ডেবিট

ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
টু মজুদ পণ্য (১-১-৯৭)	১০,০০০.০০	বাই পণ্য বিক্রয়	৬০,০০০.০০
টু পণ্য ক্রয়	৪০,০০০.০০		
(-) ক্রয় বাট্টা	৩৯,০০০.০০		
১,০০০.০০			
টু মজুরি		বাই সমাপনী মজুদ পণ্য	২৫,০০০.০০
৩,০০০.০০			
(+) বকেয়া মজুরি	৩৫০০.০০		
৫০০.০০			
টু জাহাজ ভাড়া	১,০০০.০০		
টু মোট লাভ (লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত হবে)	৩১,৫০০.০০		

	৮৫,০০০.০০		৮৫,০০০.০০
টু বেতন			
৫,০০০.০০			
(+) বকেয়া বেতন	৫,৬০০০.০০	বাই মোট লাভ (ক্রয় বিক্রয়	৩১,৫০০.০০
৬০০.০০		হিসাবে হতে স্থানান্তরিত হয়েছে)	
টু বিমা সেলামি			
৪০০০.০০			
(-) অগ্রিম বিমা সেলামি	৩,০০০.০০		
১,০০০.০০			
অফিস খরচ	১০০০.০০	বাই শিক্ষানবিশ সেলামি	১,৫০০.০০
টু ভ্রমণ খরচ	৫০০.০০	বাই বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ	৫০০.০০
টু অনাদায়ী দেনা			
৫০০.০০			
(+) অতিরিক্ত অনাদায়ী দেনা			
৫০০.০০			
১,০০০.০০			
(+) নতুন অনাদায়ী দেনা			
সম্পত্তি			
৯৭৫.০০			
১,৯৭৫.০০			
(-) পুরাতন অনাদায়ী দেনা			
সম্পত্তি			
৫০০.০০			
	১,৪৭৫.০০		
অবচয়: ইজারা সম্পত্তি	২,০০০.০০		
টু নিট লাভ (মূলধন হিসাবে			
স্থানান্তরিত হবে।)	১৯,৯২৫.০০		
	৩৩,৫০০.০০		৩৩,৫০০.০০

মি: সাঈদ
উদ্ভূতপত্র
৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পদ ও সম্পত্তি সমূহ	টাকা
মূলধন ৬৫,০০০.০০		বিবিধ দেনাদার ২০,০০০.০০	
(-) উত্তোলন ৩,০০০.০০		(-) অতিরিক্ত অনাদায়ী দেনা ৫০০.০০	
৬২,০০০.০০		১৯,৫০০.০০	
(+) নিট লাভ ১৯,৯২৫.০০	৮১,৯২৫.০০	(-) নতুন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ৯৭৫.০০	১৮,৫২৫.০০
বিবিধ পাওনাদার	২০,০০০.০০	আসবাবপত্র	৭০০০.০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ	৭,০০০.০০	সুনাম	২০,০০০.০০
বকেয়া দায়সমূহ:		হাতে নগদ	১০,০০০.০০
বেতন ৬০০.০০		ইজারা সম্পত্তি ২০,০০০.০০	
মজুরি ৫০০.০০	১,১০০.০০	(-) অবচয় ২,০০০.০০	১৮,০০০.০০
		বিনিয়োগ ১০,০০০.০০	
		(+) বিনিয়োগের সুদ ৫০০.০০	১০,৫০০.০০
		অগ্রিম বিমা সেলামি ১,০০০.০০	
		সমাপনী মজুদ পণ্য ২৫,০০০.০০	
	১,১০,০২৫.০০		১,১০,০২৫.০০

উদাহরণ: ৩। মেসার্স অনামিকা ব্রাদার্স এর ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য নিম্ন প্রদত্ত রেওয়ামিল অবলম্বন করে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-লোকসান হিসাব তৈরি কর এবং উক্ত তারিখে কারবারের উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত কর।

রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮

	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন		৫৫,০০০.০০
উত্তোলন	৬,০০০.০০	
দালানকোঠা	২৭,৫০০.০০	
আসবাবপত্র	৫,৫০০.০০	
বিবিধ ও দেনাদার ও পাওনাদার	৪৪,০০০.০০	২৭,৫০০.০০
ঋণ ৫%		৬,০০০.০০
মজুদ পণ্য (১-১-৯৮)	২২,০০০.০০	
ক্রয় ও বিক্রয়	৫৫,০০০.০০	১,১০,০০০.০০
ফেরত	১১,০০০.০০	৫,০০০.০০
আন্তঃপরিবহন		
২,২০০.০০		
বহিঃপরিবহন	৩,৩০০.০০	
মজুরি	৫,০০০.০০	
বেতন	৬,০০০.০০	
বাট্টা	৫,০০০.০০	৩,৩০০.০০
আয়কর	৫,৫০০.০০	
অনাদায়ী দেনা	১,১০০.০০	
ভাড়া	৫,৫০০.০০	
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	২,২০০.০০	
নগদ তহবিল	৪,৪০০.০০	
	<u>২,০৯,০০০.০০</u>	<u>২,০৯,০০০.০০</u>

সমন্বয়সমূহ

১. সমাপনী মজুদ পণ্য ২৭,০০০.০০ টাকায় মূল্যায়ন করা হয়েছে।
২. বেতন বকেয়া রয়েছে ৫৫০.০০ টাকা।
৩. ভাড়া অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে ১,২০০.০০ টাকা।
৪. বিবিধ দেনাদারের উপর ৫% ধরে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈরি কর।

মেসার্স অনামিকা ব্রাদার্স
১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য
ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাব

ডেবিট

ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
টু মজুদ পণ্য (১-১-৯৮)	২২,০০০.০০	বাই পণ্য বিক্রয়	
" ক্রয়		১,১০,০০০.০০	
৫৫,০০০.০০		(-) ফেরত	৯৯,০০০.০০
(-) ফেরত	৫০,০০০.০০	<u>১১,০০০.০০</u>	
৫,০০০.০০			
মজুরি	৫,০০০.০০	" সমাপনী মজুদ পণ্য	২৭,০০০.০০
আন্তঃপরিবহন	২,২০০.০০		
" মোট লাভ (লাভ-লোকসান			
হিসাবে স্থানান্তরিত হবে)	৪৬,৮০০.০০		
	<u>১,২৬,০০০.০০</u>		<u>১,২৬,০০০.০০</u>
টু বেতন			
৬,০০০.০০			
(+) বকেয়া বেতন	<u>৬,৫৫০.০০</u>	বাই মোট লাভ (ক্রয়-বিক্রয়	
৫৫০.০০		হিসাব হতে স্থানান্তরিত হয়েছে)	<u>৪৬,৮০০.০০</u>
" বাট্টা	৫,০০০.০০		
" ভাড়া		" বাট্টা	<u>৩,৩০০.০০</u>
৫,৫০০.০০			
(-) অগ্রিম ভাড়া	৪,৩০০.০০		
<u>১,২০০.০০</u>			
" অনাদায়ী দেনা			
১,১০০.০০			
(+) অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			
২,২০০.০০			

৩,৩০০.০০			
(-) পুরাতন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি			
<u>২,২০০.০০</u>			
	১,১০০.০০		
বহিঃপরিবহন	৩,৩০০.০০		
ঋণের সুদ	১৫০.০০		
নিট লাভ (মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত হবে।)	২৯,৭০০.০০		
	<u>৫০,১০০.০০</u>		<u>৫০,১০০.০০</u>

মেসার্স অনামিকা ব্রাদার্স

উদ্ভূতপত্র

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ	টাকা
মূলধন ৫৫,০০০.০০		বিবিধ দেনাদার ৪৪,০০০.০০	
(-) উত্তোলন ৬,০০০.০০		(-) নতুন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	৪১,৮০০.০০
৪৯,০০০.০০		২,২০০.০০	
(+) নিট লাভ ২৯,৭০০.০০		দালানকোঠা	২৭.৫০০.০০
৭৮,৭০০.০০		নগদ তহবিল	৪,৪০০.০০
(-) আয়কর ৫,৫০০.০০	৭৩,২০০.০০	আসবাবপত্র	৫,৫০০.০০
বিবিধ পাওনাদার	২৭,৫০০.০০		
ঋণ ৫%		অগ্রিম ভাড়া	
৬,০০০.০০		১,২০০.০০	
(+) বকেয়া সুদ ১৫০.০০	৬,১৫০.০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	২৭,০০০.০০
বকেয়া বেতন	৫৫০.০০		
	<u>১,০৭,৪০০.০০</u>		<u>১,১০,০২৫.০০</u>

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ (of Price determination) : ক্রেতা ও ভোক্তা কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদানে সম্মত হয় তাকেই পণ্যের মূল্য বলে। অর্থাৎ ভোক্তা নির্দিষ্ট পণ্য থেকে যে পরিমাণ উপযোগিতা পায় তাই হলো সে পণ্যের মূল্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একই পণ্য পেন ড্রাইভ একজন

একজন ক্রেতা ১৫০০ টাকার অপর একজন ক্রেতা উক্ত একই ব্র্যান্ডের পেন ড্রাইভ ১৪০০ টাকায় ক্রয় করল। এক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা উক্ত পণ্য থেকে ১৫০০ টাকার উপযোগ পায়, পক্ষান্তরে পরবর্তী ক্রেতা একই পণ্য হতে ১৪০০ টাকার উপযোগ লাভ করে।

সুতরাং মূল্য বলতে পণ্য বা সেবার অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য মূল্যমানকে বোঝায়।

Mc Carthy-এর মতে, ‘কোনো কিছুর পরিবর্তে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয় তাকে মূল্য বলে।’

Philp Kotler and Gray Armstrong-এর মতে, ‘নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার জন্য যে অর্থ আদায় করা যায় তাকে মূল্য বলে।’

পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিরূপণ (Buying and Selling Business):

ক্রয় মূল্য নিরূপণ (Buying Business): কোনো পণ্য প্রকৃত ক্রেতার নিকট পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত এর উৎপাদন বা ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক সকল খরচকেই মোট উৎপাদন বা ক্রয়মূল্য বলে। এই মূল্যের উপর ভিত্তি করে পণ্যের একক ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মোট কথা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্রীত পণ্য মূল্যের সাথে ক্রয়সংক্রান্ত যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করে মোট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

বিক্রয় মূল্য নিরূপণ (Selling Business): বিক্রয় মূল্য নিরূপণের জন্য প্রথমে সঠিকভাবে মোট খরচ নিরূপণ করতে হবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের যোগফল উক্ত পণ্যের মোট খরচ। মোট খরচের সাথে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

বিক্রয় মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে পণ্যের বিক্রয় আয় থেকে পণ্য সংগ্রহ ও সকল আনুষঙ্গিক খরচ উঠে আসে এবং সেই সাথে মুনাফা অর্জিত হয়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

মেলা ঢাকা শহরে অবস্থিত তৈরি পোশাকের একটি দোকান। এটি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রয়োজন অনুসারে তৈরি পোশাক। যেমন— ছেলেদের পাঞ্জাবি, মেয়েদের পোশাক, শাড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করে এবং বিক্রয় করে। মনে করি ১০০০টি ছেলেদের পাঞ্জাবি কুমিল্লা থেকে ক্রয় করা হলো। প্রতিটি পাঞ্জাবির ক্রয় মূল্য ৫০০ টাকা। কুমিল্লাতেই বড় প্যাকেট তৈরি করে পরিবহনের মাধ্যমে ঢাকায় আনতে আরো ৫০০০ টাকা খরচ হলো। ক্রয় খরচ ছাড়াও কুমিল্লা ও ঢাকায় পরিবহনে উঠানো ও নামানোর জন্য কুলির মজুরি হিসেবে আরো ৫০০ টাকা খরচ হয়। দোকানের ভাড়া বাবদ ৩০০০ টাকা, কর্মচারীর বেতন বাবদ ৫০০০ টাকা, বিদ্যুৎ খরচ বাবদ ৫০০ টাকা খরচ হলো। মূল্য নিরূপণের সুবিধার্থে ধরে নিচ্ছি মেলা পাঞ্জাবি বিক্রি করে। ১০% মুনাফা ধরে বিক্রয় মূল্য কত হবে?

প্রত্যক্ষ খরচ		টাকা
১০০০টি পাঞ্জাবির ক্রয় মূল্য ১০০০×৫০০	=	৫,০০,০০০
পরিবহন খরচ	=	৫,০০০
কুলি খরচ	=	৫০০
মোট ক্রয় মূল্য	=	৫,০৫,৫০০
পরোক্ষ খরচ		টাকা
দোকান ভাড়া	=	৩,০০০
কর্মচারী বেতন	=	৫,০০০
বিদ্যুৎ খরচ =	=	৫০০
মোট পরোক্ষ খরচ	=	৮,৫০০
১০০০টি পাঞ্জাবির মোট ক্রয় মূল্য	=	৫,০৫,৫০০ + ৮,৫০০
	=	৫,১৪,০০০ টাকা
যোগ ১০% মুনাফা	=	৫১,৪০০ টাকা

পাঞ্জাবির বিক্রয় মূল্য	=	৫,৬৫,৪০০ টাকা
সুতরাং ১০০০টি পাঞ্জাবির বিক্রয় মূল্য	=	৫,৬৫,৪০০ টাকা
প্রতিটি পাঞ্জাবির বিক্রয় মূল্য = $৫,৬৫,৪০০ \div ১০০০ = ৫৬৫.৪০$ টাকা		
উপরোক্ত পদ্ধতিতে পণ্যের বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করা যায়।		

ব্যবসার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ব্যবসাকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: যেমন—

১. ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা
২. উৎপাদনকারীমূলক ব্যবসা
৩. সেবামূলক ব্যবসা। তাকে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বলে।

১. ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা (Purchase and Sales Business): যে ব্যবসায় উৎপাদিত পণ্য কোনো এক স্থান হতে ক্রয় করে বিক্রয় কেন্দ্রে এনে বিক্রি করা হয় এরূপ প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন না করে অন্যের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে থাকে। যেমন—মুদি দোকান, কাপড়ের দোকান, গাড়ির দোকান ইত্যাদি। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় মোট খরচ বলতে পণ্যটি ক্রয় করতে যত ব্যয় হয় এবং সেই সাথে পণ্যটি বিক্রয় কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে আনুষঙ্গিক সকল খরচকেই বোঝায়।

মোট খরচকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

- i. প্রত্যক্ষ খরচ ও
- ii. পরোক্ষ খরচ

- i. প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Cost): যে সকল খরচ বা ব্যয় পণ্যের ত্রয়ের সাথে সরাসরি জড়িত তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলে। যেমন-শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন খরচ ইত্যাদি।
- ii. পরোক্ষ খরচ: যে সকল খরচ বা ব্যয় পণ্যের ত্রয় মূল্য বা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত থাকে না কিন্তু মোট খরচকে বৃদ্ধি করে তাকে পরোক্ষ খরচ বলে। যেমন- বিদ্যুৎ খরচ, কর্মচারীদের বেতন, দোকান ভাড়া, স্টেশনারী দ্রব্য ত্রয় ইত্যাদি।

২. উৎপাদনকারীমূলক ব্যবসা (Manufacturing Business): যে ব্যবসা কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করা হয় তাকে উৎপাদনমূলক ব্যবসা বলে। যেমন- মিষ্টির দোকান, বিস্কুট তৈরির কারখানা, আইসক্রিম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

কাঁচামালকে উৎপাদিত পণ্যে রূপান্তর করার জন্য যে ব্যয় হয় তার সাথে পরোক্ষ ব্যয়সমূহ যোগ করে পণ্যের বিক্রয় ব্যয় (Cost of Sales) নিরূপণ করা হয়। বিক্রয় ব্যয়ের সাথে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা যোগ করলে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য পাওয়া যায়। উৎপাদন ব্যয়কেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

নিম্নে প্রতিটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল: কোনো পণ্য তৈরি করতে যে কাঁচামালের প্রয়োজন হয় তা ত্রয় করা বাবদ যে খরচ হয় তাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল খরচ বলে। যেমন- কোন আইসক্রিম ব্যবসায় দুধ, চিনি, অন্যান্য ফল, পানি ইত্যাদি আইসক্রিমের জন্য কাঁচামাল। উক্ত কাঁচামালের খরচের সাথে যুক্ত করা হয়।
২. প্রত্যক্ষ মজুরি: কারখানায় পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত শ্রমিকের পারিশ্রমিকই প্রত্যক্ষ মজুরি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন-আইসক্রিম কারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করেন তাদের মজুরি প্রত্যক্ষ মজুরি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
৩. প্রত্যক্ষ ওভারহেড: কিছু কিছু খরচ আছে যেগুলো সরাসরি প্রত্যক্ষ কাঁচামাল অথবা প্রত্যক্ষ মজুরির সাথে যুক্ত করা যায় না। কিন্তু উক্ত খরচগুলো পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। এই সকল খরচকে প্রত্যক্ষ ওভারহেড খরচ বলে। যেমন- কারখানার বিদ্যুৎ খরচ, কাঁচামালের ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম, উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদি। পণ্য উৎপাদন হলে এসব খরচ বৃদ্ধি পায়, আবার পণ্য উৎপাদন না হলে কোনো খরচ হয় না।
৪. অফিসের ব্যয়: যে সকল খরচ অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় হয় তাকে অফিস ব্যয় বলে। উক্ত খরচ উৎপাদিত পণ্যের সাথে সরাসরি জড়িত না। যেমন- ব্যবস্থাপকের বেতন, অফিসের ভাড়া, টেলিফোন বিল, অফিসের বিদ্যুৎ বিল, মনিহারি দ্রব্য ইত্যাদি।
৫. বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়: যে সকল ব্যয় উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে তাকে বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় বলে।

বিক্রয় মূল্য নির্ণয় পদ্ধতি (Built-up to selling price)

উৎপাদন ব্যয়কে যে পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. মুখ্য ব্যয় (Prime cost): প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ-শ্রম এবং প্রত্যক্ষ অন্যান্য ব্যয়ের সমষ্টিকে মুখ্য ব্যয় বলা হয়।

২. কারখানা ব্যয় (Factory cost): মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার সাধারণ খরচ (যেমন পরোক্ষ মাল, পরোক্ষ শ্রম ও পরোক্ষ খরচ) যোগ করলে তাকে কারখানা ব্যয় বলা হয়।

৩. উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production): কারখানা ব্যয়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয়ের সমষ্টিকে উৎপাদন ব্যয় বলা হয়।

৪. মোট ব্যয় (Total Cost): উৎপাদন ব্যয়ের সাথে বিক্রয় ও বণ্টন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ যোগ করাকে মোট ব্যয় বলা হয়।

৫. বিক্রয় মূল্য (Selling price): মোট ব্যয়ের সাথে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত লাভ যোগ করলেই বিক্রয় মূল্য পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, যদি ক্ষতিতে বিক্রয় করা হয় তবে মোট ব্যয় হতে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিয়ে বিক্রয় মূল্য বের করা যায়।

বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে ছক বা চার্টের মাধ্যমে বের করে দেখানো হলো

ক. প্রত্যক্ষ কাঁচামাল " শ্রম " খরচ	মুখ্য ব্যয়
খ. কারখানা ব্যয় বা উপরিখরচ: পরোক্ষ মাল " শ্রম কারখানার মধ্যকার পরোক্ষ খরচ	কারখানা ব্যয় (ক+খ)
গ. অফিস ও প্রশাসনিক উপরিখরচ: অফিসের কর্মচারী, হিসাবরক্ষক ও পরিচালকের বেতন, অফিসের ভাড়া ও কর, মহিনারি দ্রব্য, ডাক ও তার খরচ ইত্যাদি	উৎপাদন খরচ (ক+খ+গ)
ঘ. বিক্রয় ও বিলিখরচ: বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও বিক্রয় কর্মচারীদের বেতন ও কমিশন, বিজ্ঞাপন খরচ, প্যাকিং খরচ, পরিবহন খরচ ইত্যাদি।	মোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)
ঙ. মোট ব্যয়+মুনাফা (-ক্ষতি)-	বিক্রয় মূল্য

* মুখ্য ব্যয়, কারখানা ব্যয়, উৎপাদন ব্যয়, মোট ব্যয় এবং বিক্রয় মূল্য প্রদর্শনপূর্বক ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত কর
(Prepare cost sheet showing prime cost, Factory cost, cost of production, total cost and selling price)

উদাহরণ-১

নিম্নলিখিত তথ্যগুলো অবলম্বন করে ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কাঁচামাল ব্যয়, মুখ্য ব্যয়, কারখানা ব্যয়, মোট ব্যয়, মুনাফা ও বিক্রয় মূল্য প্রদর্শন করে একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরি কর:

মজুদ কাঁচামাল (১-১-২০০৮)	১২,০০০ টাকা।
উৎপাদিত দ্রব্যের মজুদ (১-১-২০০৮)	১৮,০০০ টাকা।
কাঁচামাল ক্রয়	৮০,০০০ টাকা।
প্রত্যক্ষ শ্রম	৭৬,০০০ টাকা।
উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়	২,৬০,০০০ টাকা।
মজুদ কাঁচামাল (৩১-১২-২০০৮)	১২,০০০ টাকা।
উৎপাদিত দ্রব্যের মজুদ (৩১-১২-২০০৮)	১৬,০০০ টাকা।
কারখানা উপরি খরচ প্রত্যক্ষ শ্রমের ১০%।	
প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ কারখানার মোট উৎপাদন ব্যয়ের ১০%।	

সমাধান

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮

কাঁচামাল	টাকা	টাকা
মজুদ কাঁচামাল (১-১-২০০৮)	১২,০০০	
যোগ কাঁচামাল ক্রয়	৮০,০০০	
বাদ: মজুদ কাঁচামাল (৩১-১২-২০০৮)	৯২,০০০	
১। ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ (Cost of raw-material used)	১২,০০০	
প্রত্যক্ষ শ্রম		৮০,০০০
		৭৬,০০০
(২) মুখ্য ব্যয় (Prime cost):		১,৫৬,০০০
কারখানার উপরিখরচ (প্রত্যক্ষ শ্রমের ১০%)		৭,৬০০
(৩) কারখানা ব্যয় (Factory cost):		১,৬৩,৬০০
প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ (কারখানা ব্যয়ের ১০%)		১৬,৩৬০

(৪) মোট ব্যয় (Total cost):	১,৭৯,৯৬০
যোগ: উৎপাদিত দ্রব্যের মজুদ (১-১-২০০৮)	১৮,০০০
বাদ: উৎপাদিত দ্রব্যের মজুদ (৩১-১২-২০০৮)	১,৯৭,৯৬০
(৫) বিক্রয় ব্যয় (Cost of sales)	১৬,০০০
যোগ: মুনাফা	১,৮১,৯৬০
	৭৮,০৮০
(৬) বিক্রয় মূল্য (Selling price)	২,৬০,০০০

উদাহরণ: ২

আইসক্রিমের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ব্যয়	টাকা
দুধ	২,৫০,০০০
চিনি	৬০,০০০
ফল (কলা, কমলা ইত্যাদি)	৭৫,০০০
কাঁচামালের পরিবহন খরচ	১০,০০০
শ্রমিকের পারিশ্রমিক	২০,০০০
কারখানার ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, অন্যান্য	৫,০০০
আইসক্রিম বক্স ক্রয় বাবদ খরচ	৫,৫০০
অফিসের আনুষঙ্গিক খরচ	১০,০০০
বিক্রয় কর্মীদের বেতন	১৫,০০০
টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন বাবদ	২৫,০০০
আইসক্রিম বিভিন্ন দোকানে বিতরণ বাবদ	৮,০০০

উপরে উল্লিখিত খরচ করার পর ৮০০০ লিটার আইসক্রিম তৈরি করা যায়। ১০% মুনাফা যুক্ত করে প্রতি লিটার আইসক্রিম কত টাকায় বিক্রয় করা যাবে।

সমাধান

প্রত্যক্ষ কাঁচামালের খরচ:

	টাকা
দুধ	২,৫০,০০০.০০
চিনি	৬০,০০০.০০
ফল	৭৫,০০০.০০
কাঁচামালের পরিবহন	১০,০০০.০০

		৩,৯৫,০০০.০০
প্রত্যক্ষ মজুরি		২০,০০০.০০
প্রত্যক্ষ ওভারহেড		
কারখানা ভাড়া, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য	৫,০০০.০০	
আইসক্রিম বক্স	৫,৫০০.০০	
		১০,৫০০.০০
উৎপাদিত ব্যয়		৪,২৫,৫০০.০০
অফিস ব্যয়		১০,০০০.০০
বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়		
বিক্রয় কর্মীদের বেতন	১৫,০০০.০০	
বিজ্ঞাপন	২৫,০০০.০০	
বিতরণ	৮,০০০.০০	
		৪৮,০০০.০০
	মোট	৪,৮৩,৫০০.০০
	১০% মুনাফা	৪৮,৩৫০.০০
	বিক্রয় মূল্য	৫,৩১,৮৫০.০০

৫৩১,৮৫০ টাকা যদি ৮০০০ লিটার আইসক্রিমের মোট বিক্রয়মূল্য হয় তবে প্রতি লিটারের বিক্রয়মূল্য = $৫৩১,৮৫০ \div ৮০০০ = ৬৬.৪৮$ টাকা।

যখন প্রতি লিটার আইসক্রিমের মূল্য ছিল $৪৮৩,৫০০ \div ৮০০০ = ৬০.৪৪$ টাকা।

সেবামূলক ব্যবসা (Service Business)

যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় উৎপাদনের সাথে জড়িত না হয়ে আত্মকর্মসংস্থামূলক পেশার সাথে জড়িত রয়েছে তাদেরকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বলে। যেমন- হোটেল, ক্যান্টিন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন কোম্পানি, ইত্যাদি। সেবামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন ব্যয় পর্যায় এসে সংগ্রহ করা হয় এবং মোট পরিচালন ব্যয়কে নির্দিষ্ট সময়ান্তে মোট সেবা একক দ্বারা ভাগ করে সেবা এককের ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

প্রশ্নমালা-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বুক-কপিং-এর জনকের নাম কী?
২. বুক-কপিং এর উপর রচিত প্রথম গ্রন্থের নাম কী?
৩. হিসাবরক্ষণ কী?
৪. বুক-কপিং থেকে একজন ব্যবসায়ী কী কী তথ্য পেতে পারেন?
৫. বুক-কপিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য কী?
৬. হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?
৭. নগদান বহির শ্রেণিবিভাগ দেখাও।
৮. পণ্য মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
৯. ক্রয় মূল্য ব্যবসা কাকে বলে?
১০. সেবামূলক ব্যবসা কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লুকা-প্যাসিওলিকে বুক-কপিং-এর জনক বলা হয় কেন?
২. বুক-কপিংকে কলা ও বিজ্ঞান বলা হয় কেন?
৩. বুক-কপিং-এর সংজ্ঞা দাও।
৪. হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও।
৫. হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
৬. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও।
৭. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতিগুলো কী কী উল্লেখ কর।
৮. নগদান বহির সংজ্ঞা দাও।
৯. চূড়ান্ত হিসাব কাকে বলে?
১০. লাভ-ক্ষতি হিসাব কাকে বলে?
১১. নগদান বহির সর্বাবস্থায় ডেবিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বুক-কপিং-এর উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।
২. হিসাবরক্ষণের সুবিধাগুলো আলোচনা কর।
৩. হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
৪. হিসাবরক্ষণের আওতা বা পরিধি আলোচনা কর।

৫. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ আলোচনা কর।
 ৬. মেসার্স সাম্য এন্ড কোং-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বনে একটি দু'ঘরা নগদান বহি তৈরি কর।

২০০৮ ইং

- নভে:-১ হাতে নগদ ৭,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্ধৃত ১১,০০০ টাকা
 নভে:-৫ মি: শুভ এর নিকট ৪,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করা হলো এবং চেকের মাধ্যমে অর্থ পাওয়া গেল।
 নভে:-৭ মাল ক্রয় করা হলো ১,০০০ টাকা এবং চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হলো।
 নভে:-১০ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ২,৫০০ টাকা।
 নভে:-১২ অফিসের প্রয়োজনে ১,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৩৫০ টাকা উঠানো হলো।
 নভে:-১৯ শরিফ ব্রাদার্সকে ১,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।
 নভে:-২১ ছালামের নিকট হতে প্রাপ্ত ৪,০০০ টাকার একটি চেক ঐ দিনই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
 নভে:-২৭ ভাড়া বাবদ ২০০ টাকা নগদ ও বেতন বাবদ চেকে ১,০০০ টাকা দেওয়া হলো।
 নভে:-২৯ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১০০ টাকা ও ধার্যকৃত চার্জ ২০০ টাকা।

৭. মেসার্স শাহীন এন্ড কোং এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করে একটি তিনঘরা নগদ বই তৈরি কর।

২০০৯ সাল

- জানু:-১ নগদ তহবিল ১১,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্ধৃত ৯,০০০ টাকা।
 জানু:-৪ মাজী এন্ড কোং কে তাদের ১,১০০ টাকা পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তি বাবদ ১,০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করা হলো।
 জানু:-৮ নগদ ৯০০ টাকা ও চেক মারফত ১,৮০০ টাকার পণ্য ক্রয়।
 জানু:-১১ অফিসের জন্য ৭০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৫০০ টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হলো।
 জানু:-১৬ নগদ ১,২০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরাসরি ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।
 জানু:-২৪ নাহিদ এন্ড কোং এর নিকট থেকে তাদের ২,৫০০ টাকা দেনার পূর্ণ নিষ্পত্তি বাবদ ২,৪৫০ টাকার একটি চেক পাওয়া গেল।
 জানু:-২৭ বেতন বাবদ নগদ ৮০০ টাকা, ভাড়া নগদ ৫০০ টাকা এবং বিজ্ঞাপন বাবদ ৪০০ টাকা চেক মারফত প্রদান করা হলো।
 জানু:-৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১১০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ৭০ টাকা।

৮. মেসার্স এস.কে. এন্টারপ্রাইজ এর নিম্নপ্রদত্ত রেওয়ামিল হতে ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের (ক) ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (খ) লাভ-লোকসান হিসাব (গ) উদ্ধৃতপত্র প্রস্তুত কর।

রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০০৮

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মূলধন হিসাব		১,০০,০০০.০০
উত্তোলন হিসাব	১৯,২০০.০০	
মজুত মাল (১-১-২০০৮)	৩৪,০০০.০০	
মাল ক্রয় ও বিক্রয়	২,৮২,০০০.০০	৪,৪৩,২০০.০০
ফেরত	১১,২০০.০০	৬,০০০.০০
বেতন	৪৮,০০০.০০	
ভাড়া	১৪,৪০০.০০	
মজুরি	১৮,০০০.০০	
বিমা সেলামি	৮০০.০০	
আসুঃপরিবহন	৬,০০০.০০	
বহিঃপরিবহন	১০,০০০.০০	
উপ-ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে ভাড়া প্রাপ্তি		৬,৮০০.০০
আমদানি শুল্ক	২০,০০০.০০	
অনাদায়ী দেনা		৩,২০০.০০
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি		৪,০০০.০০
৬% বিনিয়োগ (১-৩-২০০৮)	২০,০০০.০০	
দেনাদার ও পাওনাদার	৬০,০০০.০০	৪০,০০০.০০
আসবাবপত্র	১০,০০০.০০	
কলকজা		৪০,০০০.০০
নগদ তহবিল	৮০০.০০	
ব্যাংক জমার উদ্ধৃত	২,৪০০.০০	
	<u>৬,০০,০০০.০০</u>	<u>৬,০০,০০০.০০</u>

নিম্নলিখিত সমন্বয়গুলো সাধন করা প্রয়োজন

ক. সমাপনী মজুত পণ্য ১,০০,০০০.০০ টাকা ।

খ. বেতন ও মজুরি যথাক্রমে ৬,০০০.০০ টাকা ও ৪,০০০.০০ টাকা বকেয়া রয়েছে ।

গ. উপ-ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ২,০০০.০০ টাকা ভাড়া অগ্রিম নেওয়া হয়েছে ।

ঘ. বিবিধ দেনাদারের উপর ৫% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি রাখ ।

ঙ. আসবাবপত্রের উপর ৫% ও কলকজার উপর ২.৫% অবচয় ধর ।

৯. ২০০৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মি. হামিদের রেওয়ামিল অবলম্বনে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব এবং উক্ত তারিখে একটি উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত কর।

রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ২০০৭

বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মি. হামিদের মূলধন		১৫,০০০.০০
বিক্রয়		৪০,০০০.০০
বিবিধ দেনাদার ও পাওনাদার	৫,০০০.০০	৪,৬০০.০০
প্রারম্ভিক মজুত পণ্য	৯,০০০.০০	
ক্রয়	৩০,০০.০০	
ফেরত	৯০০.০০	৪০০.০০
কমিশন	৫০০.০০	
বেতন	১,০০০.০০	
মজুরি	১,৫০০০.০০	
ভাড়া	৪০০.০০	
বিমা খরচ	১,২০০.০০	
কুঋণ	৫০০.০০	
বাট্টা	৩০০.০০	
অফিস খরচ	৩০০.০০	১,২০০.০০
আসবাবপত্র	৩,০০০.০০	
হাতে নগদ	২,১০০.০০	
ব্যাংকে জমা	৫,০০০.০০	
কু-ঋণ সঞ্চিতি		
মি. হামিদের উত্তোলন	৮০০.০০	
	<u>৬১,৫০০.০০</u>	<u>৬১,৫০০.০০</u>

সমন্বয়সমূহ

ক. সমাপনী মজুত পণ্য ১১,০০০.০০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

খ. বকেয়া বেতন ৫০০.০০ টাকা।

গ. বিবিধ দেনাদারের উপর ৫% হারে কুঋণ সঞ্চিতি রাখতে হবে।

ঘ. বিমা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে ৩০০.০০ টাকা।

ঙ. আসবাবপত্রের উপর ৫% অবচয় ধরতে হবে।

১. ব্যাংক ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

২. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।

৩. ব্যাংক ঋণ গ্রহণের সময় উদ্যোক্তার বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

৪. মেদুলিয়া গ্রামের জমিলা ঋণের সদ্যবহার যেভাবে করেছেন তার বর্ণনা দাও।

অষ্টম অধ্যায়

সফল উদ্যোক্তার ঘটনা বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন

ভূমিকা (Introduction): ব্যবসায় সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা অর্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করা আবশ্যিক। পরিদর্শন পর্যায়ক্রমেও সুশৃঙ্খল হওয়া উচিত। প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তগুলো খাতায় লিখে নেওয়া উচিত যাতে প্রতিবেদন রচনায় কোনো অসুবিধা না হয়।

একজন সফল উদ্যোক্তার ঘটনা বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী ১৯২৬ সালে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের ধেওয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আর্থমিত্র হাইস্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উপমহাদেশে চল্লিশের দশকে যখন বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব চলছিল তখন পাকিস্তান আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ঐ সময় জনাব চৌধুরী এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। আর্থিক সংকটের কারণে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অপরাগ হয়ে তিনি একটি চাকরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বিকল্প চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

১৯৪৫ সালে তিনি একজন বন্ধুসহ রাউজানের ফকিরহাটে ৬২০ টাকা মূলধন নিয়ে একটি বই-এর দোকান স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করেন। মূলধনের অধিকাংশ মালিক ছিলেন তার বন্ধু। মূলধনে তাঁর নিজের অংশ যেটুকু ছিল তা তিনি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার কর্ত্ত করে সংগ্রহ করেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ থেকেই তিনি বইয়ের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু শুধু জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে স্কুলগামী ছাত্রদের প্রয়োজনানুসারে বই বিক্রি করে যে আয় হতো তাতে চলা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁরা বন্ধু মিলে বইয়ের ব্যবসায়ের সাথে মনিহারি দ্রব্যের ব্যবসাও শুরু করলেন, যাতে আয় বৃদ্ধি পায়। দুইবছর যাবৎ ব্যবসা চালিয়েও আশানুরূপ মুনাফা করতে না পেরে জনাব চৌধুরী চট্টগ্রাম শহরে বর্তমান সমবায় সমিতি সদনের সামনে মাসিক ১৮ টাকা ভাড়ায় একটি ছনের তৈরি দোকান ভাড়া নেন। সেখানে তিনি দুই হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে মনিহারি দোকান শুরু করেন (রাউজানের ব্যবসায় গুটিয়ে তার বন্ধু ১৯৪৮ সালে তাঁর সাথে যোগ দেন)।

কিন্তু, দোকান থেকে যে আয় হতো তা দিয়ে একটি ছোট পরিবারই চালানো খুব কঠিন ছিল। তখন জনাব চৌধুরী অন্যান্য সুযোগের সন্ধ্যানে ব্যাপ্ত হন এবং পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রকাশিত ডন গ্রুপের ‘ইলাস্ট্রেটেড উইকলি’ নামে একটি পত্রিকা চট্টগ্রামের জন্য নিজের নামে এজেন্সী গ্রহণ করেন। এই এজেন্সির জন্য তাঁকে এক হাজার টাকা জামানত প্রদান করতে হয়। এ টাকা তাঁর পিতা সংগ্রহ করে দেন। এই সময় তিনি পুরনো দোকানের সল্লিকটে ‘নিউজ ফ্রন্ট’ নামে আর একটি দোকান মাসিক ৯ টাকা ভাড়ায় দখল নেন।

আপোসের মাধ্যমে পুরা দোকানটি বন্ধুকে দিয়ে দেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত মর্নিং নিউজ ও পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার এজেন্ট নিযুক্ত হন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন উর্দু বই ও জার্নালও তাঁর দোকানে বিক্রি হতো। ১৯৫১-৫২ সালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকা ‘ডন’ এবং ‘পাকিস্তান টাইমস’, ‘গুজ বাড়ী ডন’, ‘মিল্লাত’ প্রভৃতির এজেন্সি পান। ফলে তাঁর ব্যবসায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এ সময়ে তিনি পার্শ্ববর্তী দোকানটি ভাড়া নিয়ে তার বড় ভাইয়ের সহায়তার ব্যবসায় চালাতে থাকেন।

তাঁর ব্যবসায়ের যখন রমরমা অবস্থা তখন তিনি পেংগুইন ও পেলিকান পেপারব্যাক বইপত্র আমদানি শুরু করেন। তাঁর এসব বই ও ইংরেজি সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের প্রধান খরিদার ছিল বিদেশিরা।

এই পর্যায়ে জনাব চৌধুরী একটি প্রিন্টিং প্রেস (ছাপাখানা) প্রতিষ্ঠা করার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালে বিশ হাজার টাকা ব্যায়ে তিনি ‘সিগনেট’ প্রেস স্থাপন করেন। এই প্রেসে ২০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়। প্রেসের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারি প্রথমে স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানি থেকে আমদানি করা হয়। ১৯৬০ সালে বিদেশ থেকে কিছু প্রিন্টিং ও কাটিং মেশিন আমদানি করে ব্যবসায়ের পরিধি বিস্তৃত করেন। এই সময়ে তিনি প্রকাশনা ব্যবসায়েও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কতিপয় বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বই ছাপান এবং সম্ভাবনাময় লেখকদেরকে ধারে বই ছাপানোর ব্যাপারে সাহায্য করেন। কিন্তু প্রকাশিত বইগুলি ভালো বিক্রি না হওয়ায় সাহায্য গ্রহণকারী লেখকরা তাঁদের বইগুলি ডেলিভারি নেননি। প্রকাশনা ব্যবসায়ে মার খেয়ে তিনি প্যাকেজিং শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট নন। ১৯৬১ সালে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবিপি) থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ নিয়ে পশ্চিম জার্মানি থেকে প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং মেশিনারি আমদানি করেন।

সে সময় চট্টগ্রামে আরও দুটি প্যাকেজিং ইউনিট ছিল। তিনি তাঁর ছাপাখানার পাশে আলাদা জমিতে প্যাকেজিং শিল্প স্থাপন করেন। সেখানে ত্রিশ জন লোককে নিয়োজিত করতে হয়েছিল।

তখনকার আমলে প্যাকেজিং মেশিন চালানোর জন্য আমাদের দেশে দক্ষ কারিগর ছিল না। করাচিতে অবস্থানরত পশ্চিম জার্মানির হাইডেলবার্গ কোম্পানির প্রকৌশলীরা এসে জনাব চৌধুরীর কর্মচারীকে মেশিন পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তৎকালীন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬৭ সালে প্যাকেজিং ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আইডিবিপি-এর নিকট থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ’৬৯ সালে মেশিনারি আমদানি করেন। তিনি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের সাথে তাদের ইমারতের পেছনে ছয় হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি দালান তৈরি করার জন্য (এক লাখ টাকা অগ্রিম ভাড়া দিয়ে) একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই দালানে পরে ছাপাখানা ও প্যাকেজিং ইউনিট স্থানান্তর করা হয়। ইতোপূর্বে ১৯৬৫ সালেই বিপনি বিতানে নিউজ ফ্রন্ট ও পুরানো দোকানটি স্থানান্তর করা হয়।

১৯৭০ সালে প্যাকেজিং মেশিনারির শেষ চালান এসে পৌঁছায়। যন্ত্রপাতি স্থাপিত হওয়ার পরপরই স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সবকিছু একজন গার্ডের তত্ত্বাবধানে রেখে দিয়ে তিনি রাউজানে গ্রামের বাড়িতে চলে যান।

তাঁর অবর্তমানে ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পূর্বে দুইজন মিলিটারি, আলবদর, রাজাকারদের একটি বাহিনীসহ জনাব চৌধুরীর বাড়ি ঘেরাও করে তাকে পরিবারসহ মেয়ে ফেলার হুমকি দেয়। তিনি যথাসর্বস্ব প্রদান করে জীবন রক্ষা করেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি অনাদায়ী নিউজ পেপার বিল বাবদ এক লাখ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হন। হকারদেরকে প্রদত্ত ত্রিশটি বাইসাইকেলও হারান।

স্বাধীনতার পর অবাঙালি কারিগররা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় কারিগরের সংকটে পড়ে তাঁর ব্যবসা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি নিজ উদ্যোগে স্থানীয় কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে আবার ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে জনাব চৌধুরী ষোলশহরের বিসিক শিল্প নগরীতে সিগনেট বক্স ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করেন। এই প্রকল্পে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা।

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি দশ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ‘পূর্বকোণ’ নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।

জনাব চৌধুরী একজন সফল উদ্যোক্তা, শূন্য থেকে আরম্ভ করে তিনি একটি সম্প্রসারণশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বর্তমানে বাজার দরে তাঁর চারটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদের মোট মূল্য চার কোটি টাকার বেশি। তাঁর দীর্ঘ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতে তিনি উপলব্ধি করেন যে, সফল উদ্যোক্তার কয়েকটি বিশেষ গুণ অপরিহার্য। কারণ প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধান; ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা পূর্বানুমান করার ক্ষমতা, ভবিষ্যৎ কারবার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ এবং পণ্য বিপণনের জন্য সঠিক বণ্টন প্রণালির ব্যবহার। তিনি উল্লেখ করেন যে, সফল উদ্যোগের পথে অন্যতম অন্তরায় হলো সঠিক পরামর্শ ও নির্দেশনার অভাব।

কেসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত শিল্পোদ্যোগ পরিচিতি বই থেকে সংকলিত যা ২০১৬ সালের পূর্বে তৈরি করা হয়েছে।

পরিদর্শনের সংজ্ঞা (Definition of Inspection)

ব্যবসাসংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পর সরেজমিনে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, আকৃতি, অবস্থা, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের প্রক্রিয়াকে পরিদর্শন বলে। পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক ও বাস্তব ধারণা প্রদান করা, যাতে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সম্পর্কে তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

পরিদর্শনের সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি

তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়ে ধারণক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। পরিদর্শনের কতকগুলো সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য

পরিদর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক ও বাস্তব ধারণা অর্জন করা, যাতে ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সম্বন্ধে তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

খ. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

পরিদর্শনের কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. ছাত্র-ছাত্রীদের একটি ব্যবসায় বা শিল্পের পরিবেশ ও কার্যক্রম স্বচক্ষে দেখার ও কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করার সুযোগ দান।
২. ব্যবসাকে যারা জীবিকা অর্জনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ দান।
৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় ও শিল্পোদ্যোগীর ভূমিকা কী সে সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করার সুযোগ দান।
৪. ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী হওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ৫। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- ৬। ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্দীপ্ত করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিদর্শনের সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি অনুসরণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া পরিদর্শনের ফলে তাদের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।

ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কার্যপ্রণালি

ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মপ্রণালি অনুসরণ করতে হয়। যেমন—

সময়: পরিদর্শনের দিন ও তারিখ স্থির করতে হবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি: ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, প্রশ্নাবলির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিষ্ঠান নির্বাচন: সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিদর্শনের জন্য নিকটবর্তী বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবেন।

অনুমতি গ্রহণ: পরিদর্শনের পূর্বে অধ্যক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মালিক বা ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হবে।

তথ্যাবলি: শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে:

১. প্রশাসন সংক্রান্ত তথ্যাবলি
২. উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি
৩. স্টাফিং নিয়ন্ত্রণ ও প্রেষণা সংক্রান্ত তথ্যাবলি
৪. পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি
৫. প্রকল্প ব্যয় (স্থায়ী মূলধন, চলতি মূলধন, অর্থসংস্থা) সংক্রান্ত তথ্যাবলি
৬. হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি
৭. ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি

কার্যাবলি: প্রতিটি গ্রুপের সাথে পরিদর্শনকালে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা-প্রদান করবেন। প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে। পরিদর্শনের ৬/৭ দিন পর ছাত্র-ছাত্রীরা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে রিপোর্ট উপস্থাপন করবে। প্রতিটি গ্রুপ হতে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক রিপোর্টের উপর আলোচনা করবেন। এতে সকল ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিতে পারবে। এর ফলে একটি গ্রুপ অন্য গ্রুপের রিপোর্টের উপর আলোচনার সুযোগ পাবে। এতে সামগ্রিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকতর লাভবান হবে।

ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ফলপ্রসূ আলোচনায় বিবেচনাযোগ্য প্রশ্নাবলি

ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য অত্যাৱশ্যকীয় প্রশ্নপত্র

ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তার কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?
২. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কি আশ্রাৱদ সাফল্য অর্জন করেছে? করে থাকলে সাফল্যের কারণ কী?
৩. ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তিনি কীভাবে সেগুলো মোকাবিলা করেছেন।
৪. প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো কী রূপ?
৫. বাজারজাতকরণ পরিবেশ কী সন্তোষজনক? সন্তোষজনক না হলে তার কারণ কী?
৬. পণ্য বাজারজাতকরণে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কী?
৭. প্রতিষ্ঠানের কর্মী নির্বাচন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কী রূপ।
৮. প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কী রূপ?
৯. প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও অর্থসংস্থানের উৎস কী কী?
১০. কীভাবে প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।
১১. প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ও মুনাফা নীতি কী রূপ?

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপরে উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করে বুঝতে পারবে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান কতটুকু সফল হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কী রূপ ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে?

ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও বাস্তব ধারণা অর্জন করা এবং হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করা। ছাত্র-ছাত্রীরা যে রূপ ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে তা নিম্নরূপ:

১. ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ যেন সুন্দর হয়।
২. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ছাত্র-ছাত্রীদের আস্তানা থেকে যেন বেশি দূরে না হয়।
৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধরনের হলে ভালো হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। এতে তারা তাদের প্রত্যাশিত জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

শিল্পোদ্যোক্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার (Interview with Entrepreneur)

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য সাক্ষাৎকার একটি সহজ ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কিত নানা তথ্য সংগ্রহ করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের লক্ষ্যে যে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয় তা শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সহায়তায় তৈরি করতে পারে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যের পাশাপাশি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে পরিচয়ের সুযোগ পায়। শিল্পোদ্যোক্তার জীবনী, প্রতিষ্ঠানের জন্ম-ঠিকানা, মূলধন, মূলধনের উৎস, ব্যবসার প্রকৃতি বিক্রয় ও আয়ের পরিমাণ, শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি, কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা, হিসাবরক্ষণ প্রণালি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে পরিচালক বা মালিকের সাথে আলাপ-আলোচনার অনুষ্ঠানকে সাক্ষাৎকার বলে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি (Preparation in advance for an interview)

শিল্পোদ্যোক্তা হলেন সমাজের একজন সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাই তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার পূর্বে অবশ্যই অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তাঁর ব্যক্তি ও কর্মজীবন সম্পর্কে পূর্ব হতেই ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত। শিক্ষকের সহায়তায় তৈরি প্রশ্নমালা কয়েক দিন পূর্বে উদ্যোক্তার নিকট পৌঁছানো গেলে ভাল হয়। এতে তিনি প্রশ্নাবলি সম্পর্কে পূর্বেই একটি ধারণা পেতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী উত্তরসমূহ তৈরি করে নিতে পারেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে। ফলপ্রসূ সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য উপরোক্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়কালীন সতর্কতাসমূহ (Precautions before an interview)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে:

১. আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে।
২. সাক্ষাৎকার গ্রহণে উভয় পক্ষই খোলামেলা আলোচনা করবে।
৩. কোনো অবস্থাতেই শিল্পোদ্যোক্তাকে বিব্রতকর প্রশ্ন করা উচিত নয়।
৪. কোনোভাবেই উদ্যত আচরণ করা উচিত নয়।
৫. অপ্রাসঙ্গিক কোনো প্রশ্ন করা উচিত নয়।
৬. অনর্থক প্রশ্ন করা উচিত নয়। তবে পরিপূরক প্রশ্ন করা যেতে পারে।

শিল্পোদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নাবলির নমুনা (Sample of questionnaire for interview with an entrepreneur)

১. প্রতিষ্ঠানের নাম
২. প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তার নাম
ক. অফিস খ. কারখানা
৩. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
৪. প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ও উৎসসমূহ
৫. ব্যবসায় জীবনের শুরু কীভাবে?
ক. উৎপাদন খ. কেনাবেচা গ. সেবামূলক
৬. প্রতিষ্ঠানটি কী ধরনের ব্যবসা করে?
৭. কেন এই ব্যবসা বেছে নিলেন?
৮. এই পেশায় আসার পিছনে কার অনুপ্রেরণা বেশি
৯. আনুমানিক মাসিক বিক্রির পরিমাণ কত
১০. শ্রমিক-কর্মীদের জন্য কী পরিমাণ বেতন ও মজুরি প্রদান করতে হয় (মাসিক)
১১. মাসিক নিট আয় কত? (আনুমানিক)
১২. কর্মীদের কীভাবে প্রেরণা দেওয়া হয়
১৩. একজন সফল উদ্যোক্তার কী কী গুণ থাকা উচিত।
১৪. ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত সরকারি সাহায্য সহায়তাগুলো কি পর্যাপ্ত? পর্যাপ্ত না হলে কেন নয়?
১৫. প্রতিষ্ঠানে কীভাবে কর্মী নিয়োগ করেন?
১৬. কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কী? থাকলে কী রূপ
১৭. প্রতিষ্ঠানের হিসাব কীরূপে সংরক্ষণ করা হয়
১৮. ব্যবসা সম্প্রসারণের কোনো ইচ্ছা আছে কি না
১৯. ব্যবসা পরিচালনায় কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন কী? ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা কী ধরনের? তা কীভাবে সফলতার সাথে কাটানো যায়।
২০. আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য কিছু মতামত

শিল্প উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার প্রশ্নের নমুনা উত্তর

১.	প্রতিষ্ঠানের নাম	গোল্ডেন রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ
২.	প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তার ক. অফিস খ. কারখানা ৩. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:	৮৭৪, ডি.টি.রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম। ফোন: ৭২৪৯৫০ ৫২/বি; বিসিক শিল্প নগরী কালুরঘাট, চট্টগ্রাম। ফোন: ৬৭১৩০১
৪.	প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ও উৎসসমূহ	প্রায় ২০ লাখ টাকা। নিজস্ব তহবিল আত্মীয়-পরিজন, বন্ধবান্ধব।
৫.	প্রতিষ্ঠানটি কী ধরনের ব্যবসা করে?	উৎপাদনমূলক

৬.	আপনার ব্যবসায় জীবনের শুরু কীভাবে?	'৭৭ সাল হতে '৮৩ সাল পর্যন্ত আমি ঢাকায় এসোসিয়েটস ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত ছিলাম। উক্ত অভিজ্ঞতা হতেই আমি '৮৪ সালে এই ব্যবসা চট্টগ্রামে শুরু করি।
৭.	আপনি কেন এই ব্যবসা বেছে নিলেন?	আমার এই ব্যবসায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তাছাড়া এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক।
৮.	এই পেশায় আসার পিছনে কার অনুপ্রেরণা বেশি?	লাভ দেখে আমি নিজ হতেই অনুপ্রাণিত হয়েছি।
৯.	আনুমানিক মাসিক বিক্রির পরিমাণ কত?	প্রায় দুই লাখ।
১০.	শ্রমিক কর্মীদের জন্য কী পরিমাণ বেতন ও মজুরি প্রদান করতে হয় (মাসিক)?	প্রায় ৭৫ হাজার টাকা
১১.	মাসিক নিট আয় কত? (আনুমানিক)	প্রায় ২০/২৫ হাজার টাকা।
১২.	কর্মীদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়?	বোনাস, ওভারটাইম, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।
১৩.	আপনার মতে, একজন সফল উদ্যোক্তার কী কী গুণ থাকা উচিত?	সাহস, ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, ধৈর্য্য, সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষমতা, সততা ইত্যাদি।
১৪.	ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত সরকারি সাহায্য সহায়তাগুলো কি আপনি পর্যাপ্ত মনে করেন? না হলে কেন নয়?	পর্যাপ্ত নয়, তাছাড়া সরকারি নিয়মনীতি জটিল ও আমলাতান্ত্রিক।
১৫.	কর্মীদের কীভাবে নিয়োগ করেন?	অভ্যন্তরীণ উৎস হতে
১৬.	কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি? থাকলে কী রূপে?	হ্যাঁ, বিসিকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
১৭.	প্রতিষ্ঠানের হিসাব কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়?	হিসাবরক্ষকের মাধ্যমে; ব্যালেন্স শিট তৈরি করে।
১৮.	ব্যবসা সম্প্রসারণের কোনো ইচ্ছা আছে কি?	ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে একটা টায়ার-টিউবের কারখানা করার উদ্যোগ নিয়েছি।
১৯.	ব্যবসা পরিচালনায় কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন কী? ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা কী ধরনের? তা কীভাবে সফলতার সাথে কাটানো যায়।	হ্যাঁ সরকারি নীতিমালা উদার নয়। মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির কারণে উন্নত পণ্য বাজারে বিরাজ করছে। তাই আমাদের পণ্যগুলোর বাজার কম। TAX ও VAT প্রথা সঠিক নয়। সরকারি নীতিমালাসমূহ পরিবর্তন ও যুগোপযোগী করে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা যেতে পারে।
২০.	২১. আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য কিছু মতামত দিলে কৃতার্থ হব।	তরুণদের শিল্পোদ্যোগে প্ররোচিত করতে হবে। প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি সহজতর করতে হবে। একমাত্র শিক্ষিত তরুণদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বীপ্ত করতে পারলেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

ক. ভূমিকা: ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বাস্তব ধারণা দেওয়ার জন্য ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব চিত্র যেমন: প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বহিঃস্থ পরিবেশ, ব্যবসার গতি প্রকৃতি, অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

খ. প্রতিষ্ঠান নির্বাচন: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের লক্ষ্যে শুরুতে পরিদর্শনের উপযোগী একটি ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে। সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী কোনো ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা উচিত।

তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করতে হবে। পরিদর্শনের দিন ও তারিখ ঠিক করার ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

ঘ. অনুমতি গ্রহণ: যে প্রতিষ্ঠানটিকে পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, পরিদর্শনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ব্যবস্থাপকের অনুমতি নিতে হবে। এ লক্ষ্যে লিখিতভাবে অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. সংগৃহীতব্য তথ্যাবলি: ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:

১. মালিকের শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি।
২. প্রশাসন সংক্রান্ত তথ্যাবলি।
৩. উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি।
৪. পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি।
৫. স্টাফিং নিয়ন্ত্রণ ও প্রেষণা সংক্রান্ত তথ্যাবলি।
৬. প্রকল্প ব্যয় মেয়াদি মূলধন, চলতি মূলধন, অর্থ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যাবলি।
৭. হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি।

চ. প্রশ্নমালা প্রণয়ন: ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই লক্ষ্যে পরিদর্শনে যাওয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে একটি উপযুক্ত প্রশ্নমালা প্রণয়ন করতে হবে। নিম্নে একটি প্রশ্নপত্রের নমুনা দেখানো হলো:

১. একজন উদ্যোক্তার কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন?
২. প্রতিষ্ঠানটি কি আশাপ্রদ সাফল্য লাভ করেছে? করে থাকলে সাফল্যের কারণ কী? না করে থাকলে কী কী কারণে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি?

৩. ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? তিনি কীভাবে সেগুলো মোকাবিলা করেছেন?
৪. প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো কী রূপ?
৫. প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়া কী রূপ?
৬. পণ্য কীভাবে বাজারজাত করা হয়?
৭. পণ্য বাজারজাতকরণে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি? থাকলে তা কীভাবে দূর করা সম্ভব?
৮. প্রতিষ্ঠানের কর্মী নির্বাচন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কী রূপ?
৯. প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কী রূপ?
১০. কীভাবে কর্মীদের প্রোষিত করা হয়?
১১. প্রতিষ্ঠানের বিপণন পরিবেশ কী সন্তোষজনক? সন্তোষজনক না হলে তার কারণ কী? কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বিপণন পরিবেশ সন্তোষজনক করা যায়?
১২. প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও অর্থকর্মসংস্থানের উৎসসমূহ কী কী? এতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কি? হলে কীভাবে তা দূর করেছেন?
১৩. কীভাবে প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়?
১৪. প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ও মুনাফা নীতি কী রূপ?
১৫. ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্যোক্তার অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু মতামত।

ছ. পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন: নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাথে নিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করে। পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ পরিদর্শন করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা; কর্মচারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে।

জ. প্রতিবেদন প্রণয়ন: পরিদর্শন শেষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের উপর সংগৃহীত তথ্যাবলির আলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদনের নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট জমা দেবে।

ঝ. উপসংহার: বাস্তব শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে শিল্প স্থাপন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তার গুণাবলি পর্যবেক্ষণ, সাধারণ সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তার সমাধান বের করা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান দান করে। মূলত এই লক্ষ্যেই ব্যবসায়ের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদন

ভূমিকা: তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম একটি খাত। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ৬০% হতে ৭০% আয় এ খাত থেকে আসে। তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রসারের কারণে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বিরাট বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান বা গার্মেন্টস শিল্পকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বললে ভুল হবে না।

পরিদর্শনকৃত পোশাক রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: আমাদের পরিদর্শনকৃত তৈরি পোশাক রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের নাম জি. আর অ্যাপারেলস লি.। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট এলাকায় অত্র প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন।

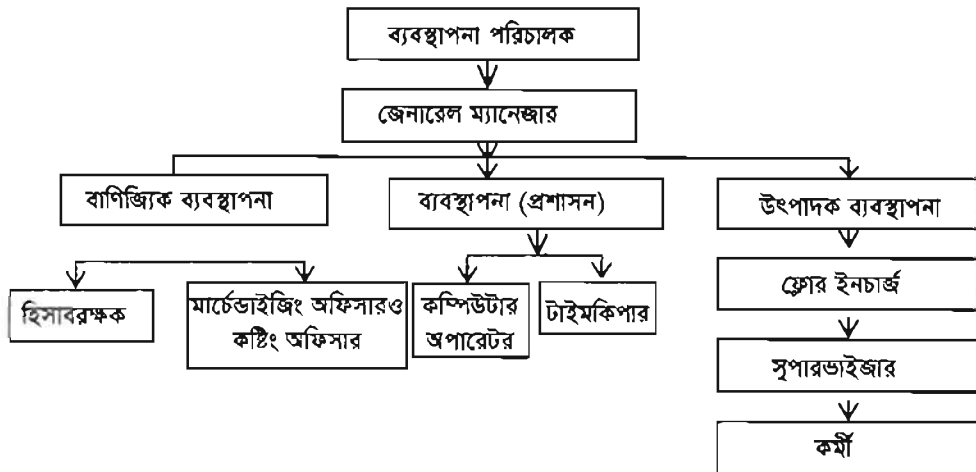
মূল প্রতিবেদন : গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম কিবরিয়ার সাথে কথা বলে আমরা গার্মেন্টস শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি, বাজার চিহ্নিতকরণ, ক্ষরমায়েশ প্রাপ্তি, রপ্তানি বাজারের ধরন, আর্থিক তথ্যাবলি, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্পে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে যা জেনেছি, তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো:

উৎপাদিত পণ্যের ধরন: আমাদের পরিদর্শনকৃত জি. আর অ্যাপারেলস লি. মূলত ওভেনজাতীয় কাপড় তৈরি করে। আর এ ওভেনজাতীয় কাপড়ের মধ্যে প্যান্ট ও জ্যাকেট অন্যতম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: পোশাক তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয়। এ উপকরণসমূহের মধ্যে কাপড়, সুতা, বোতাম, ওভেন ইন্টার লাইনিং, স্পেনবাটন, ওভেন লেভেল, সাইজ লেভেল, ফেয়ার লেভেল, পলিব্যাগ ও কার্টন অন্যতম। কারখানার বিভিন্ন স্তরে পরিদর্শন করে দেখা গেছে, দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে উপরোক্ত তালিকার বাইরে আরও অনেক উপকরণের প্রয়োজন হয়।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: জি. আর অ্যাপারেলস লিমিটেডের পরিচালনা মূলত তিন সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের উপর নির্ভরশীল। পরিচালনা পর্ষদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা জনাব গোলাম কিবরিয়া দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :



শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা সংক্রান্ত তথ্য: জি. আর অ্যাপারেলস লি. এ সর্বমোট ৭০০ জনের মতো কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। কর্মরতদের মধ্যে অধিকাংশ কর্মচারী। নিম্নে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের হিসাব দেখানো হলো :

১	কর্মী	৬৫০ জন
২	অফিস কর্মচারী	৪০ জন
৩	কর্মকর্তা	১০ জন

উৎপাদন পদ্ধতি: জি. আর অ্যাপারেলস লি.-এ ১৫,০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট উৎপাদন ফ্লোর রয়েছে। এতে সর্বমোট ৬০০টি সেলাই মেশিন রয়েছে। কারখানার সব সেলাই মেশিন স্বয়ংক্রিয়। মেশিনগুলো স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয় বলে জানান ফ্যাষ্টরীর উৎপাদন ব্যবস্থাপক। একজন উৎপাদন ব্যবস্থাপকের নির্দেশনায় প্রতি ফ্লোরে একজন ফ্লোর ইনচার্জ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উৎপাদন পদ্ধতি পরিচালিত হয়। আবার প্রতি ফ্লোরে একজনের অধিক সুপারভাইজারও কাজ করেন।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ: প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক জানান উক্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তারা নানা ধরনের আর্থিক উৎসাহমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে উপস্থিতি বোনাস ও উৎপাদন বোনাস অন্যতম।

তৈরি পোশাকের চাহিদা: আমাদের পরিদর্শনকৃত জি. আর অ্যাপারেলস লি. এর তৈরি পোশাকের চাহিদার বেশির ভাগ অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। এছাড়া ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডসেও তাদের উৎপাদিত তৈরি পোশাকসমূহ মাঝে মাঝে রপ্তানি করা হয়।

রপ্তানি বাজারের ধরণ ও রপ্তানি পদ্ধতি: পরিদর্শনকৃত তৈরি পোশাক রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে হয়। অবশ্য উক্ত প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাজার খুঁজে বের করার জন্য মার্কেটিং ডাইরেক্টর জনাব তৌহিদ চৌধুরীকে USA তে দায়িত্ব দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় বিভিন্ন Buying House-এর মাধ্যমেও রপ্তানি আদেশ পাওয়া যায়। অবশ্য এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত উদ্যোগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মূলতঃ ব্যাংক টু ব্যাংক এলসি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

আর্থিক তথ্যাবলি: উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট প্রকল্প ব্যয় ১ কোটি টাকা। নিম্নে জি. আর অ্যাপারেলস লি. এর স্থায়ী ও চলতি মূলধন বিবরণী আলাদা-আলাদাভাবে দেখানো হলো:

স্থায়ী মূলধন

বিবরণ	পরিমাণ
কারখানা গৃহনির্মাণ	৪০,০০০,০০০
সেলাই মেশিন ক্রয় (৬০০×৫,০০০)	৩,০০,০০০
আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়	৫,০০,০০০
মোট স্থায়ী মূলধন:	৭৫,০০,০০০

চলতি মূলধন

বিবরণ	পরিমাণ
কর্মীর বেতন ও মজুরি (মাসিক)	১৫,০০,০০০
কর্মকর্তাদের বেতন (মাসিক)	৫,০০,০০০
বৈদ্যুতিক বিল (মাসিক)	১,০০,০০০
টেলিফোন বিল (মাসিক)	৫০,০০০
অন্যান্য খরচ	৩,৫০,০০০
মোট চলতি মূলধন:	২৫,০০,০০০

অর্থায়ন পদ্ধতি

বিবরণ	পরিমাণ
নিজস্ব পুঁজি (৫০%)	৫০,০০,০০০
১৫% সুদে ব্যাংক ঋণ	৫০,০০,০০০
মোট প্রকল্প ব্যয়:	১০০,০০,০০০

বিক্রয় আয় বিবরণী

বিবরণ	পরিমাণ
আয়:	
বাৎসরিক পোশাক রপ্তানি বাবদ আয়	৩,৫৫,০০,০০০
অন্যান্য খাত থেকে আয়	৫,০০,০০০
মোট আয়:	৩,৬০,০০০০
ব্যয়:	
শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন ও মজুরি (১২ মাসের)	২,৪০,০০০
বৈদ্যুতিক বিল (১২ মাসের)	১২,০০,০০০
টেলিফোন বিল (১২ মাসের)	৬০০,০০০
অন্যান্য খরচ (৩,৫০,০০০*১২)	৪২,০০,০০০
ব্যাংক ঋণের সুদ	৭,৫০,০০০
মোট ব্যয়-	৩,০৭,৫০,০০০
নিট মুনাফা-	৫২,৫০,০০০

উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় আয় বিবরণী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বৎসরে জি. আর অ্যাপারেলস লি. পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক করপূর্ব নিট মুনাফা অর্জন করেছে। শতকরা হারে রূপান্তর করলে করপূর্ব নিট মুনাফার হার মোট বিনিয়োগের ৫০% এরও অধিক।

গার্মেন্টস শিল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ: জি.আর এ্যাপারেলস লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম কিবরিয়ার সাথে কথা বলে আমরা তৈরি পোশাক শিল্প খাতের নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করেছি:

১. রাজনৈতিক অস্থিরতা: বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি পোশাক শিল্পকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রতিদিনের হরতালের কারণে অনেক গার্মেন্টস মালিক তাদের রপ্তানি আদেশের ফরমায়েশকৃত পণ্য উৎপাদন যেমন করতে পারছে না, তেমনি ঠিক সময়ে শিপমেন্টও করতে পারছে না। ফলে রপ্তানি আদেশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

২. লোডশেডিং: চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় প্রতিনিয়ত লোডশেডিং এর শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে লোডশেডিং গার্মেন্টস শিল্পের অন্যতম একটি সমস্যা।

৩. বন্দর সমস্যা: চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরের নানাবিধ সমস্যাও গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করছে। বন্দরের পর্যাপ্ত জায়গা ও যন্ত্রপাতির অভাবে জাহাজগুলোকে বেশদিন বন্দরে অপেক্ষা করতে হয়। তাছাড়া বন্দরে ডক ওয়ার্কারদের ঘন ঘন ধর্মঘটও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে গার্মেন্টস শিল্পের উপর। উপরন্তু বিশ্বের অন্যান্য আন্তর্জাতিক বন্দরের তুলনায় চট্টগ্রামের সার্ভিস চার্জও বেশি।

৪. শ্রমিক অসন্তোষ: বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় প্রায় সময় গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনের নামে শ্রমিক অসন্তোষ লেগে থাকে।

৫. অদক্ষ শ্রমিক: বাংলাদেশে অতি মাত্রায় শ্রমিক পাওয়া গেলেও কাক্ষিত দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিক কর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে এ খাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি।

৬. মৌলিক উপকরণের জন্য বিদেশি নির্ভরশীলতা: এ শিল্প তার মৌলিক উপকরণগুলোর জন্য বিদেশি উৎসের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। বাংলাদেশকে এখনও ৯০ শতাংশের বেশি ওভেন ফেব্রিক আমদানি করতে হয়।

৭. আমলাতন্ত্র ও অবকাঠামোগত বিঘ্নতা: বাংলাদেশে বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক সমস্যা এবং অবকাঠামোগত বিঘ্নতাও গার্মেন্টস শিল্প পরিচালনার খরচ বৃদ্ধি করে।

সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধান: জি.আর এ্যাপারেলস লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক গার্মেন্টস শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণের যেসব সম্ভাব্য সমাধানের কথা বলেছেন সেগুলো নিম্নরূপ:

১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলকে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২. পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে এবং সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতকরণের মাধ্যমে লোডশেডিং বন্ধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. বন্দর সমস্যা সমাধানকল্পে প্রস্তাবিত আমেরিকান কোম্পানিকে বিকল্প বন্দর গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া দরকার।

৪. সরকারি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সহযোগিতার মাধ্যমে গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মীদের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন গড়ে তোলা।
৫. দক্ষ শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পোশাক উৎপাদন শ্রমিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এর মতো আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. মৌলিক উপকরণের জন্য অত্যধিক বিদেশি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে তোলার জন্য উদ্যোক্তাদের সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৭. বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক সমস্যা কমানো এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপসংহার: তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। তৈরি পোশাক শিল্প এখন রপ্তানি তালিকার শীর্ষে। যাত্রা গুরুত্ব সামান্য অবস্থা থেকে ১৫ বৎসরের মধ্যে এ শিল্প বাংলাদেশে বিপ্লবকরভাবে প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় খাতের চরম বিশৃঙ্খলার মুখে সরকারি বিরাস্ত্রীয়করণের মিশ্র ফলের মাঝে থেকে এ শিল্পের সাফল্য নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মত।

প্রশ্নমালা-৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। পরিদর্শন কী?
- ২। পরিদর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য কী?
- ৩। সাক্ষাৎকার কাকে বলে?
- ৪। শিল্পোদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়কালীন সতর্কতাসমূহ কী কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা কর।
- ২। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতিগুলো কী কী?
- ৩। ছাত্র ছাত্রীরা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কী রূপ ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে, উল্লেখ কর।
- ৪। শিল্পোদ্যোক্তার সাক্ষাৎকারের জন্য একটি কাল্পনিক প্রশ্নমালা প্রণয়ন কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। পরিদর্শনের সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা কর।
- ২। ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কর্মপ্রণালি আলোচনা কর।
- ৩। শিল্পোদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নাবলির নমুনা উল্লেখ কর।
- ৪। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।
- ৫। একটি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রতিবেদন তৈরি কর।

সমাপ্ত

২০১৮ শিক্ষাবর্ষ

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য